বুদ্ধ-তথাগত

শান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

BUDDHA-TATHAGATA

SANTI PRASANNA BANDYOPADHAYA

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ

শ্রীতপনকুমার ঘোষ

সাহিত্যশ্রী

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

(দ্বিতল) কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ

মেমোরিয়াল আর্ট

মুদ্রাকর ঃ

গোবিন্দলাল চৌধুরী

স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স

২ ছিদামমুদি লেন

কলিকাতা-৬

"মা, বুদ্ধের কাহিনী শুনতে
তুমি খুব ভালবাসতে। তাই
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমার
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করলাম।"

ভূমিকা

একালে সদ্‌গ্রন্থ রচনার রীতি ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত গ্রন্থ, যা চেতনাকে উদ্ধ্বায়িত হতে সাহায্য করে তার প্রতি লেখক ও পাঠক, উভয় সম্প্রদায়ের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজন ও ইহমুখ কামনায় এত আকণ্ঠমগ্ন যে, উপরের দিকে তাকাবারও অবসর পাই না। তাই যখন শ্রীযুক্ত শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুদ্ধ তথাগত" বইটির ফাইল কপি হাতে এল তখন মনে প্রশান্তি লাভ করলাম। ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী নিয়ে বিশ্বের বৌদ্ধজগতে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করেছিল, ফলে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর জীবন-ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে পুস্তক পুস্তিকা রচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মটি হচ্ছে প্রথম বিশ্বধর্ম। এ ধর্মের কোনো ভূগোল ইতিহাস নেই, দেশকালের সীমাবন্ধন এই জীবনদর্শনকে সংকুচিত করে নি। খ্রীষ্টান ও ইসলামধর্ম বিশ্বধর্ম হলেও, বৌদ্ধধর্মের অনেক পরে দেশে দেশে প্রাধান্য লাভ করে। সেদিক থেকে দেখলে ভারতীয় হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্ম বলা যায় না; কারণ হিন্দুধর্ম ভারতের বাইরে প্রচারিত হয়নি। অবশ্য দু-একজন গ্রীক-রোমক শাসক, যাঁরা গান্ধার, পুরুষপুর, বাহ্লিক রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বৈষ্ণব মতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, যেমন হেলিওডোরাস। তিনি নিজের বিষ্ণুভক্তির চিহ্নস্বরূপ গরুড়ধ্বজও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তা হলেও একথা বলা যাবে যে, ভারতের হিন্দুধর্ম, কেবলমাত্র ভারতেরই ধর্ম। যে ব্যক্তি হিন্দু জনক-জননী থেকে জন্মলাভ করে নি, তাকে হিন্দু সমাজের মধ্যে গ্রহণ করার রীতি নেই। খ্রীষ্টান ও ইসলামধর্মে ধর্মান্তরীকরণ স্বীকৃত এবং প্রবলভাবে অনুসৃত। কিন্তু ধর্মান্তরীকরণ প্রথা হিন্দুধর্ম ও সমাজে স্বীকৃত হয় নি। তাই হিন্দুধর্ম ভারতের চতুঃসীমার বাইরে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। হিন্দু ষ্টুয়ার্ট প্রবলভাবে হিন্দুধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান পালন করলেও, তাঁকে হিন্দুসমাজ কখনো হিন্দু বলে গ্রহণ করে নি। ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ অতিশয় ভক্তি করলেও, তাঁকে প্রথাগতরূপে হিন্দু বলে নি। অবশ্য একালে ব্রাহ্ম সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের এই "দ্বৈপায়ন" সীমাবদ্ধতা অনেকটা দূর করতে পেরেছিলেন। এক সময়ে শুদ্ধিমন্ত্র দিয়ে অনেক ভিন্নধর্মাবলম্বী হিন্দুকে আবার হিন্দু সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তার ফল হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধের উত্তাপ। হিন্দুধর্মে কেন এই সীমাবদ্ধতা তার কারণ দুজ্ঞের্য় নয়। আসলে হিন্দুধর্ম কোনো "ধর্ম" নয়; এ হচ্ছে এক প্রকার "জীবনদর্শন"। তাই বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদের মতো হিন্দুর কোনো ধর্মগুরু নেই, নেই কোন "ক্রীড"। এক ব্রহ্ম, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে তেত্রিশকোটি দেব-দেবী, অথবা

সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদ, সব কিছুকেই হিন্দু সমাজ স্বীকার করেছে। নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রাচীন ঋষিগণও (যেমন বৃহস্পতি, জাবালি) সমাজ চিন্তায় ও দর্শনে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। অবশ্য বেদের প্রতি আনুগত্য না থাকলে, হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলতে পারে না। সেই জন্যই বৌদ্ধসমাজ হিন্দুদের কাছে নাস্তিক, "পাষণ্ডী" বলে নিন্দিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের একমাত্র দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধর্ম ও 'তত্ত্বগত' সংঘাত। য়ুরোপের ইনকুইজিসনের মতো কিছু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘনায়িত হয়েছিল। এমন কি ভারতবর্ষ ইসলামের দ্বারা আক্রান্ত হলে কিছু কিছু বৌদ্ধ তাতে খুশিই হয়েছিল। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। সে যাই হোক; গোমুখী গহ্বর থেকে যখন গঙ্গার ধারা নেমে আসে; তখন তার ফেনশুভ্রজলে মহাকাশের ছায়া পড়ে কিন্তু যখন সেই ধারা নিম্নাভিমুখী হয়, তখন তা কর্দমাবিল হয়ে ওঠে, তাতে আর আকাশের ছায়া পড়ে না। ধর্মও যত অগ্রসর হয়, ততই তা আবিল হয়ে পড়ে, হিন্দুর বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নানা শাখাপ্রশাখা যান-উপযানের ইতিহাস আলোচনা করলে, সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে সব কথা অবাস্তব। এই ছোট বইখানিতে শ্রীযুক্ত শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের জীবনকথা ও বৌদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সহজ ভাষায় স্বল্প পরিসরের মধ্যে আলোচনা করেছেন। মানুষের সর্ববিধ দুঃখ দূর করাই ছিল বুদ্ধ অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তাই বলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন দুঃখবাদী দর্শন নয়। দুঃখেই দুঃখের পরিসমাপ্তি, একথা বৌদ্ধধর্মের স্বীকৃত বাণী নয়। দুঃখের অস্তিত্ব মায়া বলে ভুলে থাকা বুদ্ধদেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুঃখ আছে, তা যে কারণেই হোক না কেন, এবং সে দুঃখ দূরীকরণের নিদানও আছে। বাসনাবন্ধের আত্যন্তিক বিনাশ এবং ইন্দ্রিয়ময় জগৎচেতনাকে নঞর্থক বলে গ্রহণ না করলে, জীবকে বারবার জন্ম-জরাচক্রে পরিভ্রমণ করে ত্রিবিধ দুঃখের কবলে পড়তে হবে। নির্বাণ, অর্থাৎ বাস্তব দুঃখবেদনার অধীন জীবনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি—একথা হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল ধর্মদর্শনের মূল কথা। তবে নির্বাণ কোনো অস্তিবাদী ব্যাপার না; শূন্যবাদী অনস্তিত্ববাদ, তাই নিয়ে বৌদ্ধদর্শনে নানা মতান্তর রয়েছে।

বুদ্ধদেব গূঢ় দর্শনচেতনার চেয়ে মানুষের দুঃখ দূরীকরণের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করেছিলেন। জিজ্ঞাসু ভক্তরা তাঁকে ঈশ্বর, পরলোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, হয় তিনি চুপ করে থাকতেন, অথবা এড়িয়ে যেতেন। এসব অকারণ অযথা জল্পনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তার জীবৎকালেই তাঁর সম্প্রদায়ে পরমার্থিক সত্তা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল। ফলে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর মধ্যে তাঁর

হীনযান, প্রত্যেক বুদ্ধসহ মহাযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি দল-উপদলে বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযান তো পিতৃভূমি থেকে নির্বাসিতই হয়ে যায়। মহাযান হিন্দু মতের সঙ্গে কিছু আপোস রফা করে টিকে থাকে, তাও দশম শতাব্দীর পর লুপ্ত হয়ে যায়, হিন্দুতন্ত্র তাকে গ্রাস করে ফেলে।

এই গ্রন্থটি পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ আলোচ্য বিষয়ে লেখকের সু-অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ ব্যাপারকে সহজ করে বলার প্রশংসনীয় শক্তি। মাঝে মাঝে বর্ণিতব্য বিষয় গল্পের মত স্বাদু ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, যদিও তত্ত্বকথা বাদ পড়ে নি। পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থ থেকে মানসিক তৃপ্তি লাভ করুন এই কামনা করি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর সময়কালেরও কিছু বেশী পূর্বে, আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে তথাগত গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করে, তাঁর মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং এখানেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন, সেই মতবাদ ভারতের বাইরে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করলেও, ভারতের মাটিতে তার পৃথক অস্তিত্ব বর্তমানে আর নেই বললেই চলে।

গৌতম বুদ্ধের মতবাদ নাস্তিকতাবাদে দুষ্ট বলেই নাকি ভারতের মাটিতে তাঁর সেই মতবাদ স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয় নি। বর্তমানে সেই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ নাস্তিকতাবাদ প্রচার করে গিয়েছেন, এমন ধারণা এখন অবশ্য কেউই পোষণ করেন না। এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে ভারতের সনাতনধর্মে কালক্রমে যে আবিলতা প্রবেশ করেছিল, তাকে দূর করবার জন্যেই তিনি এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই জন্যেই তিনি ভারতবাসীর নিকট স্বয়ং বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃতি লাভ করে পূজিত হয়েছেন। যাতে আপামর প্রতিটি মানুষই ধর্মের যথার্থ সহজ ও সরলভাবে উপলব্ধি করে একাকী অনায়াসে অনাড়ম্বর ধর্মপথে এগিয়ে চলতে পারেন, সারা জীবন ধরে, এমন কি মহাপরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এবং অক্লান্তভাবে তিনি কেবল সেই পথেরই সন্ধান সর্বসাধারণকে দিয়ে গিয়েছেন। নূতন কোন ধর্মমত তিনি প্রচার করেন নি। বর্তমানে ভারতবাসীর আচরিত সনাতন ধর্মে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথাগত নির্দেশিত মতবাদও অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সুতরাং ভারতের মাটি থেকে শাক্যমুনি প্রবর্তিত মতবাদ বিদেয় নিয়েছে, এমন কথা কোনমতেই উচ্চারণ করতে পারা যায় না, যদিও তার কোন পৃথক অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।

ভারতের সংস্কৃতিগত সাংগঠনিক যুগেরও সূচনা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের আগমনের পর থেকেই। সেই জন্যে স্বাধীনতা লাভের পর, ভারতের সনাতন কৃষ্টির পুনর্জাগরণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তঃকরণে, বুদ্ধকে জানার আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক বুদ্ধ নিজে। বুদ্ধের বাণী শাশ্বত ভারত আত্মারই বাণী। বুদ্ধ শাশ্বত ভারত আত্মারই অমর প্রতীক। বুদ্ধের শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলোতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বুদ্ধের জাতক কাহিনী অবলম্বনে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নীতি কথা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আমি বুদ্ধের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে, মহা পরিনির্বাণ পর্যন্ত, যতদূর সম্ভব বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীন সুসভ্য দেশে, তথাগতের শিক্ষা এবং আদর্শ কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, সে সম্বন্ধেও সামান্য আলোচনা করেছি। আমার প্রচেষ্টা কতখানি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, সুধী পাঠকবৃন্দের মতামত ও বিচারের উপর।

এই পুস্তকখানি রচনায়, বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের জটিল তত্ত্বসমূহ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে, তিনি আমার মহা উপকার করেছেন। এজন্য তাঁর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি রচনার কালে, বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করে এবং প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে, আমার কন্যা বুলা চক্রবর্ত্তী আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন।

"সাহিত্যশ্রী"র শ্রীতপনকুমার ঘোষ মহাশয় আমার পুস্তকখানির প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

"সব্বে সত্তা সুখীত্তা হন্তু"

শান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে সূর্যদেব তখন সবেমাত্র মধ্যাহ্ন গমন অতিক্রম করেছেন। এমন সময় রাণী মহামায়ার বিশ্রাম সুখের দিবানিদ্রা ভঙ্গ হল। চোখ মেলে তাকাতেই রাণী দেখতে পেলেন, তাঁর শয্যাপার্শ্বে শায়িত অনুপম জ্যোতির্ময় সদ্যোজাত এক শিশুপুত্র। যেন দেবলোক থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছেন। দিবা নিদ্রাকালে কখন যে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মেছে রাণী মহামায়া নিজেই তা আন্দাজ করে উঠতে পারেন নি। অবাক বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাণী তাকিয়ে থাকেন তাঁর সদ্যোজাত শিশু পুত্রটির প্রতি। রাণী মহামায়ার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে সেই সদ্যোজাত শিশু পুত্রটি অতি অবাস্তব এক অভিনব কাণ্ড করে বসল। প্রথমে পালঙ্ক থেকে ভূমিতে অবতরণ করল সে, তার পর ভূমির উপরে সাত বার পদচারণা করল। শিশুটির প্রতিটি পদক্ষেপের সময় ভূমিতে দেখা দিতে থাকে একটি করে সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত কমল।

রাণী মহামায়ার বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা নেই। এসব অদ্ভুত এবং অবাস্তব কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে তাঁর দুচক্ষের দৃষ্টির সম্মুখে? সদ্যোজাত শিশু কর্তৃক এতবড় অবাস্তব অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাঁর নিজের মনেই সন্দেহ দেখা দিল, তিনি কি সত্যি সত্যিই জাগ্রত অবস্থার মধ্যে সে সব অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চলেছেন, না ঘুমের ঘোরে আবার সে রকম ধরনের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে চলেছেন। নিজের মনের সেই সন্দেহ দূর করবার জন্যেই পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাণী মহামায়া। পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর সর্বপ্রথমে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে শালতরুটির তলে তাঁর বিশ্রাম সুখের জন্য শয্যা রচনা করা হয়েছিল, সেই শালতরুটির ক্ষুদ্র একখানি পল্লবিত শাখাকে বাম হস্তে ধারণ করে, সেই শাখাটির অবলম্বনে দণ্ডায়মান থেকে, অপার বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করতে থাকেন রাণী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী তাঁর শিশু পুত্রটিকে। শিশুটির অবাস্তব ক্রিয়াকলাপ তখনও শেষ হয়নি। রাণীর অপার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর শিশু পুত্রটি এরপর এমন ধরনের আরও একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনার অভিনয় করে বসল। সুললিত ছন্দে উচ্চারণ করে গেয়ে উঠল ঃ—

জেঠ্ঠো হমস্মিং সেঠ্ঠো হমস্মিং
অগ্গোহহম অস্মি লোকস্স।
(জ্যেষ্ঠ আমি, শ্রেষ্ঠ আমি
আমিই প্রধান ভুবন মাঝে)

সদ্যোজাত শিশুর দ্বারা সংঘটিত একটির পর একটি অতি অবাস্তব এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর রাণী মহামায়ার মনে পড়ে গেল,

তার সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথির রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি অতীব রমণীয় শ্বেতহস্তী, এক-খানি শ্বেতকমল শুঁড়ে ধারণ করে আকাশ পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর প্রতি। তার পর সেই হস্তীটি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে হতে অবশেষে তার দেহে এসে লীন হয়ে গেল। প্রত্যুষে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করার পরেই তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন রাজা শুদ্ধোদনকে। অগ্র মহিষীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে রাজা শুদ্ধোদন সেদিন রাজ-সভায় উপস্থিত হয়ে দৈবজ্ঞগণকে জানিয়েছিলেন সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের কথা। রাজদৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য তখন যথাযথ গণনার দ্বারা রাণীর স্বপ্নদর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে রাজাকে জানিয়ে বলেছিলেন যে, রাণী মহামায়ার গর্ভে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তিনি হয় কোন একছত্র রাজচক্রবর্তী, নয়তো সমগ্র বিশ্বের যিনি অধিপতি, তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই সসাগরা ধরিত্রীর বুকে এক অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবেন বলে।

দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য কর্তৃক স্বপ্ন বৃত্তান্তের ফলাফল ঘোষণার অল্প পরেই, সেদিন রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ত্রিকালদর্শী ঋষি অসিত। ঋষি ধ্যানবলে জানতে পেরেছিলেন স্বয়ং ভগবান তথাগত পুত্ররূপে রাণী মহামায়ার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই শুভসংবাদ জ্ঞাপনের জন্যেই সেদিন তিনি ছুটে এসেছিলেন কপিল রাজপুরীতে। রাজপুরীতে আসার পর ঋষি অসিত রাণী মহামায়ার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলীপুটে তাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে ভবিষ্যদবাণী উচ্চারণ করলেন যে, স্বয়ং ভগবান তথাগত পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে কিছুতেই রাজ্যপাট কিম্বা সংসারের আবর্ত্তে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাবেন এবং পরবর্তীকালে জগতে এক অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করবেন। ত্রিকালদর্শী ঋষি অসিতের সেই ভবিষ্যদবাণী স্মরণ হতেই, রাণীর মন থেকে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে, সকল প্রকার সন্দেহ অপসারিত হয়ে গেল। জগতের সকল শক্তির আধার যিনি, তিনিই এসেছেন তাঁর পুত্ররূপে এবং এসকল অপ্রাকৃত অতি অবাস্তব ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই তিনি সর্বপ্রথমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। রাণী মহামায়ার অন্তরে তখন আনন্দের জোয়ার বইতে আরম্ভ করল। আনন্দের আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন রাণী তাঁর সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে। আনন্দের জোয়ার শুধু রাণীর অন্তরখানিকেই নয়, সমগ্র লুম্বিনী বনভূমিকেই সেদিন প্লাবিত করে তুলেছিল। সেদিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি।

চন্দ্রাতপতলে পুত্রকে কোলে নিয়ে রাণী মহামায়া পালঙ্কে উপবিষ্ট রয়েছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাণীর কোল থেকে শিশুপুত্রটিকে গ্রহণ করতে চাইলেন। রাণী বিনা বাক্যব্যয়ে শিশু

পুত্রটিকে তুলে দিলেন সেই ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ তখন সেই শিশুপুত্রটিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত তাকে সমাদর করলেন তারপর পুনরায় রাণীর অঙ্কে ফিরিয়ে দিলেন শিশুটিকে। এরপর ব্রাহ্মণ যেমন হঠাৎ এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই হঠাৎ সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। তাকে আর কিছুতেই দেখতে পাওয়া গেল না। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেদিন ব্রাহ্মণের বেশে রাণী মহামায়ার নিকট উপস্থিত হয়ে রাণীর নিকট থেকে শিশুটিকে গ্রহণ করে, তাকে সস্নেহ আদর আপ্যায়নের মাধ্যমে বন্দনা দ্বারা ভগবান তথাগতের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে রাজপুরীতে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট পুত্রের আগমন বার্তা এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাত্র-মিত্রদের নিয়ে অতি দ্রুত এসে উপস্থিত হলেন লুম্বিনী বনভূমিতে। ঋষি অসিতও ধ্যানবলে জানতে পারলেন স্বয়ং তথাগতের আগমন বার্তা। ত্রিকালদর্শী তাঁর ভাগিনেয় নালককে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেই বনভূমিতে। রাণী মহামায়ার কোলে শিশুকে দেখেই ঋষি অসিত আনন্দের আবেগে একেবারে আত্মহারা হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "এসেছেন, তিনি এসেছেন"। বলতে বলতে ঋষি অসিতের দু'নয়ন প্লাবিত করে আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগল। ঋষির নয়নে অশ্রুধারা দেখে রাজা শুদ্ধোদনের স্নেহকাতর পিতৃহৃদয় অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল। রাজা শুদ্ধোদন তখন ঋষিকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনিই তো ভবিষ্যদ্‌-বাণী করে বলেছিলেন যে স্বয়ং ভগবান তথাগত আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, তবে এখন আপনার নয়নযুগল হতে অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে কেন? শিশুর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নেই তো?" একথা বলতে বলতে রাজা একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন। রাজা শুদ্ধোদনের কথার পর ঋষি অসিত ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে অশ্রু সংবরণ করে, রাজাকে উদ্দেশ করে জানালেন, "মহারাজ এতে আপনার শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। আমি অশ্রুবিসর্জন করছি আমার নিজের অসহায় অবস্থার জন্যে। "আমার যখন যাবার সময় হয়ে এলো, ঠিক সেই সময়েই এসে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং তিনি, যিনি জগতের সমগ্র জীবকুলকে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে, জন্ম-মৃত্যুর অতীত সেই চির শান্তির পথে পরিচালনা করবেন।" ঋষির মুখে এই কথা শোনার পর রাজা শুদ্ধোদন আশ্বস্ত হলেন। তারপর ঋষি অসিত নিজেকে স্থির করে নিয়ে মস্তক অবনত করে রাণী মহামায়ার ক্রোড়ে অবস্থিত শিশুপুত্রটিকে অভিনন্দন জানাতে গেলে, শিশুপুত্রটি জটাজুটধারী ত্রিকালদর্শীর মস্তকে পদার্পণ করে, সর্বসমক্ষে আরও একটি অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করেন। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে রাজা শুদ্ধোদন সেদিন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর পর ঋষির সঙ্গে সেদিন তিনি নিজেও পুত্রকে

সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। ঋষি অসিত সেদিন পুনরায় এক ভবিষ্যদ্‌বাণী দ্বারা রাজা ও রাণী উভয়কেই জানিয়ে দিলেন যে এই শিশু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হবেন। ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজে ধরা ধামে বর্তমান থাকবেন না বলে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে অশ্রু-বিসর্জন দেন। পরে তিনি তাঁর ভাগিনেয় নালককে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে নির্দেশ দান করেন।

রাণী মহামায়া তাঁর সহোদরা এবং সপত্নী আর্যা গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন বৈশালীতে তাঁদের পিত্রালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, পিতৃরাজপুরীতেই ভূমিষ্ঠ হবে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান। বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ। রাণী মহামায়ার পিতৃগৃহে যাওয়া আর হল না। বৈশালীর পথে শাক্যরাজ্যের সীমার মধ্যে মনোরম লুম্বিনী বনভূমির পথ দিয়ে অগ্রসর হবার কালে মহামায়ার অন্তরে বড় সাধ জেগেছিল সেই রমণীয় বনভূমিতে দুদণ্ড অবস্থান করে বিশ্রাম গ্রহণ করবার জন্যে। তাঁর সেই অভিলাষ পূরণের জন্য সেদিন সেই বনভূমির পথে শালতরুটির নিচে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ খাটিয়ে, তাঁর বিশ্রামের জন্য উপযোগী শয্যা রচিত হয়েছিল। আর সেখানেই তাঁর পুত্ররূপে এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভবিষ্যতের বুদ্ধ, তথাগত।

পুত্রসহ রাণী মহামায়া এবং আর্যা গৌতমীকে নিয়ে সদলবলে রাজপুরীতে ফিরে এলেন রাজা শুদ্ধোদন। রাণী মহামায়ার জীবনে পিতৃগৃহে যাবার সুযোগ আর কোনদিন আসেনি। রাজপুরীতে শিশুর আগমনের পর থেকেই আশ্চর্যরূপে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে রাজা শুদ্ধোদনের। তাই শিশুর জন্মের পঞ্চম দিবসে তার নামকরণ করা হল সিদ্ধার্থ। শিশুর নামকরণের লগ্নে, সেই দিনটিতে রাজপুরীতে আরও একটি বিস্ময়কর অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। রাজপুরীতে যে সকল দেবমূর্তি পূজিত হত, শিশুর নাম পুরোহিত উচ্চারণ করবার সাথে সাথে, সে সমস্ত দেবমূর্তি শিশুর উদ্দেশ্যে প্রণিপাত জ্ঞাপন করে তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিল।

রাজদৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্যের উপর নবজাতকের জন্ম পত্রিকা রচনার ভার অর্পণ করেছিলেন রাজা শুদ্ধোদন। ত্রিকালদর্শী ঋষি অসিত লুম্বিনী উদ্যানে শিশুর জন্মের পরে উপস্থিত হয়ে রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়ার নিকট নবজাতক সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য শিশুর জন্ম পত্রিকা রচনার সময় সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীকেই সমর্থন জানালেন। উপরন্তু, জাতকের জন্মপত্রিকা রচনা করতে গিয়ে তিনি গণনায় দেখতে পেলেন যে, চারিটি বিশেষ নৈঃসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করার পর, জাতক সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উনত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় করবেন। পুত্র সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন শুনে রাজা শুদ্ধোদন মনে মনে বিশেষ-ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র রাজ্যপাট ও

সংসারের আবর্তে থেকে ভোগ বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করুক। সুতরাং পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে না পারে, সেজন্য তখন থেকেই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করতে লাগলেন। রাণী মহামায়া পুত্রের জন্মের পরে অপার আনন্দে উদ্বেলিত অবস্থার মধ্যে মাত্র সপ্তাহকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্র মুখ দর্শন করতে করতে মরদেহ ত্যাগ করে তুষিত স্বর্গে চলে যান। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর, তাঁর পুত্র তুষিত স্বর্গে গমন করে তিন মাস কাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে জননী মহামায়াকে "অভিধর্ম্ম" ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন।

রাণী মহামায়ার ধরাধাম ত্যাগ করার পর, সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার স্বভাবতই গিয়ে পড়ে তাঁর বিমাতা এবং রাণী মহামায়ার সহোদরা আর্যা গৌতমীর উপর। সেজন্য পরে তিনি আর্যা গৌতমীর সন্তানরূপে, গৌতম নামে পরিচিত হন। রাজদৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য যেদিন সিদ্ধার্থের জন্মপত্রিকা গণনা করে রাজা শুদ্ধোদনকে জানিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং সর্বশেষে দিব্যকান্তি বিশিষ্ট এক সন্ন্যাসী পুরুষকে দর্শন করার পর সংসার ধর্মের প্রতি বীতরাগ হবেন এবং সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন, সেদিন থেকেই রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের দৃষ্টিপথে যাতে সে রকম ধরনের কোন দৃশ্যের অবতারণা হতে না পারে সেজন্য সতর্কতামূলক সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষ-ভাবে যত্নবান হন। ক্রমে বিমাতা আর্যা গৌতমীর আদর যত্নের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থের জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হল। এখন থেকে গৌতম নামেই তিনি সমধিক পরিচিত হলেন।

সেই শিশু বয়সেই গৌতম রাজপুরীর অন্যান্য শিশুদের তুলনায় যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। আর্যা গৌতমীর পুত্র নন্দ ছিল বালক গৌতমের চেয়ে এক বছরের কনিষ্ঠ। আর আনন্দ ছিল গৌতমের সমবয়সী। রাজপুরীর শিশুদের সঙ্গে শিশুসুলভ খেলাধুলার মধ্যেও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অতি সহজেই লক্ষ্য করা যেত। রাজা শুদ্ধোদনের প্রখর সতর্ক দৃষ্টি সেদিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল। সেজন্য সর্বদাই তিনি শঙ্কা অনুভব করতেন এই ভেবে, না জানি দৈবজ্ঞের গণনাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

সেকালে বপপমঙ্গল (হলকর্ষণ উৎসব) ছিল একটি বিশেষ ধরনের উৎসব। বৎসরের প্রথম দিন, অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিতে এই হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। রাজা প্রজা সকলেই সমানভাবে এই উৎসবে যোগদান করতেন এবং অংশগ্রহণ করতেন। উৎসবের দিনে আবাদযোগ্য ভূমিতে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান পালন করার নিয়ম ছিল। সে সময়ে রাজ্যের সাধারণ নাগরিক থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, এমন কি স্বয়ং সম্রাটও উপস্থিত থেকে সকলের সঙ্গে সমানভাবে হলকর্ষণে যোগদান করতেন। এমনি এক হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে রাজা শুদ্ধোদন বালক গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে উৎসবে যোগদান করেন। গৌতমের

তখন সবেমাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ভূমিতে হলকর্ষণ আরম্ভ হলে, লাঙলের ফালে উৎপাটিত এবং উৎক্ষিপ্ত কেঁচোগুলির এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গের নিতান্ত অসহায় অবস্থা এবং অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা স্বচক্ষে দর্শন করার পর সেই শিশু বয়সেই বালক গৌতমের অন্তঃকরণে দারুণ আঘাতের সঞ্চার করে। ভবিষ্যৎ বুদ্ধের বিশ্বব্যাপী করুণার উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তি সেখান থেকেই। উৎসবের আয়োজন, উপাচার প্রভৃতি সবকিছুই বালক গৌতমের নিকট তখন নিতান্তই অসার বলে বোধ হতে লাগল। কি করে জগতের সমগ্র জীবকুলকে ধ্বংসের হাত থেকে, দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে, রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে, এই একটিই মাত্র চিন্তা এসে শিশুর সমস্ত অন্তঃকরণ অধিকার করে নিল। উৎসবের উপাচার এবং আনন্দ কোলাহল প্রভৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে নিভৃত স্থানে, এক বিশালাকার জম্বু বৃক্ষের ছায়ায় বসে শিশু গৌতম ধ্যানে একেবারে বিভোর হয়ে গেলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল, সূর্যদেব ক্রমে মধ্যাহ্ন গমন অতিক্রম করে পশ্চিম গগনে হেলে পড়লেন, তখনও শিশুর ধ্যানভঙ্গ হয়নি। পাঁচ বৎসরের শিশুর এই অদ্ভুত ধ্যানভঙ্গিমা দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন সেদিন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছাল যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে সূর্যদেব পশ্চিম গগনে হেলে পড়া সত্ত্বেও বৃক্ষের সুশীতল ছায়াটি মধ্যাহ্ন গগনের স্থির ছত্রছায়ার ন্যায়ই শিশুটির চারিপাশ বেষ্টন করে রেখেছে। এতবড় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এতগুলো লোকের দৃষ্টির সমক্ষে সংঘটিত হতে দেখে রাজা শুদ্ধোদন সেদিন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন নি। শিশু গৌতমের সম্মুখে নতজানু হয়ে তিনি পুত্রকে প্রণিপাত জ্ঞাপন করেন। নিজের পুত্রকে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার প্রণিপাত জ্ঞাপন করলেন রাজা শুদ্ধোদন।

শিশুর পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাকে শুধু আদর যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করবে, তারপর তাকে বিদ্যালাভের জন্যে গুরুগৃহে প্রেরণ করবে, এটি হল আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ। রাজা শুদ্ধোদনও পুত্রের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হলে তাঁকে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে আচার্য বিশ্বামিত্রের নিকট প্রেরণ করেন। আচার্য বিশ্বামিত্র ছিলেন সেকালের একজন প্রসিদ্ধ গুরু। তাঁর নিকট দূর দূরান্ত থেকেও শিক্ষার্থী ছাত্রগণ বিদ্যালাভের জন্য এসে উপস্থিত হত। আচার্য বিশ্বামিত্র অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের অন্যতম প্রধান শিক্ষা, অস্ত্র শিক্ষাও প্রদান করতেন। উপযুক্ত গুরুর নিকট বালক সিদ্ধার্থ শাস্ত্রাধ্যায়ন থেকে আরম্ভ করে ধনুর্বিদ্যা পর্যন্ত সর্ববিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে সিদ্ধার্থ সর্ববিষয়েই আশ্চর্য রকমের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং গুরুর আশীর্বাদ লাভ করে পুনরায় কপিল রাজপুরীতে ফিরে আসেন।

বালক সিদ্ধার্থ কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্যে সংকল্প করেন। রাজা শুদ্ধোদন তাঁর শ্যালক কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারাকে

পুত্রবধূ রূপে কপিল রাজপুরীতে নিয়ে আসবেন বলে স্থির করেন। সিদ্ধার্থের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। যশোধারা ও সিদ্ধার্থ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন, গণৎকারগণের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যশোধারার পিতা কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের অজানা ছিল না। তাই তিনি সিদ্ধার্থকে জামাতা রূপে গ্রহণ করতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হননি। কিন্তু তাঁর নিজের কন্যা যশোধারা যখন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধার্থ ভিন্ন অপর কাউকেই তিনি পতিত্বে বরণ করতে পারবেন না, তখন আর রাজা সুপ্রবুদ্ধ সিদ্ধার্থকে নিজ কন্যাকে দান করতে অমত প্রকাশ করতে পারেন নি।

এই ঘটনার পর রাজা শুদ্ধোদন নিজেই কোলিরাজপুরীতে এসে উপস্থিত হন, এবং যশোধারাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করে নিজ রাজধানী কপিলবস্তুতে ফিরে এসে যশোধারার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। পুত্রবধূর জন্যে পাঁচশত সহচরীও নির্দিষ্ট করে দেন। তখন শাক্যরাজগণের অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল এই বলে, যে সিদ্ধার্থ এখনও পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক নন, তিনি কিরূপে নিজের পরিবারবর্গকে রক্ষা করবেন? শাক্যরাজগণের মন্তব্য শোনার পর সিদ্ধার্থ তাঁর নিজের শক্তিমত্তার এবং বিদ্যার পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হন। রাজা শুদ্ধোদন শাক্যরাজকুমারগণের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক এক শস্ত্র বিদ্যার আয়োজন করেন। সেই শস্ত্র বিদ্যার প্রতিযোগিতায় সিদ্ধার্থ অসামান্য ক্রিয়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর শস্ত্রবিদ্যার নিকট সকল রাজকুমারগণকেই পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগীদের মধ্যে যশোধারার অগ্রজ দেবদত্তও যোগ দিয়েছিলেন। অন্যান্য শাক্যরাজকুমারগণের ন্যায় তাকেও সেদিন বুদ্ধের নিকট পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল। বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের প্রবল ঈর্ষার সূত্রপাত সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। সেই ঈর্ষাই পরে ভবিষ্যতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে, সে তার আপন সহোদরার পতি বুদ্ধের প্রাণ বিনাশের জন্যে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিল।

পুত্রের বিবাহের পর রাজা শুদ্ধোদন আশা করেছিলেন যে, এবারে অন্তত পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন দেখা দেবে এবং এবারে তার মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। বিফল হবে দৈবজ্ঞের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী। নিজ পুত্র সম্বন্ধে রাজা শুদ্ধোদনের ধারণা যে খুব অস্পষ্ট ছিল, এমন নয়। পুত্রকে তিনি ভালোভাবেই চিনতে পেরেছিলেন। পুত্রের জন্মলগ্নের পর থেকে একটির পর একটি অলৌকিক ঘটনা তিনি নিজেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, পুত্রের অলৌকিকত্বের নিকট তিনি ইতিমধ্যেই দুবার মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়েছেন। তার পরেও তিনি আশা করেছিলেন পুত্রকে সংসারের মোহতরুর

সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখতে। হায়রে মানুষের আশা! পুত্রের অবসর বিনোদনের জন্য রাজকীয় সুখ সম্ভোগের কোন কিছুরই ত্রুটি রাখেন নি তিনি। পুত্রের অবসর বিনোদনের জন্য তিনি বিশেষভাবে তৈরী করেছিলেন একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান। সেই মনোরম পুষ্পোদ্যানে সুন্দরী তরুণীর দল সর্বদাই ঘিরে থাকত রাজকুমারকে। কিন্তু বৃথাই তাদের সেই প্রচেষ্টা। সমগ্র জীবকুলকে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করবার জন্য যিনি তথা থেকে ধরাধামে আগত হয়েছেন, তাঁকে মোহমায়ার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। শত চেষ্টা করেও রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হলেন না। এ ব্যাপারে পিতা পুত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে বচসাও দেখা দিয়েছে। একদিন সিদ্ধার্থ স্পষ্ট ভাষায় পিতাকে জানিয়ে বলেছিলেন যে, এখন যেমন তাঁর শরীরে যৌবন বর্তমান রয়েছে, তাঁর এই অবস্থাকে যদি তাঁর পিতা চিরস্থায়ী করে ধরে রেখে দিতে পারেন, তবে তিনি সংসার ত্যাগ করার চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দেবেন না। পুত্রের সেই কথা শুনে, প্রত্যুত্তরে রাজা শুদ্ধোদনের মুখে কোন কথা ফুটে ওঠেনি। সেদিন তিনি শুধু নীরব হয়েই ছিলেন। সেদিন তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শত চেষ্টা করেও বিধির অলঙ্ঘনীয় বিধান লঙ্ঘন করা যাবে না।

সেদিন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে কুমার সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন পরিচ্ছন্ন রাজপথ দিয়ে জরাজীর্ণ কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ কোন মতে নিজের দেহখানিকে যষ্টিতে ভর করে অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করে চলেছে। তার কোঠরগত আঁখি দুটি ক্লান্তিতে ভরা। দেখে মনে হয় নিজের দেহখানির ভার সে আর বইতে পারছে না। সেই বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে কুমার সারথিকে রথ থামাতে আদেশ করলেন। তারপর সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছন্ন, কে' ও?" সারথি ছন্দক উত্তরে জানালেন যে, ওই লোকটি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাই ওর দেহ বয়সের ভারে আপনা থেকেই নুয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ছন্ন সবাই কি এরকম বৃদ্ধ হয়?" উত্তরে ছন্দক জানালেন, "হ্যাঁ যুবরাজ", সারথির মুখে উত্তর শুনে সেদিন কুমারের সান্ধ্যভ্রমণ আর হল না। ফিরে এলেন কুমার রাজপুরীতে। সন্ধ্যার পর তাঁকে ঘিরে আরম্ভ হয় সুন্দরী ললনাগণের যথারীতি নৃত্যগীতের আসর। কুমারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়না। তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে তখন কেবল একটি মাত্র প্রশ্নই ঘুরে ফিরে দেখা দিতে থাকে, মানুষের এই পরিণতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় কি নেই? সুন্দরীগণের নৃত্যগীতের আসর তাঁর নিকট নিতান্তই অসার বলে প্রতিপন্ন হতে লাগল। কুমারের এই আনমনা ভাব নিয়ে তরুণীর দলে ক্রমশঃ আলোচনা আরম্ভ হতে থাকে। ক্রমে সে কথা পৌঁছলো রাজা শুদ্ধোদনের নিকটও। রাজা সারথি ছন্দককে ডেকে, তার নিকট থেকে আদ্যোপান্ত ঘটনা শোনার পর, দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী স্মরণ করে মনে মনে দারুণ শঙ্কা অনুভব করলেন।

কুমারের দৃষ্টিপথে যাতে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ কোন দৃশ্যের অবতারণা পুনরায় সম্ভব হতে না পারে সেজন্য রাজা শুদ্ধোদন চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু নিয়তিকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা তো কারুর নেই।

কুমার পুনরায় বের হলেন সান্ধ্যভ্রমণে। এবার রাজপুরী থেকে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর, তাঁর কানে ভেসে আসতে থাকে কাতর কণ্ঠের আর্তনাদ। শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তিনি দেখতে পেলেন, জরাজীর্ণ একটি লোক নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নিজের মলমূত্রের মধ্যেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সারথিকে তিনি রথ থামাতে নির্দেশ দিলেন। সারথি ছন্দক রথ থামিয়ে দিলে তিনি ছন্দককে উদ্দেশ করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ছন্ন কি হয়েছে ওর?" ছন্দক তখন উত্তরে জানালেন যে, লোকটি দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে তাই ওর উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি-টুকুও আর নেই। কুমার পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "ব্যাধি কেন হয়?" উত্তরে ছন্দক পুনরায় জানালেন, আমাদের এই দেহযন্ত্রটি হচ্ছে ব্যাধির আকর। এ দেহে বার্ধক্য উপস্থিত হলে, দেহযন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে, তখন দেখা দেয় নানা প্রকার ব্যাধি। ব্যাধির আক্রমণে দেহযন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে যায়। তখন শক্তি-সামর্থ্য বলতে এ দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তখন মানুষ হয়ে পড়ে নিতান্ত নিরুপায় এবং অসহায়। সারথির কথা শুনে তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকেন কুমার সিদ্ধার্থ। তাঁর নিজের দেহটিও তাহলে ব্যাধির আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। তখন তাঁর নিজেরও হবে ওই লোকটির মতোই অসহায় অবস্থা। পার্থিব সুখ সম্ভোগ বলতে যা কিছু আছে, তা সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে তখন। এ সম্বন্ধে তিনি যতই ভাবেন, ততই তাঁর মনে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ সম্ভোগের প্রতি জেগে উঠতে থাকে নিদারুণ বিতৃষ্ণা। জরা ও ব্যাধির আকর যে দেহখানি, তাকে ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার মত মূঢ়তা আর কিছুই হতে পারে না।

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও সন্ধ্যায় তাঁকে ঘিরে বসেছিল সুন্দরী তরুণীর দল। তাদের নৃত্যগীত কোন কিছুই কুমারের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর মনে তখন এ সবকিছুই এক বিরাট প্রহেলিকা বলে বোধ হচ্ছে। আজকের এই সুন্দরী তরুণীর দল, আর কিছুদিন বাদেই বার্ধক্যের কোঠায় গিয়ে উপনীত হবে। তখন তাদের দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। তার পরিবর্তে দেখা দেবে নানা প্রকার কঠিন ব্যাধি। তখন থাকবে না দেহে এই যৌবন, থাকবে না দেহে শক্তি সামর্থ্য। আজকের এই সুন্দরী তরুণীদলের সঙ্গে সেদিন তিনি নিজেও হয়ে পড়বেন, শিশুর ন্যায় নিতান্ত অসহায়। সুন্দরী তরুণীদলের নৃত্যগীতের আসর ত্যাগ করে কুমারের আনমনা ভাব তাঁর উদাস দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটে চলে যায় দূরে, বহুদূরে, চিন্তার জগতে। কুমারের এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসন্নপ্রসবা পতিপ্রাণা যশোধারা মনে মনে

বিশেষভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর অজানা ছিল না। তাই সর্বদাই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে। স্বামীর আনন্দেই ছিল তাঁর আনন্দ, স্বামীর সুখেই ছিল তাঁর সুখ। পত্নীর প্রতি কুমারের ভালবাসাও ছিল অত্যন্ত গভীর। পত্নীর প্রাণে ব্যথা লাগতে পারে এমন কোন আচরণ তিনি কখনও করেন নি। কিন্তু সেদিন নিজের মনোভাব গোপন রেখে বাক্যালাপ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নি। কেবল উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন পত্নীর প্রতি। তাঁর চিন্তার জগতের উদাস দৃষ্টি পত্নীর ভাবীকালের সম্ভাব্য অসহায় অবস্থার করুণ চিত্রটিকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। স্বামীর মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে যশোধারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু এর কোন প্রতিকারের পথই তার নিকট খোলা ছিল না।

পরের দিনও তেমনিভাবে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোলেন কুমার। এবার কিছুদূর অগ্রসর হবার পর, তাঁর চোখে পড়ল আর একটি করুণ দৃশ্য। একদল লোক একটি মৃতব্যক্তিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। আর তাদের পিছন পিছন চলেছে মৃতব্যক্তির শোকাতুরা পত্নী। আর্ত্ত নারীর কাতর বিলাপ ধ্বনি বিশেষভাবে অভিভূত করে তুলল কুমারের মনকে। মুহূর্তে সমস্ত জগৎ সংসার কুমারের নিকট নিতান্ত অসার বলে প্রতিপন্ন হল। এই অসার সংসারে থেকে অল্প কয়েকদিনের জন্যে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিন কাটানোর মত মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। সারথি ছন্দক যুবরাজের মনোভাব লক্ষ্য করে নিজেই এবার বলে উঠলেন, সকল মানুষেরই শেষ পরিণতি মৃত্যু। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। যে জন্মগ্রহণ করবে, তাকে একদিন মরতেই হবে। মৃত্যু জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অন্যথা নেই। সারথি ছন্দকের এই কথাকটি গিয়ে বিশেষভাবে দাগ কাটে কুমারের মনে। কুমার কেবলই ভাবতে থাকেন, একদিন মরতে হবে সকলকেই। জীবনের সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ, সুখ-সম্ভোগ, রাজঐশ্বর্য, সবকিছুরই শেষে রয়েছে সেই অবশ্যম্ভাবী ভীষণ পরিণতি মৃত্যু। কুমার নিজেরই অজান্তে অস্ফুট উচ্চারণ করে ফেললেন, "ওঃ কী ভয়ঙ্কর!" মৃত্যুর করাল দংষ্ট্রা থেকে কারুরই অব্যাহতি নেই। ভাবতে ভাবতে কুমার আনমনা হয়ে গেলেন। রথ ফিরে চলে যায় প্রাসাদে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুন্দরী তরুণীর দল তাঁকে ঘিরে নৃত্যগীতের আসর জমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! যার জন্য তাদের এই প্রচেষ্টা, এত উদ্যম তার সমস্তই বিফলে গেল। কুমারের অন্তঃকরণ জুড়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে মৃত্যুর করাল ভয়ঙ্কর রূপ। ইতিপূর্বে পর পর দুদিন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন, প্রথমে জরা এবং তার পর ব্যাধি। আর আজ স্বচক্ষে পুনরায় প্রত্যক্ষ করলেন, জরা ব্যাধির অন্তে মানুষের শেষ পরিণতি মত্যু। মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। কুমার ক্রমশঃ চিন্তার গভীরে প্রবেশ

করতে থাকেন। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে মানুষ কি তাহলে পৃথিবীতে আসে মাত্র দু'দিনের জন্য? দু'দিনের জন্যে এই রাজৈশ্বর্য, সুখ-সম্ভোগ? তার পরেই থাকবে না আর কিছুই অবশিষ্ট, মৃত্যু এসে গ্রাস করে নেবে সবকিছু! তাহলে দু'দিনের সুখভোগের জন্যে এত লালসা! তার পরেই জল-বুদবুদের মত মিলিয়ে যাবে সবকিছুই। দু'দিনের এই জীবন কি তাহলে সম্পূর্ণ অর্থহীন? মানুষ কি তাহলে পারে না জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে? ক্রমাগত একটির পর একটি প্রশ্ন এসে ভিড় জমাতে থাকে কুমারের মনে। প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পান না কুমার। বার বার কেবল চিন্তামগ্ন হতে থাকেন তিনি। সুন্দরীর দল তাদের সাধ্যমত শত চেষ্টা করেও সমর্থ হোল না কুমারের চিন্তামগ্ন ভাব দূর করে দিতে।

কুমার সম্বন্ধে দৈনন্দিন বার্ত্তা গিয়ে পৌঁছাত রাজা শুদ্ধোদনের নিকট। কুমারের ভাবান্তরের কথা শুনে বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের মনে ভাবনা দেখা দিল। বার বারই কেবল তাঁর দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে পড়তে থাকে। তাহলে কি এতদিনে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবতী হতে চলেছে? তাঁর পুত্র, কপিলবস্তুর রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী কি তাহলে সত্যি সত্যিই রাজৈশ্বর্য সংসার সবকিছুই পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে? তাঁর পুত্র কি তাহলে দরিদ্রের বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নে নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে, এবং রাজপুরীর সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে কঠিন বৃক্ষতল আশ্রয় করবে? ভাবতে গিয়ে বৃদ্ধ রাজা নিজের মনে দারুণ যাতনা অনুভব করতে থাকেন। কিন্তু কোন কূলকিনারার সন্ধান পান না। যদিও এতদিনে এটা তিনি স্পষ্টই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যৎকে ঠেকিয়ে রাখার অথবা নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তবুও একবার শেষ চেষ্টা না করে কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না তিনি।

রাজার আদেশে কুমারের ভ্রমণের পথে আরও কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হল। কিছুতেই কুমারের দৃষ্টিপথে যাতে কোন বিরূপ দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে না পারে সেজন্য সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হল। সেদিন কুমার যখন সান্ধ্য ভ্রমণে বের হবেন, তখন এমনিতেই তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন। সেই চিন্তামগ্নতা তার শান্ত, সৌম্য মুখশ্রীর সৌন্দর্য আরও শতগুণে বর্দ্ধিত করে তুলেছিল। সেদিন তাঁর শান্ত মুখশ্রীতে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের উদয় হয়েছিল। প্রাসাদের বাতায়ন পথে সুগায়িকা কিসা গৌতমী অনেকক্ষণ ধরে কুমারের সেই অপার্থিব সৌন্দর্য বিভূতি লক্ষ্য করছিলেন। কুমারের সেই অপার্থিব সৌন্দর্য বিভূতি তার অন্তরকেও স্পর্শ করেছিল। কুমারের সুন্দর মুখশ্রীর পানে তাকিয়ে আপন মনে মধুর কণ্ঠে তিনি গান গেয়ে উঠলেন ঃ

নিবৃত সে পিতা এ ধরায়
যাহার এহেন সন্তান

সে জননী পেয়েছে তাহাতে
বিপুল শান্তির সন্ধান
ধন্য ধন্য আজি এ বিশ্ব ভুবনে
সে গরীয়সী নারী
পতি এহেন যাহারি
নিঃসীম আনন্দ সাগরে ডুবিয়া
আহা সে পেয়েছে নির্বাণ।
(শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত অনুবাদ)

গায়িকার কন্ঠ থেমে গেল। কিন্তু সঙ্গীতের রেশ কুমারের অন্তর স্পর্শ করল। সঙ্গীতের শেষে নির্বাণ কথাটি শুনে কুমার একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। নির্বাণ শব্দটি তাঁর কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষণ করে দিল। তিনি মনে মনে কেবলই উচ্চারণ করতে লাগলেন, "নির্বাণ, আহা নির্বাণ"! সমস্ত দুঃখ জ্বালার পরিসমাপ্তি এই নির্বাণ। সেই পথের সন্ধানই ত তাকে পেতে হবে। জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত সেই অমৃতের সন্ধানই ত তাকে খুঁজে বের করতে হবে। গায়িকা কিসা গোতমী তাঁকে সে পথের সন্ধানই খুঁজে বের করবার জন্যে ইঙ্গিত জানিয়ে গেলেন। একথা মনে হতেই গায়িকার প্রতি কুমারের অন্তঃকরণ শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, আপন বহুমূল্য কন্ঠহারটিকে তিনি গায়িকার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন।

চিন্তামগ্ন মন নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোলেন কুমার। সেদিন তাঁর নিকট সমগ্র রাজপথটি কি রকম অদ্ভুত ধরনের ঠেকতে লাগল। সমগ্র রাজপথটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও অনুভব করতে থাকেন তাঁর নিজের অন্তঃকরণটিও ওই রাজপথটির মতই একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কুমারের সন্ধানী দৃষ্টি সেই জনমানবহীন রাজপথের মধ্যেও যেন কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে থাকে। অবশেষে রথ এসে দাঁড়ালো রাজোদ্যানের ফটকের সম্মুখে। রথ থেকে অবতরণ করলেন কুমার। ফটক পেরিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পতিত হল একজন সন্ন্যাসীর প্রতি। মন্থর গতিতে আপন মনে সন্ন্যাসী চলেছেন উদ্যানের সম্মুখের পথটি দিয়ে। সন্ন্যাসীর স্নিগ্ধ শান্তমূর্ত্তি দর্শনমাত্রই কুমারের মন আকৃষ্ট হল তাঁর প্রতি। অপলক নয়নে কুমার লক্ষ্য করতে থাকেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীর দেহে কোন বেশভূষা নেই। নেই কোন পারিপাট্য। তবু তাঁর সমগ্র দেহখানিকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে রেখেছে সংযমের অপার্থিব সৌন্দর্য। তাঁর সেই শান্ত মুখশ্রীতে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় আনন্দের আভা। অনেকক্ষণ ধরে একমনে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করার পরও তাঁর মনের সাধ যেন আর মেটে না। আভরণহীন দেহে এ ধরনের বিমল আভিজাত্য ইতিপূর্বে কুমার আর কখনও দেখেননি।

সন্ন্যাসীকে পথে চলতে দেখে কুমারের মনে হল, এ চলার যেন কোন সীমা নেই। এ চলার গতি সম্পূর্ণ বন্ধনহীন ও মুক্ত।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও কুমার সারথি ছন্দককে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। সেদিনও ছন্দক একই ভাবে সন্ন্যাসীর পরিচয় দিতে গিয়ে কুমারকে বলেছিলেন, ইনি একজন বন্ধনমুক্ত সর্ব-ত্যাগী পুরুষ। সংসারের কোন কিছুতেই এঁর কোন আসক্তি নেই। এর মৃত্যুভয় বলতেও কিছু নেই। তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন কুমার, সারথি ছন্দকের কথাগুলো। সারথির প্রতিটি কথাই গিয়ে গভীর রেখাপাত করল কুমারের অন্তরে। তিনি কেবলই ভাবতে থাকেন আহা এঁর অন্তরে কোন আসক্তি নেই, এঁর কোন মৃত্যুভয়ও নেই। ইনি একজন বন্ধনহীন পুরুষ। মনোরম সেই উদ্যানখানির একপ্রান্তে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে কুমার গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। ক্রমে অন্ধকার নেমে এল। কুমারের সেদিকে খেয়াল নেই। সারথির আহ্বানে কুমারের তন্ময়তা কেটে গেল। "কুমার এবার ফিরতে হবে।" স্বপ্নাবিষ্টের মতই যেন কুমারের মুখ দিয়ে উত্তর বেরিয়ে আসে, "হ্যাঁ চলো।" প্রাসাদে ফেরার পথে তিনি কেবলই ভাবতে থাকেন, কবে তিনিও হবেন ওই সন্ন্যাসীটির ন্যায় বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ। কবে তিনি সংসারের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়তে পারবেন, ওই সন্ন্যাসীটির মত উন্মুক্ত আকাশতলে, যেখানে পারবে না কেউই তাঁর পথের সীমা এঁকে দিতে। যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকবে না, জরা, ব্যাধি এবং সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যু। পর পর দুদিন জরা ও ব্যাধি দর্শনে তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ নিদারুণ অশান্তিতে ডুবে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীকে দর্শন করার পর তিনি সর্বপ্রথম সত্যের সন্ধান পেলেন। তাঁর মন পুলকিত হয়ে উঠল। জগতে যেমন দুঃখ রয়েছে, তেমনি তার নিরাময়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। তখনই তিনি মনে মনে সংকল্প স্থির করে ফেললেন, দুঃখ নিরাময়ের সেই পথটিকে যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীকে দর্শন করার পর, তাঁর অশান্ত উদ্বেলিত হৃদয়ে সর্বপ্রথমে অনুভব করতে সমর্থ হলেন, শান্তির সুমধুর পরশ। সেই সুমধুর পরশ তাঁর সমগ্র দেহমনে এনে দিল লাবণ্য বিজড়িত অনুপম স্নিগ্ধতা। তাঁর সেই শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করতে সমর্থ হলেন, প্রাসাদ ললনা সুগায়িকা কিসা গৌতমী।

রাজা শুদ্ধোদনের নিকট কুমার সংক্রান্ত সব কথাই ইতিমধ্যে পেঁছে গেছে। কুমারকে যে আর আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না, এটা তখন তাঁর কাছে একরূপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি রাখেননি এইটুকুই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

সেই দিনটি ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। অপরাহ্ন সময়ে অন্তঃপুর থেকে সংবাদবাহক সংবাদ নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে জানালো যে, তাঁর

পুত্রবধূ যশোধারা নির্বিঘ্নে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। এ সংবাদ শুনে রাজার আনন্দের আর সীমা রইল না। লুম্বিনীর বনভূমিতে নিজ পুত্রের জন্মসংবাদ শোনার পর সেদিন তাঁর মনে যেমন আনন্দের জোয়ার দেখা দিয়েছিল, তেমনি কুমারের মনও তাঁর পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই সেরকম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এতদিনে তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। এবার পুত্রের আগমন বার্তা শুনে, কুমারের মনে নিশ্চয়ই পরিবর্তন দেখা দিবে। এই সুসংবাদ শুনে পুত্রের প্রতি স্নেহের বশে নিশ্চয়ই কুমারের মন সংসারে আকৃষ্ট হবে। বিফল হবে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদবাণী। রাজা শুদ্ধোদন সংবাদ-বাহককে তক্ষুণি পাঠিয়ে দিলেন কুমারের নিকট, পুত্রের আগমন বার্তা শোনাবার জন্য। রাজার আদেশে কালবিলম্ব না করে সংবাদবাহক কুমারের নিকট উপস্থিত হয়ে জ্ঞাপন করলো সুসংবাদ। পুত্রের আগমনবার্তা শুনে কুমার খানিকক্ষণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে রইলেন, তারপর আপন মনেই অস্ফুটে উচ্চারণ করে উঠলেন, "রাহু এসেছে"। সংবাদবাহক বুঝে উঠতে পারেনি সে কথার মর্ম। কুমারের উচ্চারণও ঠিকমত তার কর্ণকুহরে গিয়ে প্রবেশ করেনি। সংবাদবাহক ফিরে গিয়ে রাজাকে জানালো, পুত্রের আগমনবার্তা শুনে কুমার আনন্দের আবেগে বলে উঠলেন, "রাহুল এসেছে।" দূতের মুখে কুমারের উচ্চারিত নাম শুনে রাজা পৌত্রের নামকরণ করলেন, "রাহুল"।

পুত্রের আগমনের সংবাদ শোনার পর কুমার অনুভব করলেন, সংসারে এক নতুন বন্ধন এসে উপস্থিত হয়েছে। এই বন্ধনপাশ ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই বন্ধন তাঁকে যেন কেবলই পিছন থেকে টেনে ধরছে। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। সেদিন আর সান্ধ্যভ্রমণে বের হলেন না তিনি। আজ্ঞাবহ সারথি ছন্দককে ডেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থককে যাত্রার উদ্দেশ্যে তৈরী করে রাখার জন্যে এবং সঙ্গে থাকার জন্যে তাকেও নির্দেশ দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদের বাইরে চলে এসে, পুষ্পোদ্যানটিতে প্রবেশ করলেন। আশ্চর্য, সেদিন কুমারের গতিবিধি কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো, সেই সঙ্গে কালো মেঘের দল এসে সমস্ত গগন-খানিকে আবৃত করে দিল। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও তাঁকে ঘিরে সুন্দরী তরুণীর দল নৃত্যগীতের আসর জমাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর উন্মনা ভাবের দরুণ তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। আসর ত্যাগ করে, রাত্রিকালীন আহারাদি সম্পন্ন করে, নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন কুমার। কিন্তু শয্যা গ্রহণ করলেন না। খানিকক্ষণ বাদেই তাঁর যাত্রা শুরু হবে। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এল। নিজের প্রকোষ্ঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর জীবন সঙ্গিনীর প্রকোষ্ঠটির নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। গবাক্ষ পথে কক্ষের অভ্যন্তরীণ স্নিগ্ধ মৃদু প্রদীপের আলোয় দেখতে পেলেন, নবজাত শিশুটিকে নিবিড়ভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে তাঁর জীবনসঙ্গিনী যশোধারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

নিজেরই অজান্তে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠল এক দুঃখিনী মায়ের চিত্র। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের তরে দুর্বলতা এসে তাঁর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে নিল। ক্ষণিকের সেই দুর্বলতা মুছে ফেলে দিয়ে পুনরায় তিনি সংযত করে নিলেন নিজেকে। একজন মাত্র দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে তো তিনি আসেন নি। এমনি লক্ষ কোটি দুঃখিনী মায়ের দুঃখ জ্বালা চিরতরে দূর করবার জন্যে কঠিন সংকল্প গ্রহণ করতেই তো অগ্রসর হয়েছেন তিনি। তাঁকে সেই পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে। থেমে যাবার মতো কোন উপায় তো তাঁর নেই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গবাক্ষ পথ থেকে ধীরে ধীরে তিনি সরিয়ে নিয়ে এলেন নিজেকে। তারপর প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে চলে এলেন উদ্যানের নিকটে। এক ঝলক বিদ্যুতের আলোকে দেখতে পেলেন সারথি ছন্দক আর তার প্রিয় অশ্ব কন্থককে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সময় মত সেখানে উপস্থিত রয়েছে। বাক্যব্যয় না করে কুমার কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলতে লাগলো অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থক। নিঃশব্দে মৌনমুখে তাদের অনুগমন করে চলতে লাগলেন সারথি ছন্দক। সে সময়ে ঘন মেঘাবৃত গগনে পুনঃ পুনঃ অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। সেই আলোকের সাহায্যে তাঁদের পথ অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেদিন এভাবে পুনঃপুনঃ অশনি সংকেত দ্বারা তাদের গন্তব্য পথের নিশানা এঁকে দিচ্ছিলেন। কুমারের গৃহত্যাগ বৌদ্ধশাস্ত্রে "মহাভিনিষ্ক্রমণ" নামে খ্যাত হয়ে আছে। তিনি যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল উনত্রিশ।

সারারাত্রি এভাবে পথ চলার পর তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন ক্ষুদ্রস্রোতা পাহাড়ী নদী অনোমার তীরে। তখন পূর্ব গগনে আলোর রেখা সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। এখান থেকেই কুমারের যাত্রা হবে শুরু। এবার সারথি ছন্দক এবং অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থকের নিকট থেকে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। শরীর থেকে একে একে রত্নাভরণ সমূহ উন্মোচন করে সেগুলোকে তিনি তুলে দিলেন সারথি ছন্দকের হাতে। তারপর রাজপরিচ্ছদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বেশ ধারণ করলেন। এখন আর তিনি সিদ্ধার্থ, অথবা কুমার গৌতম নন। এখন থেকে তাঁর পরিচয়, সন্ন্যাসী গৌতম। তাঁর সন্ন্যাসীর উপযুক্ত রিক্ত দৈন্য বেশ স্বচক্ষে দর্শন করে সারথি ছন্দক সেদিন অশ্রু সংবরণ করে নিজেকে স্থির রাখতে সমর্থ হননি। কি আশ্চর্য! অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থকেরও দুই চক্ষু প্লাবিত করে নির্গত হচ্ছিল অশ্রুধারা। সদ্য নবীন সন্ন্যাসী গৌতম তার প্রিয় অশ্ব কন্থকের মস্তকে দক্ষিণ কর স্থাপন করে আশীর্বাদ জানিয়ে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "কন্থক তুমি গৃহে ফিরে যাও।" অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থক সেদিন প্রভুর আজ্ঞা নীরবে নত মস্তকে মেনে নিয়েছিল। কন্থককে সঙ্গে নিয়ে সারথি ছন্দক রাজধানীতে ফিরে এলো। রাজধানীতে ফিরে এসে রাজপুরীতে প্রবেশ করার পরই অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থক প্রাণত্যাগ করে। কুমার গৌতমের "মহাভিনিষ্ক্রমণ" কাহিনীর অবতারণা

সময়ে সারথি ছন্দক এবং সেই সঙ্গে অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থকের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। সিদ্ধার্থের জন্মের একই দিনে সারথি ছন্দক ও অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থকেরও জন্ম হয়েছিল।

অনোমার তীরে সারথি ছন্দক এবং কন্থককে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে লাগলেন নবীন সন্ন্যাসী গৌতম। এখন আর তাঁর নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান বলতে কোন কিছুই নেই। কোথায় যেতে হবে, তা এখন তিনি নিজেই জানেন না। এখন পথই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। খানিকক্ষণ এভাবে চলার পর ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। আজ আর তাঁর নিকট উত্তম আহার্য বস্তু এবং সেই সঙ্গে সুপেয় নিয়ে কেউ উপস্থিত হবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোকালয়ে গিয়ে উপস্থিত হতে হল। নবীন সন্ন্যাসী দেখে স্থানীয় লোকালয়ের জনগণ একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। অমন সুন্দর যুবাবয়সের সন্ন্যাসী ইতিপূর্বে তাঁরা কখনও দেখতে পাননি। তাঁরা সেদিন তাঁর ভিক্ষাপাত্রটিকে পূর্ণ করে আহার্য বস্তু দান করেন। তাঁদের দেওয়া আহার্য গ্রহণ করে প্রথমটায় তা গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি তাঁর এলো না। পরক্ষণেই তাঁর মনে জেগে উঠল এখন তো তিনি সন্ন্যাসী মানুষ। ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ দ্বারাই তাঁকে এখন থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। তখন তিনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করে, ভিক্ষালব্ধ সেই আহার্য গ্রহণ করলেন। তারপর পুনরায় সেই উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই পথ চলতে লাগলেন। এভাবে পথ চলতে চলতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন মল্লদেশের অন্তর্গত অনুপিয় নামক স্থানে। সেখানে আশ্রমবাসী তাপসগণের সঙ্গে এক সপ্তাহকাল সময় কাটালেন। কিন্তু সেখানে তিনি এমন কোন গুরুর সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হলেন না, যিনি মোক্ষ লাভের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তবে সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারলেন যে, মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে প্রচুর পরিমাণে সাধু সন্ততি বাস করেন। সেখানে গেলে হয়তো উপযুক্ত গুরুর সন্ধান মিলবে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করে মগধের রাজধানী রাজগৃহের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে পুনরায় পথে পা বাড়ালেন।

অবশেষে তিনি এসে উপস্থিত হলেন রাজগৃহে। জনাকীর্ণ রাজগৃহের যেখানেই তিনি গমন করেন সেখানেই লোকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অমন রূপবান তরুণ সন্ন্যাসী তাঁরা স্বচক্ষে কখনও দর্শন করেন নি। ক্রমে এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গিয়ে পৌঁছাল মগধরাজ বিম্বিসারের নিকটে। রাজা বিম্বিসারের এমনিতেই সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁর রাজধানীতে সাধুসজ্জনদের যাতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর অতি প্রখর দৃষ্টি। তাঁর রাজধানীতে এরকম ধরনের একজন যুবা সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে শুনে, একদিন তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত

হলেন সেই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করবার জন্যে। সন্ন্যাসীকে দর্শন করা মাত্রই রাজা বিম্বিসার বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দিব্যকান্তি বিশিষ্ট অমন যুবা পুরুষটি সন্ন্যাসী হয়ে কঠিন তপশ্চর্যা পালন করবে, এটা রাজা বিম্বিসার যেন কোনমতেই অনুমোদন করতে পারছিলেন না। নবীন সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প থেকে বিরত করে, তাঁকে পুনরায় গৃহে ফিরে যাবার জন্যে অনেক অনুরোধ জানান। কোন মতেই কৃতকার্য হতে না পেরে অবশেষে রাজা বিম্বিসার তরুণ সন্ন্যাসীকে রাজগৃহে অবস্থান করে ধর্মাচরণের জন্যে একান্তভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাজার সেই বিনীত ও কাতর অনুরোধের উত্তরে সন্ন্যাসী জানান যে, মহাসত্যের সন্ধান লাভের জন্য তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করে কঠিন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি সেই সত্য বস্তুর সন্ধান লাভ করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এক স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়। তারপর তিনি রাজাকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, সত্য বস্তুর সন্ধান লাভ করার পর অর্থাৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি পুনরায় রাজগৃহে এসে রাজাকে দর্শন দান করবেন।

রাজগৃহে অবস্থান করলে অনেক প্রকারের বিঘ্ন এসে উপস্থিত হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি সত্বর রাজগৃহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে থাকেন। দিনের শেষে একবার মাত্র ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করে কোন মতে নিজের দেহটাকে সুস্থ রেখে কঠোর সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করতে থাকেন। তখনও তিনি কোন উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করে উঠতে পারেন নি। অনেক সন্ধানের পর অবশেষে তিনি সেকালের প্রসিদ্ধ তাপস গুরু অঢ়ার কালামের সন্ধান পেলেন। গুরু অঢ়ার কালামের ছিল প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান। নবীন সন্ন্যাসীকে তিনি নিজের অধীত জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশ করেন। সন্ন্যাসী গৌতম গুরু অঢ়ার কালামের উপদেশ মত আচরণ দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রদর্শিত নির্দিষ্ট পথের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করে, তিনি কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারলেন না। এবং মহাসত্যের সন্ধান লাভ করতেও সমর্থ হলেন না। তখন তিনি সব কিছুই গুরুর গোচরে নিয়ে এসে, তাঁর নিকট মহাসত্যের সন্ধান জানতে চাইলেন। গুরু তাঁকে সেই পথের নিশানা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনি গুরুকে প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং পুনরায় অন্য গুরুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে থাকেন। এবারে তিনি সন্ধান পেলেন গুরু রামপুত্র উদ্রকের। সেকালে তাপস গুরু অঢ়ার কালামের মত, গুরু রামপুত্র উদ্রকেরও খ্যাতি দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। নবীন সন্ন্যাসী রামপুত্র উদ্রকের নিকট উপস্থিত হয়ে, মহাসত্যের সন্ধান লাভের আশায় তাঁর শরণাপন্ন হলেন। গুরু রামপুত্র উদ্রক নবীন সন্ন্যাসীকে কৃচ্ছ্রসাধন মার্গ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় গুরুর নিকট থেকে কৃচ্ছ্রসাধন ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি পুনরায় গভীর তপশ্চর্যায় মগ্ন হলেন। এই তপশ্চর্যা অত্যন্ত কঠিন। এর নাম চতুরঙ্গ সাধনা। এই সাধনব্রত যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের চারিটি বিশেষ নিয়ম অবশ্যই পালন করে চলতে হয়। সেই চারিটি বিশেষ নিয়ম যথাক্রমেঃ তপস্বিতা, রুক্ষাচার, জুগুপ্সা ও প্রবিবেক। তপস্বিতা পালন করতে গিয়ে দেহ থেকে সামান্য বস্ত্রখণ্ডটুকুকেও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল। ফলে শীত গ্রীষ্মে তাঁকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করে চলতে হয়েছিল। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল বারণ। ফলমূল খেয়ে কোনরকমে শরীরটিকে টিকিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি। বৃক্ষ থেকে স্বহস্তে ফলমূল গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে ছিল বারণ। বৃন্তচ্যুত ফল অথবা ঝরে পড়া বৃক্ষপত্রাদি সংগ্রহ দ্বারা কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি পালন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। রুক্ষাচার পালন করতে গিয়ে শরীরের প্রতি কোন যত্নই তাঁর আর রইল না। পীড়াদায়ক কণ্টকময় শয্যা অথবা শ্মশানে শবাস্থির উপর শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। যাতে শরীরে কোন প্রকার সুখের অনুভূতি দেখা দিতে না পারে। এখানেই শেষ নয়, শরীরের পক্ষে যাতে কোন মতেই বিশ্রামসুখ লাভ হতে না পারে, সেজন্য তাঁকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যারত হতে হয়েছিল। এভাবে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক আচরণ বিধি পালন করতে গিয়ে, তিনি একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পেঁছালেন। তাঁর সমগ্র দেহখানি একটি চর্মাবৃত কঙ্কালে পরিণত হল। চক্ষু দুটি হল কোঠরগত। সমস্ত শরীরটি একেবারে ধুলো ময়লায় ঢেকে গিয়েছিল। সেই ধুলো ময়লা শরীর থেকে বিদায় দেওয়াও ছিল তাঁর বারণ। সামান্য পানীয় জলটুকু তাঁকে পান করতে গেলেও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁকে তা পান করতে হতো। কেননা জলবিন্দু গ্রহণ করার কালে অসাবধানতাবশতঃ যাতে কোন ক্ষুদ্র কীটের ক্ষতি হতে না পারে তার জন্যই ছিল এই সতর্কতা। এরই নাম জুগুপ্সা, অর্থাৎ পাপের প্রতি ঘৃণা। প্রবিবেক, অর্থাৎ নির্জন বাস পালন করবার জন্যে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল একেবারে নির্জন বনের ভিতর। লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ বারণ। সেইজন্য তাঁকে বন থেকে বনান্তরে অনবরতই কেবল ঘুরে বেড়াতে হোত। নির্জন বনের মধ্যে সাধনায় যখন তিনি একেবারে মগ্ন হয়ে যেতেন, সে সময়ে অনেক দুষ্টু রাখাল বালক তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতো। তাঁর কর্ণকুহরে সরু শুকনো ডাল প্রবেশ করিয়ে দিত, নয়ত তাঁর নগ্ন দেহের উপর মলমূত্র নিক্ষেপ করতো। রাখাল বালকগণের সে সব অত্যাচার উৎপীড়ন তিনি নীরবে সহ্য করে যেতেন। তাদের প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা দূরে থাক, তিনি তাদের প্রতি অপরিসীম স্নেহ পোষণ করতেন।

এই কঠোর চতুরঙ্গ তপস্যা তিনি পালন করে চলেছিলেন, গয়ার অদূরে গভীর বনের মাঝে। তাঁর এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত পালন সময়ে পাঁচজন তরুণ

ব্রাহ্মণ তাপস তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই পাঁচজন তরুণ-তাপস তাঁর কঠোর তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হয়ে, আদর্শ সন্ন্যাসী রূপে তাঁকে গুরুর পদে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তারা তাদের গুরুর সেবায় এবং পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই পাঁচজন তরুণ তাপস যথাক্রমে:—কৌণ্ডিন্য অশ্বজিৎ, বাস্প, মহানাম এবং ভদ্রক। এদের প্রধান ছিলেন কৌণ্ডিন্য।

এভাবে চতুরঙ্গ সাধন পথ আশ্রয় করে, সাধনব্রত পালন করতে গিয়ে তিনি প্রায় উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন। তাঁর পক্ষে আর উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। শরীরের এই দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। অথচ যার জন্যে এত ক্লেশ স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, তার কোন সন্ধান করে উঠতে সক্ষম হলেন না। তখন স্বভাবতই তাঁর মনে সন্দেহ এসে দেখা দিল, তার সাধনপথের কোথাও নিশ্চয়ই বড় রকমের কোন গলদ রয়ে গিয়েছে, যেটি তার সিদ্ধির পথের প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কঠোর ব্রত পালন করার পরেও যখন তিনি তাঁর সেই অভীপ্সিত ফললাভের পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হলেন না, তখন তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হল যে, এই কঠিন তপশ্চর্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। দেহ ও মন যদি সুস্থ না থাকে, তবে সেই অভীপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা সুদূরে পরাহত হয়ে পড়ে। এবারে একটি মাত্র প্রশ্নই বার বার প্রবলভাবে তাঁর মনকে নাড়া দিতে থাকে। সিদ্ধিলাভের তাহলে উপায় কি? কোন্ পথে অগ্রসর হলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব? যখন এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে বের করবার জন্যে তাঁর মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলছে, সে সময়ে দূর থেকে তাঁর কানে ভেসে আসতে থাকে বীণার সুললিত সুমধুর ঝঙ্কার ধ্বনি। সেই অপূর্ব সুরলহরী তাঁর উদ্বেলিত প্রাণে বুলিয়ে দিল শান্তির স্নিগ্ধ পরশ। একান্তভাবে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন তিনি বীণার সেই অপূর্ব ঝঙ্কার ধ্বনি। একটু পরে সেই বীণার ধ্বনি মাত্রা ছাড়িয়ে অতি দ্রুত লয়ে বেজে উঠলো। এতে তাঁর মন বিরক্তিতে ভরে গেল। একটু বাদে আবার সেই সুর ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল এবং অত্যন্ত ঢিমে তালে বাজতে আরম্ভ করলো। এবারও পূর্বের মতই তাঁর মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। নিজের অজান্তে বিরক্তিতে তিনি অস্ফুটে উচ্চারণ করে উঠলেন, "না না, এটাও নয়।" তারপর বীণার তন্ত্রী যখন মাঝ পথে ঠিক করে বাঁধা হল, তখনই কেবল তা থেকে অপূর্ব সুরলহরী নির্গত হতে লাগল। মাঝ পথে বাঁধা সেই সুরলহরী, এবারে তাঁর প্রাণে বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ। নিজের অজান্তেই তিনি উচ্চারণ করলেন, "হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।" এবার তিনি অন্তরে অনুভব করলেন, মানুষের শরীর যন্ত্রটিও ওই বীণা বাদ্যযন্ত্রটিরই মত। বীণার তন্ত্রী শ্লথ গতিতে বাঁধার ফলে যেমন তা থেকে সুরলহরী নির্গত হচ্ছিল না, তেমনি আবার উচ্চগ্রামে তন্ত্রী বাঁধার ফলেও তা থেকে উপযুক্ত সুরলহরী নির্গত হচ্ছিল না। যখন শ্লথগতি ও উচ্চগ্রাম উভয়ই

পরিত্যাগ করে মাঝপথে তন্ত্রী বাঁধা সম্পূর্ণ হল, কেবল তখনই তা থেকে অপূর্ব সুরলহরী নির্গত হতে লাগল। সে রকম এই শরীর যন্ত্রটিকেও যদি বিলাস-ব্যসন অথবা কৃচ্ছ্রসাধন এই উভয়বিধ পন্থা থেকে নিবৃত্ত করে ঠিকমতো মাঝামাঝি জায়গায় এনে দাঁড় করানো সম্ভব হয়, তবেই তা দিয়ে অভীষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। আয়ত নেত্র দুটি মুদ্রিত করে তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করতে লাগলেন, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তিনি সেখানেই তাঁর কঠোর সাধনপথের সমাপ্তি টেনে দিলেন। এবার তিনি অবলম্বন করলেন মধ্যম পন্থা। পঞ্চতাপসগণ যাঁরা এতদিন ধরে কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী সন্ন্যাসী গৌতমকে নিজেদের গুরু বলে মেনে নিয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের গুরুর এই আকস্মিক পরিবর্তনে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁদের মনে তখন দৃঢ় প্রত্যয় দেখা দিল যে, এতদিন ধরে তাঁরা যাঁকে গুরুর আসন দান করে তাঁর সেবা যত্ন করে চলেছিলেন তাঁদের সেই গুরু, ঋষি গৌতম হঠাৎ পথভ্রষ্ট হয়ে বিলাসিতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে তাঁকে আর গুরু বলে মেনে নেবার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও একবার শেষ পর্যন্ত না দেখে, তাঁরা কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না বলে মনস্থ করলেন। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে তাদের অবশ্য বেশী সময় অতিবাহিত করার কোন প্রয়োজন হয়নি।

ঋষি গৌতম মধ্যম পন্থা গ্রহণ করে পুনরায় সাধন পদ্ধতি আরম্ভ করেছেন। এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার ফলে তিনি হৃদয়ে শান্তি অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর মনে তখন দৃঢ় প্রত্যয় দেখা দিল, অচিরেই তিনি অভীষ্ট ফললাভ করতে সমর্থ হবেন। বৈশাখী পূর্ণিমার তিথি যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই তাঁর মন প্রাণ যেন কিসের এক অব্যক্ত আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর তখন কেবলই মনে হতে লাগল, সত্বরই তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ হতে চলেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা পক্ষের চতুর্দশী তিথির প্রভাতে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নানপর্ব সমাধা করে তীরে উঠে তিনি এক বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একেবারে ধ্যানে বিভোর হয়ে গেলেন। এমন সময় স্থানীয় সম্পন্ন গৃহস্থ কুলবধূ সুজাতা, পূর্ণা নামে দাসী সহ সেখানে এলেন। দাসীর হস্তে স্বর্ণনির্মিত পাত্রে সুরচিত পায়েস। যে বৃক্ষতলে ঋষি গৌতম ধ্যানে বিভোর হয়ে বসেছিলেন, সেই বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সুজাতা ইতিপূর্বে মানত করে গিয়েছিলেন যে, তার যদি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তিনি পুনরায় এসে বৃক্ষদেবতাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে যাবেন। এর পর সুজাতার ঘর আলো করে, তার কোলে সোনার চাঁদ ছেলে এসেছে। সেই জন্যই আজ চতুর্দশী তিথিতে স্বর্ণপাত্রে সুরচিত পায়েস নিয়ে এসেছেন তিনি বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য। বৃক্ষের ছায়ায় অমন ধ্যানমগ্ন শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে সুজাতার মনে দৃঢ়

প্রত্যয় জন্মালো যে স্বয়ং বৃক্ষদেবতাই সেখানে সন্ন্যাসীরূপে অবস্থান করছেন। সুজাতা তখন দাসীর হস্ত থেকে পায়েসের ভাণ্ডটি স্বহস্তে গ্রহণ করে, ভক্তিভরে সেটিকে নিবেদন করলেন ঋষি গৌতমকে। ঋষি গৌতম সুজাতার হস্ত থেকে সেই পূজোপহার উভয় হস্তে সাদরে গ্রহণ করে, সেই আসনে বসেই সুসংযত ভাবে আহার করলেন, সেই সুরচিত পায়েস। এদিকে বনমধ্যে বৃক্ষের আড়ালে নিজেদের গোপন রেখে পঞ্চতাপসগণ প্রত্যক্ষ করলেন সেই নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা। তখন ঋষি গৌতমের প্রতি ঘৃণায় তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হল। এবার তাদের মনে তাদের গুরু ঋষি গৌতম সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইলো না। তাঁরা তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন, ঋষি গৌতম শুধু পথভ্রষ্টই নন, বিলাসিতার পাপপঙ্কেও তিনি নিমজ্জিত হয়েছেন। তখনই তাঁরা তাঁদের গুরুকে পরিত্যাগ করে, উপযুক্ত নতুন গুরুর সন্ধানে বারাণসীর পথে পা বাড়ালেন এবং শেষ পর্যন্ত ঋসিপতনে এসে উপস্থিত হলেন।

সুজাতার নিবেদিত পায়সান্ন গ্রহণ করে তিনি শরীরে পুনরায় যেন বল ফিরে পেলেন। বহুদিন এমন উৎকৃষ্ট সুমধুর ভোজ্যদ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন নি। এ আহার মুছে দিল তার দীর্ঘ ছয় বৎসরের নিষ্ফল সাধনার পুঞ্জীভূত শরীরের গ্লানি। আহার শেষে সামান্য মৃৎপাত্রের মতোই তিনি সেই স্বর্ণ-পাত্রটিকে নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষেপ করার পর পাত্রটি কিন্তু নদীর জলে ডুবে গেল না। স্রোতের টানে এগিয়ে চলতে লাগল। ঋষি গৌতম খানিকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য করলেন পাত্রটির গতি। এগিয়ে চলা পাত্রটি যেন কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল ঋষি গৌতমকে। তখন তিনি পাত্রখানিকে অনুসরণ করে নৈরঞ্জনার তীর ধরে এগিয়ে চলতে লাগলেন। এভাবে চলতে চলতে ক্রমে অপরাহ্ন শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আর তার সাথে সমস্ত গগন প্লাবিত করে, দেখা দিল বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র আলোকধারা। সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর-খানিকে প্লাবিত করে দেখা দিল অপূর্ব আলোর ঝরণা ধারা। তাঁর সমস্ত দেহ মন যেন কিসের এক অব্যক্ত আনন্দে মেতে উঠলো। এমন সময়ে সম্মুখে তিনি দেখতে পেলেন, তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত অতি রমণীয় বনভূমি। বিলম্ব না করে সেই রমণীয় বনভূমিতে এক অশ্বত্থ তরুতলে আসন গ্রহণ করলেন তিনি। সিদ্ধিলাভ না করে আসন ত্যাগ করবেন না তিনি, এই কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসন গ্রহণ করার পর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি-মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভং নৈবাসনাৎ
কায়মতশ্চ লিষ্যতে॥

(এ আসনে আমার হাড়, মাংস, চামড়া শুকিয়ে যাক, দেহ বিলীন হোক তবুও সিদ্ধিলাভ না করে ত্যাগ করবো না এই আসন।)

ঋষি গৌতমের উচ্চারিত এই কঠিন প্রতিজ্ঞাবাণী শুনে সমগ্র মার রাজ্য

কম্পিত হয়ে উঠল। স্বয়ং মার তার ছয় কন্যা সহ, সমগ্র রিপুবাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেই বনভূমিতে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য যে করেই হোক ঋষি গৌতমকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে তাঁকে তপস্যা থেকে চ্যুত করতেই হবে। মহাভিনিষ্ক্রমণের রাত্রিতেও মার কুমার গৌতমকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু কুমার গৌতমের দৃঢ় সংকল্পের নিকট শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই আজ সে তার ছয় কন্যাসহ সমগ্র রিপুবাহিনী নিয়ে পুনরায় এসে উপস্থিত হয়েছে তার প্রথমবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। মারের রিপুবাহিনী প্রথমে ঋষি গৌতমকে নানাভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে। তাদের সেই প্রচেষ্টা বিফল হলে তারা তখন নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মারের ছয় কন্যা সুপেয় পরিপূর্ণ সুবর্ণ কলসী হস্তে প্রায় বিবসনা অবস্থায় ঋষি গৌতমের সম্মুখে হাস্যে লাস্যে এবং কুৎসিৎ দেহ ভঙ্গিমা দ্বারা তাঁর ধ্যান-ভঙ্গ করার জন্যে নিষ্ফল প্রয়াস চালালো। ঋষি গৌতমের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে তারা কোনমতেই সমর্থ হল না। সূর্যাস্তের পূর্বেই মারের রিপুবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করে অবশেষে পলায়নে বাধ্য হল।

ঋষি গৌতম আসনে উপবেশন করার প্রায় সাথে সাথেই গভীরভাবে ধ্যান-নিমগ্ন হলেন। ক্রমে একটির পর একটি করে তিনি ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে লাগলেন। সর্বপ্রথমে তিনি ধ্যানের যে স্তরটি অতিক্রম করলেন, তার নাম "পূর্বনিবাসানুস্মৃতি"। এই স্তর অতিক্রম করার পর তিনি তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের চিত্রসকল দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন এবং জাতিস্মর হলেন। এই জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর, রাত্রির প্রথম ভাগে। এর পর ধ্যানের যে স্তরটি তিনি অতিক্রম করলেন, তার নাম "চ্যুতোৎপত্তি"। এই স্তর অতিক্রম করার সাথে সাথে তাঁর নিকট জন্ম-মৃত্যুর সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। তখন তিনি জীব জগতের আসা যাওয়া সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এই জ্ঞান তাঁর আয়ত্বে এল রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তিনি অতিক্রম করলেন ধ্যানের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরের নাম "আশ্রবক্ষয়"। এই স্তরে উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে তাঁর মন থেকে কামনা বাসনা প্রভৃতি সর্বপ্রকার রিপু চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল। এবার তিনি হলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও বন্ধনহীন। এখানেই হল তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। এ অবস্থাকে কোন মতেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভাষা এখানে সম্পূর্ণ মূক। সাধনার চরম শিখরে এবার তিনি আরোহণ করলেন। এবারে হলেন তিনি বুদ্ধ। এখানেই হল তাঁর সর্বপ্রকার কর্তব্যের অবসান। এরপর করণীয় বলতে তাঁর পক্ষে আর কিছুই নেই। তখন তিনি নিজেই উচ্চারণ করে উঠলেন, "নত্থী উত্তরী করণীয়ং"। এখন থেকে তাঁর বুদ্ধ জীবনের আরম্ভ। এখন আর তিনি ঋষি গৌতম নন। এখন থেকে তিনি

হলেন প্রভু বুদ্ধ। যেদিন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন, সেই দিনই তাঁর প'য়ত্রিশ বছর আরম্ভ হয়েছিল। ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হল।

বুদ্ধত্ব লাভের পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তরে অনুভব করতে লাগলেন বিপুল আনন্দ। সেই অসীম আনন্দে অধীর হয়ে সেই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই সমস্ত বনভূমি প্রকম্পিত করে তিনি আপন মনে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন ঃ

অনেক জাতি সংসারং সন্ধ্যাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তনহানং খয়মজ্ঝগা।
—বহু জন্ম ব্যর্থ ভাবে ফিরিয়াছি তাহার সন্ধানে
এই দেহ গৃহ মোর কে কোথায় গড়িছে গোপনে
ওগো গৃহকার! আজি এই দিনে দেখিনু তোমায়,
কৃতকার্য হবে নাকো তুমি আর গৃহ রচনায়,
যত ছিল কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়াছি আমি একে একে
উন্মুলিয়া গৃহকূট চিরতরে চোখের পলকে।
সকল সংস্কার আজি গেছে খসি মোর চিত্ত হতে।
তৃষ্ণা নিঃশেষিত করে মগ্ন আমি বিপুল শান্তিতে।
(শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত অনুবাদ)

ক্রমে প্রভাতী আলোর রেখা দেখা দিল। অসীম আনন্দে তাঁর হৃদয় মন এতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যে, আসনখানিকে ত্যাগ করার কথাটি পর্যন্ত তাঁর মনে দেখা দেয়নি। সেই আসনখানিতে অবিচলিত চিত্তে একই অবস্থায়, তিনি আরও সাতটি দিন কাটিয়ে দিলেন। এই সাতটি দিনের মধ্যে তিনি শরীর কৃত্যাদি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। সাতদিন পরে যখন তিনি আসনখানি ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সর্বপ্রথম তাঁর মনে এল অশ্বত্থ বৃক্ষটির কথা। যার সুশীতল ছায়ায় বসে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন। বৃক্ষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে গিয়েছিল। অপলক নয়নে বৃক্ষটির প্রতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে, নয়নজলে প্রথমে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তারপর যোড়করে বৃক্ষটির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এইটি বুদ্ধের বোধিতরু পূজা নামে খ্যাত হয়ে আছে। বৃক্ষটির ছায়ায় বসে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে, বৃক্ষটিকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়ে থাকে।

বোধিতরুর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তিনি পথ চলতে থাকেন, এবং এভাবে খানিক দূরে পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর, আর

একটি বিশাল বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে আসন গ্রহণ করলেন। এই বৃক্ষটিকে বলা হত অজপাল বটবৃক্ষ। রাখাল বালকেরা অজপাল নিয়ে বনের মধ্যে এসে মধ্যাহ্ন দিনে এর সুশীতল ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতো, সেই জন্যই বৃক্ষটি অজপাল বটবৃক্ষ নামে পরিচিত হয়। বুদ্ধ যখন সেই অজপাল বটবৃক্ষের ছায়ায় সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছেন, সে সময়ে মারের তিন কন্যা, রতি, অরতি ও তৃষ্ণা তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তারা তিনজনেই হাস্য, লাস্য ও বিভিন্নপ্রকার অঙ্গভঙ্গিমা পরিবেশন করে পুনরায় বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। ইতিপূর্বে তারা যে পরাজয় স্বীকার করে পলায়নে তৎপর হয়েছিল, সেজন্য তারা কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। শেষে বুদ্ধ মারের তিন কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যার মন থেকে কামনা, বাসনাসহ সর্বপ্রকার আসক্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে গেছে তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন কি? বুদ্ধের বচনে মারের তিন কন্যা সেখান থেকে পুনরায় পলায়নে বাধ্য হয়।

এরপর বুদ্ধ সেই বৃক্ষটির সুশীতল ছায়ায় আসন গ্রহণ করে সেখানে আরও সাতটি দিন সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। সাতদিন পরে ধ্যানভঙ্গের পর যখন তিনি পুনরায় নয়ন মেলে তাকালেন, তখন দেখতে পেলেন একজন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে গর্বোদ্ধিত-ভাবে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, বুদ্ধ যথাযথভাবে সে সকল প্রশ্নের উত্তরদান করেন। বুদ্ধের উত্তর শুনে ব্রাহ্মণ তখন গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েন। এই একটি মাত্র লোক ব্যতীত গত দু'সপ্তাহের মধ্যে অপর কোন লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

অজপাল বটবৃক্ষ ত্যাগ করে এরপর তিনি চলে এলেন নিকটবর্তী মুচলিন্দ নামক স্থানে। সেখানে এসে তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় আসন গ্রহণ করে ধ্যানে বিভোর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এবং মুষলধারায় বর্ষণ চলতে লাগল। সে সময়ে একটি বিশালকায় সর্প এসে বুদ্ধের দেহটিকে বেষ্টন করে তাঁর মস্তকের উপর বিশাল ফণা বিস্তার করে তাঁকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে লাগল। সাতদিন ধরে এই একই ভাবে বর্ষণ চলল এবং সেই সর্পরাজ একই ভাবে বৃষ্টির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। সাতদিন পর আকাশ বর্ষণমুক্ত হলে বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হল এবং কর্তব্য শেষ করে সর্পরাজও সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বর্ষণ শেষে প্রভাতের আলোয় সেই বনভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই সুন্দর নির্জন বনভূমিতে বুদ্ধ ভাবাবেগে নিজের মনে গেয়ে উঠলেন ঃ

সুখো বিবেকো তুট্‌ঠস্‌স সুতধম্মস্‌স পসসতো
অব্যাপজ্জং সুখং লোকে পানভূতেষু সংযমো

সুখা বিবসতা লোকে কামনং সমতিক্কমো -
অস্মিমানস্স যো বিনোযো এতং বেপরমং সুখং।

(—মন যার ডুবিয়াছে ধর্মের গভীরে
তুষ্ট সদা মন লঙ্ঘি ক্ষোভের সমীরে
তাহার বিবিক্তবাস কি আনন্দময়,
অহিংসা বাড়ায় তার আনন্দ সঞ্চয়।
বৈরাগ্য আনন্দময় কামনা বর্জন
পরম আনন্দ আত্মা অস্মিতানাশন।)

(শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত অনুবাদ)

বুদ্ধত্ব লাভের পর একের পর এক ধ্যানগম্ভীর অবস্থার মধ্য দিয়ে বুদ্ধ তিন সপ্তাহ সময় কাটিয়ে দিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করা তো দূরের কথা সামান্য জলটুকু পর্যন্তও গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সুজাতার নিকট থেকে পায়সান্ন গ্রহণ করার পর, আজ একুশদিন পরে তিনি পুনরায় আহার গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করলেন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে সেই বনভূমি থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথের নিকটে এলেন এবং একটি পিয়াল বৃক্ষের নীচে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হলেন। সে সময়ে উৎকল দেশীয় বণিক-যুগল তপস্সু ও ভল্লিক পণ্য বোঝাই গোশকটসমূহ নিয়ে সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন রাজধানী রাজগৃহের উদ্দেশ্যে। এমন সময় অকস্মাৎ তাদের পূর্ববর্তী শকটখানির গতি বাধা পেল। সেই সঙ্গে পশ্চাতের শকট-সমূহের গতিও রুদ্ধ হল। এভাবে শকটের গতি বাধাপ্রাপ্ত হবার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য উভয়েই পূর্ববর্তী শকটখানির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই উভয়েই দেখতে পেলেন, দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন অপূর্ব একটি সাধু পুরুষ ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাদের শকটটির সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। অমন স্নিগ্ধ দীপ্তি সমন্বিত সাধু পুরুষ বণিকদ্বয় ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি। প্রথম দর্শনেই বণিকদ্বয় এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, আর কালবিলম্ব না করে, তারা সেখানেই বুদ্ধের চরণ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে, তাঁর শরণ কামনা করে বলে উঠলেন, প্রভু, আমরা আপনার শরণ নিলাম, আমরা আপনার ধর্ম গ্রহণ করলাম। বণিকদ্বয় এর পর নিজেদের খাদ্য ভাণ্ডার খুলে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রখানিতে উৎকৃষ্ট ছাতু ও মধু ঢেলে দিলেন। বুদ্ধ তাদের দেওয়া সেই আহার্য সেখানে বসেই সুসংযতভাবে আহার করলেন। সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধের সেই প্রথম আহার্য গ্রহণ। এই বণিকদ্বয়ই সর্বপ্রথম দ্বিশরণ উচ্চারণ করেছিলেন বলে বৌদ্ধ জগতে এঁরা দুজনে প্রথম দ্বিবাচিক উপাসক হিসাবে অমর হয়ে আছেন।

এবারে বুদ্ধ ভাবতে লাগলেন, কাকে জানাবেন সর্বপ্রথমে তাঁর অপূর্ব সিদ্ধিলাভের উপায় বৃত্তান্ত। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর প্রথম গুরু

অঢ়ার কালামের কথা। তাঁর মত সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন, মহাজ্ঞান লাভের উপায়ের পথ। তখনই তিনি জানতে পারলেন যে, গুরু অঢ়ার কালাম আর ইহলোকে বর্তমান নেই। মাত্র এক সপ্তাহকাল পূর্বে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। তখন তাঁর মনে পড়ল তাঁর দ্বিতীয় গুরু রামপুত্র উদ্রকের কথা। কিন্তু তিনিও তো কিছুদিন হোল গত হয়েছেন। তখন তিনি মনে মনে একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, কারুর নিকটই তিনি ব্যক্ত করবেন না তাঁর অপূর্ব সিদ্ধিলাভের পথ। কেননা যে পথের সন্ধান সহজে লাভ করতে পারা যায় না এবং যে পথে চলতে হবে একমাত্র নিজেকে, সে পথের সন্ধান দিলেও লোকে তা গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং সে সংকল্প ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। জীবনের অবশিষ্ট দিনকটিকে একান্তে নিভৃতে কাটিয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করে তিনি পুনরায় চলে এলেন বোধি-বৃক্ষের নিকটে। বোধিবৃক্ষের সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে, একটু আগেই তিনি যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, কারুর নিকটই ব্যক্ত করবেন না তাঁর সিদ্ধিলাভের উপায়, সেই সংকল্পের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্তে। পুষ্করিণীতে তখন ছোট বড় প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর পরিমাণে পদ্মফুলে ভরে ছিল। কোনটি জলরেখার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, কোনটি মৃণালদণ্ডে ভর করে ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। আবার কোনটি প্রস্ফুটিত হবার মত সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে আছে। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার পদ্মফুল প্রত্যক্ষ করার পর, তাঁর মনে তখন আপনা থেকেই প্রতীতি জন্মাল যে, জগতের মনুষ্য সমাজের অবস্থাও ওই পুষ্করিণীটির পদ্মফুলগুলোর অবস্থারই অনুরূপ। কেউ স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউ তীক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত, কেউ মলিন, কেউ ভীরু প্রকৃতির, আবার কেউ মহান ইত্যাদি। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সাধন পথে অগ্রসর হবার পূর্বে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানুষের দেহযন্ত্রটি বীণাবাদ্য যন্ত্রটির অনুরূপ। এবার পুষ্করিণীটির বিভিন্ন অবস্থার পদ্মফুলের মধ্যে তিনি বিভিন্ন অবস্থার মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পেলেন। এবারে তিনি তাঁর পূর্বের সংকল্প পরিত্যাগ করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, জগতে যখন বিভিন্ন ভাবের এবং বিভিন্ন প্রকারের লোক রয়েছে, তখন তাঁর জ্ঞাত সত্যোপলব্ধির পথ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত লোকও নিশ্চয়ই রয়েছে। সুতরাং তাদের জন্যে অন্ততঃ মহাজ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবারে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর তিনি সেই পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়িয়েই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "অমৃতের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক"। পুষ্করিণীর তীরে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ভারতের অবিস্মরণীয় সম্রাট ধর্মাশোক সেই স্থানটিতে লাল বেলে পাথরের একটি অনুচ্চ স্তম্ভ স্থাপন করে চিরকালের জন্য সেই পবিত্র স্থানটিকে

চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছেন। সেই স্তম্ভটি আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

মানব কুলকে অমৃতের সন্ধান দেবার জন্যে মনে মনে স্থির সংকল্প গ্রহণ করে পুনরায় ফিরে এলেন অজপাল বটবৃক্ষটির নিকটে। সেখানে এসে তিনি ভাবতে লাগলেন, কাকে প্রথম জানাবেন তাঁর ধর্মের পথ। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল সেই পঞ্চতাপসগণের কথা। যাঁরা একদিন তাঁকে প্রাণঢালা সেবা যত্ন করেছিলেন। পরে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ তাঁকে পরিত্যাগ করে কাশীর পথে মৃগদায়ে চলে গিয়েছেন। তিনি স্থির করলেন মৃগদায়ে উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম তাদের নিকটই সত্য উদ্‌ঘাটন করবেন। তখনই তিনি সেখানে থেকে মৃগদায়ের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্যে তিনিই সর্বপ্রথমে পরিক্রমা শুরু করলেন। মৃগদায়ের পথে তিনি গয়ার নিকটবর্তী গয়াশীর্ষ অথবা ব্রহ্মযোনী পাহাড়ে কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর শিষ্যগণের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার জন্যে "আদীপ্ত পর্যায়" (পালি আদিত্য পরিয়ায়) সূত্রটি উদ্ভাবন করে, এখানে সেটিকে সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করেছিলেন। এক মাসেরও কিছু বেশী সময় ধরে পথ চলে অবশেষে তিনি এসে উপস্থিত হলেন মৃগদায়ে। মৃগদায়ে পৌঁছাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথমে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেকালের একনিষ্ঠ পরিব্রাজক উপকের সঙ্গে। উপক তাঁর অপূর্ব দিব্যকান্তি দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। তারপর তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, "ঋষি আপনার গুরু কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ পরিব্রাজক উপককে জানিয়েছিলেন, আমি অন্তরস্থিত সমস্ত রিপুদিগকে নির্মূল করার পর হয়েছি সর্বজয়ী, সর্বদর্শী, সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত সর্বত্যাগী এবং মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এখন আমি আবার কার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে যাব ? আমার কোন গুরু নেই। এই সর্বপ্রথম তিনি পরিব্রাজক উপকের নিকট নিজের সত্য উপলব্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করলেন। সামান্য এই কটি শব্দের মধ্যে বুদ্ধ প্রবর্তিত মতবাদের সারমর্ম নিহিত রয়েছে। পরিব্রাজক উপক বুদ্ধের কথা শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়ে, শুধু জানালেন আপনি যা বলছেন, তা হতে পারে।

পঞ্চতাপসগণ তাদের পূর্বতন গুরু ঋষি গৌতমকে দূর থেকেই মৃগদায়ের পথে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। গুরুকে আসতে দেখে তাদের মধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। এতদিন পরে গুরুকে দেখতে পেয়ে সেদিন তাদের মনে গুরুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেও কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি। গুরুর জন্যে তারা সেদিন কেবলমাত্র একখানা আসন ভূমিতে পেতে রেখেছিলেন। ঋষি গৌতমের প্রতি অবজ্ঞার ভাব তখনও তাদের মনকে পূর্বের মতই দৃঢ়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বুদ্ধ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট আসনখানিতে উপবেশন করলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে

গিয়েছে। সে দিনটি ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। ছয় বৎসর পূর্বে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথির রাত্রিতেই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আজ ছয় বৎসর পর, সেই পুণ্য তিথিতেই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্যবর্গকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে শুভ্র চাঁদের আলো এসে সেই ক্ষুদ্র সভাটিকে সেদিন আলোকিত করে তুলেছিল। সেই স্নিগ্ধ আলোর মাঝে উন্মুক্ত আকাশতলে, তাপসগণকে স্বস্নেহে সম্ভাষণ জানিয়ে, সুমধুর বচনে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করলেন বুদ্ধ। প্রথমে তাপসগণ বুদ্ধের কথায় প্রত্যয় মানতে চাননি, এবং তাঁকে শ্রমন গৌতম বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ করে বলেন, তথাগতকে নাম ধরে কখনও সম্বোধন করো না। এই সর্বপ্রথম তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করলেন। এরপর বুদ্ধ সুমধুর ভাষায়, সুললিত ছন্দে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে পুনরায় উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে তাদের অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে।

ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন যে, মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হতে হলে সন্ন্যাসীকে সর্বপ্রথম বর্জন করতে হবে দুটি পথ। তার প্রথমটি হল বিলাসময় জীবনযাত্রা। বিলাসিতা বা বিলাসময় জীবন অতি দ্রুত মানবমনকে ইন্দ্রিয়পরতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানবমনে নেমে আসে হীনমন্যতা, অশ্লীলতা। এই সকল নীচভাব মানবমনে অতি দ্রুত তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তোলে। এই তৃষ্ণা থেকে জন্মায় আসক্তি। আসক্তি টেনে নিয়ে আসে কামনা, বাসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাসকল। এই কামনা বাসনা থেকেই পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা, ব্যাধি ও শেষে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে মানবমনকে অশেষ প্রকারের দুঃখ কষ্টের ভাগী করে তোলে। সুতরাং এ জগতে তৃষ্ণাই হল মানবদুঃখের মূল কারণ। মাকড়সার জালের মত এই তৃষ্ণার জালে জড়িত হয়েই মানুষ পুনঃ-পুনঃ অশেষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হতে থাকে। সুতরাং সকল দুঃখের মূল কারণ এই তৃষ্ণাকে মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলতেই হবে। এই তৃষ্ণাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎসারিত করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানবের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলের প্রতি ক্রমাগতই আকৃষ্ট হতে থাকবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মানবের পক্ষে কোন মতেই পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

এই তৃষ্ণার জাল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তিনি তাদের নিকট চার আর্য-সত্য উদ্ঘাটন করলেন ঃ—(১) জগৎ দুঃখময়। (২) দুঃখের কারণ আছে। (৩) দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাবার পথ আছে। (৪) অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করলে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব।

মুক্তিকামী সন্ন্যাসীকে দ্বিতীয় যে পথটি বর্জন করতে হবে তা হল কৃচ্ছ্র-সাধন পথ। কৃচ্ছ্রসাধনের নামে মানুষ শুধু তার নিজের শরীরটিকেই পীড়ন

করে না, সেই সঙ্গে পীড়ন করে তার নিজের মনকেও। পীড়িত দেহ এবং অবসাদগ্রস্ত মন নিয়ে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। অভীষ্ট ফললাভ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং সেই সঙ্গে সুস্থ মন। সুতরাং মুক্তিপথের পথিককে বিলাসময় জীবনের ন্যায় কৃচ্ছ্রসাধন মার্গও সর্বাগ্রে সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করে চলতে হবে। এরূপর মধ্যমপন্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে বীণার সুরের সঙ্গে উপমা দিয়ে বললেন, মানুষের এই দেহযন্ত্রটি ওই বীণার তন্ত্রীর ন্যায় যখন মধ্যপথে ঠিকমত স্থাপন করা হবে, কেবল তখনই অভীষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। উন্মুক্ত আকাশ তলে, শুভ্র চাঁদের আলোয়, অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশে বুদ্ধ অতি সহজভাবে একটির পর একটি বর্ণনা দ্বারা তাদের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে, তাদের মনকে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করলেন। সর্বপ্রথমে তাপসগণের নায়ক কৌণ্ডিন্যের মন থেকে ঋষি গৌতম সম্বন্ধে তাদের সেই পূর্বের ভ্রান্ত ধারণার সম্পূর্ণ নিরসন হল। তিনি তখন বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করে, প্রথম দিনেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। নায়ক কৌণ্ডিন্যের দীক্ষালাভের পরেও অপর চারজনের মন থেকে বুদ্ধ সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব একেবারে বিদূরিত হয়নি। পরের দিন বুদ্ধ আবার তাদের একত্রিত করে, তাঁদের সম্মুখে ধর্ম নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এবার দ্বিতীয় দিনে বাষ্পের মন থেকে তাঁর পূর্বতন গুরু সম্বন্ধে সকল প্রকার সংশয় দূর হয়ে গেল এবং তিনি বুদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে তৃতীয় দিনে ভদ্রক, চতুর্থ দিনে মহানাম এবং পঞ্চম দিনে অশ্বজিৎ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তাঁরা নতুনভাবে এবং নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন।

বুদ্ধ এরপর তাঁর শিষ্যদের সম্বোধন করে বলেন, ভিক্ষুগণ এখন থেকে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্যে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মচর্যে ব্রতী হও। এই হল তাপসগণের দীক্ষামন্ত্র। বুদ্ধ তাঁদের ভিক্ষাব্রত দান করে ভিক্ষু করে নিলেন। তাপসগণকে ভিক্ষাব্রত দান করার পর থেকেই সৃষ্টি হল ভিক্ষু সংঘের। ইতিপূর্বে উৎকল দেশীয় বণিকদ্বয় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, আর এবার পঞ্চতাপসগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বণিকদ্বয়ের সময়ে সংঘের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এখন থেকে সংঘের সৃষ্টি হল। এই পঞ্চতাপসগণ বৌদ্ধ জগতে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে পরিচিত হয়ে আছেন। এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটেই বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, তাঁর এই প্রথম ধর্মোপদেশই "ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র" নামে খ্যাত হয়ে আছে। এই পাঁচজন শিষ্যকে নিয়ে বুদ্ধ মৃগদায়েই সাময়িকভাবে অবস্থিতি করতে থাকেন। দিবাভাগে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্যে বারাণসীর পথে লোকালয়ে তাঁকে আসতে হোত।

*সেকালের বারাণসী নগরের বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র যশ একদিন দেখতে পেলেন বুদ্ধকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে। শান্ত, সৌম্য ভাবনাহীন এই সন্ন্যাসীকে দর্শন করার পর থেকেই তার মন আকৃষ্ট হয় সন্ন্যাসীর প্রতি। ভোগবিলাসময় জীবনযাত্রার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও বারাণসী পুত্র যশের মনে শান্তি ছিল না। বুদ্ধকে দর্শন করার পর, সেদিন নিশীথে নিজের প্রাসাদোপম কক্ষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করেও যশের নিদ্রা এলো না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, তার আত্মীয় পরিজনেরা সকলে মিলে কেবলই তার উপর নিদারুণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তার শয্যার চতুষ্পার্শে শ্রান্ত, ক্লান্ত নর্ত্তকীগণ মেঝের উপরই গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এ রকম দৃশ্য যশের নিকট কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। সে কালে ধনী ব্যক্তিগণ তাদের নিজেদের অট্টালিকায় গায়িকা এবং নর্তকীদলকে প্রতিপালন করতেন। এজন্য তারা সমাজে নিন্দনীয় হতেন না, বরং যিনি যত অধিক পরিমাণে গায়িকা এবং নর্তকী সম্প্রদায়কে প্রতিপালন করতেন, সমাজে তিনি তত অধিক পরিমাণে সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত হতেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী তাঁর পুত্র যশের মনোরঞ্জনের জন্য একদল গায়িকা এবং নর্তকীকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে রাত্রিতে মেঝের উপর ইতস্ততঃ শায়িতা নর্তকীগণকে দেখে, ভয় পেয়ে একেবারে শিউরে উঠলেন যশ। তার মনে হল যেন শ্মশানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শবসমূহ পড়ে আছে। তার চোখে সে রাত্রিতে নিদ্রা আর এলো না। থেকে থেকে তার কেবলই চোখের সামনে দেখা দিতে থাকে ভাবনাহীন, সেই শান্ত, সৌম্য সন্ন্যাসীর সুন্দর মূর্তিখানি। নিজের মনের ভাব রুদ্ধ করে রাখতে পারলেন না শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ। স্বগতোক্তিতে বলে উঠলেন, আহা অমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলে তবেই জীবনে শান্তি লাভ করা সম্ভব। আর কালবিলম্ব না করে সেই গভীর নিশীথে যশ ধীরে ধীরে শয্যা কক্ষ ত্যাগ করে চলে এলেন প্রাসাদের বাইরে। তারপর ছুটে চললেন সেই শান্ত, সৌম্য, ভাবনাহীন সন্ন্যাসীর আশ্রমের অভিমুখে, মৃগদায়ে। পূব গগনে তখন সবেমাত্র প্রভাতী আলোর রেখা দেখা দিয়েছে সেই সময়েই বুদ্ধ বেরিয়েছেন পথে, তাঁর নিত্যকার প্রভাতী ভ্রমণে। এমন সময়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দাঁড়াল যশ। যশকে দেখতে পেয়ে তিনি প্রথমেই বলে উঠলেন, এখানে নেই কোন উপদ্রব, নেই কোন অত্যাচার। যশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

* বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুরো নাম বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। সব যায়গাতেই তার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীই বলা হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ বারাণসীই ছিল তার প্রকৃত নাম। সর্বপ্রথমে ত্রিবাচিক উপাসক হিসেবে যিনি সমগ্র বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, তার যদি অন্য কোন নামের পরিচয় থাকতো তবে বৌদ্ধ সাহিত্যের কোথাও না কোথাও সেই নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যেত।

চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষুব্রত দান করে, ভিক্ষু সংঘে স্থান দিলেন। বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা যশকে নিয়ে এবার দাঁড়াল আট।

এদিকে প্রভাত হওয়ামাত্র যশের অন্তর্ধানে শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে মহাকোলাহল আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে বুদ্ধের আশ্রমের দিকে যশের আগমনের সংবাদ বারাণসী-শ্রেষ্ঠী কেমন করে যেন সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। পুত্রের সন্ধানে তিনি তখনই ছুটে চলে এলেন বুদ্ধের আশ্রমে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে যশের পিতা জানতে পারলেন যে, তাঁর পুত্র দীক্ষা গ্রহণ করে, ইতিমধ্যে মানবজীবনের এক অতি উচ্চস্তরে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন। পুত্রের উন্নত অবস্থার কথা শুনে যশের পিতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। বুদ্ধ তখন যশের পিতাকেও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজেও ধর্মের গভীরে নিমজ্জিত হলেন এবং বুদ্ধের শরণ কামনা করলেন। বুদ্ধ তাকে দীক্ষা দান করলেন। দীক্ষান্তে বারাণসীশ্রেষ্ঠী মনের আবেগে সর্ব প্রথম উচ্চারণ করলেন ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ইতিপূর্বে উপসুস ও ভল্লিক বণিকদ্বয় উচ্চারণ করেছিলেন দ্বিশরণ। আর এবার যশের পিতা বারাণসীশ্রেষ্ঠী উচ্চারণ করলেন সর্বশেষে সংঘের নাম। সংঘং শরণং গচ্ছামি। বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রথম ত্রিবাচিক উপাসক হিসাবে তিনি অমর হয়ে আছেন। এরপর যশের মাতা এবং তার স্ত্রীও বুদ্ধের নিকট থেকে প্রথমে দীক্ষা এবং পরে প্রবজ্যা গ্রহণ করলেন। যশের দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ পেয়ে, তাঁর চুয়ান্নজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বুদ্ধের নিকট দীক্ষা এবং পরে প্রবজ্যা গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ এবার তাঁর শিষ্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যাও ভিক্ষুগণ তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ করে ধর্ম দীক্ষাদানে প্রবৃত্ত হও।" ভিক্ষু-গণের প্রতি বুদ্ধের এই নির্দেশ দান থেকেই "ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তন" আরম্ভ হল।

ভিক্ষুগণের প্রতি এই নির্দেশ দান করার পর বুদ্ধ মৃগদায় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বুদ্ধের নিকট থেকে লোকহিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করে ভিক্ষুগণও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। তখন শরৎকাল। পর্যটনের পক্ষে অতি উপযুক্ত সময়। উরুবেলার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বুদ্ধ এক অতীব রমণীয় বনভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তখন বেলা মধ্যাহ্নকাল। সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন। শরতের সে সুন্দর বনভূমি মধ্যাহ্নদিনের আলোয় সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল।

মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেবল পাখীর কূজন দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল। এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কয়েকজন যুবকের

উত্তেজিত আলাপধ্বনি ভেসে আসতে থাকে। ক্রমশঃ সেই ধ্বনি নিকটতর হতে বুদ্ধ এগিয়ে গেলেন সেই দিক লক্ষ্য করে। একটু এগিয়ে যেতেই তিনি দেখতে পেলেন কয়েকটি তরুণকে। তরুণগণ নির্জন বনের মধ্যে অকস্মাৎ তাদের সম্মুখে অমন শান্ত সৌম্য একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে একেবারে নিরব হয়ে গেল। বুদ্ধ তখন তাদের সম্বোধন করে স্বস্নেহ বচনে বলে উঠলেন, বৎসগণ, এই নিবিড় বনের মধ্যে তোমরা কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? বুদ্ধের বচন শুনে, তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, বনমধ্যে প্রমোদ বিহারের জন্যই তাদের আগমন। প্রমোদ বিহারের অঙ্গ হিসাবে যে নারীটি তাদের সঙ্গে এসেছিল সে তাদের অসতর্কতার সুযোগে সকলের যাবতীয় অলঙ্কারপত্র নিয়ে অকস্মাৎ গা ঢাকা দিয়েছে। এতক্ষণ ধরে তারা কেবল সেই নারীকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে সেই দিকে এসেছে মাত্র। তরুণটির মুখ থেকে উত্তর শুনে, বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, এই সংসার অরণ্যের মাঝে তোমরা নিজেদের বাদ দিয়ে, বৃথা অপরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? একথা শোনার পর তরুণগণ মূঢ়ের মত কেবল তাকিয়ে রইল বুদ্ধের প্রতি। একথার কোন উত্তর খুঁজে পেল না তারা। তখন স্বস্নেহ বচনে বুদ্ধ তরুণগণকে আহ্বান জানিয়ে তাদের সুস্থির করে, তারপর তাদের সঙ্গে ধর্মালাপ শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মন জয় করলেন। তখন সেই তরুণগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভিক্ষু হলেন। এরপর বুদ্ধ সেই বনভূমি ত্যাগ করে পুনরায় উরুবেলার পথে চলতে আরম্ভ করলেন। পথে উরুবেল কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ, এবং গয়া কাশ্যপ নামে অগ্নিহোত্রী তিন তাপস গুরুকে তাঁদের শিষ্যবর্গসহ স্বমতে দীক্ষিত করেন। তখনকার দিনের খ্যাতনামা এই তিন সন্ন্যাসী ছিলেন একই জননীর গর্ভজাত সন্তান। তিন সহোদর। এদের নিয়ে এবার বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে ধর্ম প্রচার করতে করতে বুদ্ধ শিষ্যগণসহ ক্রমে এসে উপনীত হলেন রাজগৃহের নিকটবর্তী লষ্ঠিবনে। শিষ্যগণসহ তিনি কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। বুদ্ধের আগমনবার্তা মগধরাজ বিম্বিসারের নিকট পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে, রাজা বিম্বিসার পাত্রমিত্রসহ এসে উপস্থিত হলেন লষ্ঠিবনে। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে ঋষি গৌতম রাজা বিম্বিসারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি পুনরায় রাজগৃহে ফিরে এসে রাজা বিম্বিসারকে দর্শন দান করবেন। এতদিন পরে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে রাজা বিম্বিসারের আনন্দের আর সীমা রইলো না। তিনি সেখানেই বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারকে "মহানারদ কাশ্যপ" জাতক কাহিনীটি (৫৪৪) বর্ণনা করে শোনালেন। এই জাতক কাহিনীটি শ্রবণ করার ফলে রাজা বিম্বিসার স্রোতাপত্তি ফললাভ করতে সমর্থ

হলেন। রাজা বিম্বিসার সশিষ্য বুদ্ধকে পরদিন রাজপ্রাসাদে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানালে বুদ্ধ তা গ্রহণ করেন।

রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পরদিন বুদ্ধ সশিষ্য রাজপুরীতে উপস্থিত হন। রাজপুরীতে আহার গ্রহণ সমাপ্ত হবার পর রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে রাজগৃহের অভ্যন্তরে আশ্রম নির্মাণ করে সেখানে বাস করবার জন্যে অনুরোধ জানান। রাজপুরীর নিকটবর্তী কলন্দক নিবাপ যার আর এক নাম বেণুকুঞ্জ সেই স্থানটি আশ্রম নির্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত বলে তিনি বর্ণনা করলেন। রাজার অনুরোধে বুদ্ধ সম্মতি জানালে রাজা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে স্বহস্তে জল গ্রহণ করে সেই জল বুদ্ধের হাতে দিয়ে তর্পণ করে মনোরম বেণুকুঞ্জটি বুদ্ধকে উৎসর্গ করেন। ভারতের তথা সমগ্র বৌদ্ধ জগতের এইটি সর্বপ্রথম সংঘারাম।

রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে নানা দেশ থেকে বহু সাধু সন্ন্যাসী এসে সেখানে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি এমনিতেই রাজা বিম্বিসারের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। প্রত্যেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কেই তিনি আশ্রম নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের ভরণ পোষণের দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেখানে কোন কোন আশ্রমে প্রচুর পরিমাণে শিষ্যসংখ্যা ছিল। রাজগৃহে তাদের ভরণ পোষণ নির্বিঘ্নেই সমাধা হত। তীর্থিক সঞ্জয়ের আশ্রমেও অনেক শিষ্য ছিল। সেই আশ্রমের অগ্রশ্রাবক ছিলেন সারীপুত্ত এবং মৌগ্যাল্ল্যায়ন। এরা দুজনেই ব্রাহ্মণ সন্তান এবং আবাল্য প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এরা দুজনেই একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারীপুত্তের প্রকৃত নাম উপতিষ্য। যে গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন সে গ্রামটির নামও উপতিষ্য। "মহা সুদর্শন" জাতকে (৯৫) দেখা যায়, তাঁর জন্ম নালন্দা গ্রামে। উপতিষ্য গ্রামটিও নালন্দারই সংলগ্ন। উপতিষ্যের মাতার নাম ছিল শারী অথবা সারী। সারীর পুত্র বলেই তিনি পরিচিত হন। সেই জন্যই তাঁকে সারীপুত্র (পালি সারিপুত্ত) নামেই অভিহিত করা হয়েছে। মৌগ্যাল্ল্যায়নের প্রকৃত নাম ছিল কোলিত। তিনি মৌদগল্য গোত্রীয় ছিলেন বলে গোত্রের নামানুসারে মৌগ্যাল্ল্যায়ন নামে পরিচিত হন। সারীপুত্ত এবং মৌগ্যাল্ল্যায়ন উভয়েই ছিলেন পরস্পরের বাল্য বন্ধু। উভয়েই ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হলেও কিশোর বয়সেই এঁরা দুজনে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। রাজগৃহে তখন তীর্থিক সঞ্জয় (পালি সঞ্জয় বেলট্ঠি পুত্ত) গুরু হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এই দুই বন্ধু এসে গুরু সঞ্জয়ের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর আশ্রমেই বাস করতে থাকেন। গুরু সঞ্জয় এই দুই বন্ধুকে তাঁর অগ্রশ্রাবক পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁদের ধর্ম পিপাসা মেটেনি। সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তাঁরা নিজেরাও শান্তি পাননি। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের গুরু

সঞ্জয় তাঁদের মনের মধ্যের সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হননি। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে দুই বন্ধু মিলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর সন্ধান লাভ করতে তাঁরা সক্ষম হননি। সারীপুত্ত একদিন বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিৎকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ধীর শান্ত গতিতে পরিক্রমা করে, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখতে পেলেন। অশ্বজিতের শান্ত, সৌম্য মূর্তি এবং ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাঁর ধীর গমনভঙ্গি দর্শনে সারীপুত্ত অত্যন্ত প্রীত হলেন। সারীপুত্ত তখন নিজেই এগিয়ে গিয়ে অশ্বজিতের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গুরুর সম্বন্ধে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

সারীপুত্ত প্রথমেই অশ্বজিতের নিকট থেকে তাঁর গুরুর ধর্মমত সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সারীপুত্তের প্রশ্নের উত্তরে অশ্বজিৎ জানালেন যে, তাঁর গুরুর ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে সংক্ষেপে তাঁর গুরু সম্বন্ধে কয়েকটি কথামাত্র বলতে তিনি সক্ষম। অশ্বজিতের কথা শুনে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে সারীপুত্ত বলে উঠলেন যে, তাঁর গুরু সম্বন্ধে তিনি সংক্ষেপেই কেবল পরিচয় পেতে ইচ্ছে করেন। এরপর অশ্বজিৎ সারীপুত্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ধর্মসমূহ যে হেতু থেকে উৎপন্ন হয়, তাঁর গুরু সেই হেতুকেই নির্দেশ করেছেন। সেই হেতুকে নির্দেশ করতে গিয়ে, তিনি সেই হেতুর নিরোধ এবং নিরোধের পন্থারও নির্দেশ দান করেছেন ঃ—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসাং হেতুং তথাগত আহ,
তেসঞ্চ যো নিরোধো
এবং বদী মহাসমনো।

অশ্বজিতের এই কটি কথা থেকে তীক্ষ্ণধী সারীপুত্ত সমস্ত ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন। এতদিন ধরে তিনি যে পথের সন্ধানে অনবরত ঘুরে বেড়িয়েছেন, এই তো সেই পথ। অশ্বজিতের নিকট বিদায় জানিয়ে, তিনি তক্ষুণি ছুটে চলে গেলেন তাঁর বন্ধু মৌগ্যল্যায়নের নিকটে। বন্ধুকে জানালেন সব বৃত্তান্ত। দুই বন্ধু তখন বুদ্ধকে একবার দর্শন করবার জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁরা তাঁদের গুরু সঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে জানালেন, যে এখন থেকে তাঁরা বুদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে চলতে ইচ্ছুক। কিন্তু গুরু সঞ্জয় তাঁদের সে অনুমতি না দিয়ে, বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে অহেতুক নিন্দা করে, তাঁদের উভয়কে বুদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। তখন তাঁরা আবার তাঁদের উদ্দেশ্য গুরুকে ভাল করে নিবেদন করে, দ্বিতীয়বার তাঁর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। এবারে তাঁদের গুরু তাঁদের কথায় আদৌ কর্ণপাত না করে আরও কঠোর ভাষায় বুদ্ধের সমালোচনা করতে থাকেন। এরপর তাঁরা আর গুরুর

অনুমতির প্রয়োজন অনুভব করলেন না। দুই বন্ধু বুদ্ধ দর্শনের উদ্দেশ্যে আশ্রম ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। অগ্রশ্রাবকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণও তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধ সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। গুরু সঞ্জয় শত চেষ্টা করেও তাঁদের গতিরোধ করতে সমর্থ হলেন না। গুরু সঞ্জয়ের প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসীই তাঁদের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সঙ্গে বুদ্ধের আশ্রম বেণুবনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সারীপুত্র এবং মৌগ্যাল্ল্যায়নকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই বুদ্ধ তাঁর আশ্রমের শিষ্যদের সম্বোধন করে জানালেন, ঐ যে দুজন তরুণ তাপস সন্ন্যাসীগণকে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছেন এরাই হবেন আমার সংঘের অগ্রশ্রাবক। যথাসময়ে সকলে মিলে এসে উপস্থিত হলেন, বেণুবনে বুদ্ধের আশ্রমে। প্রথমে সারীপুত্র এবং মৌগ্যাল্ল্যায়ন বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এরপর অন্যান্য সকলেও একে একে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সকলের দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হলে বুদ্ধ সারীপুত্র এবং মৌগ্যাল্ল্যায়নকে সর্বসমক্ষে বৌদ্ধ সংঘের অগ্রশ্রাবকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি তর্ক সুকৌশলে খণ্ডন এবং নস্যাৎ করার অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল সারীপুত্রের।

সারীপুত্র এবং মৌগ্যাল্ল্যায়নের দীক্ষা গ্রহণের পর বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধের খ্যাতিও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পুত্রের যশের বৃত্তান্ত কপিল রাজপুরীতে রাজা শুদ্ধোদনের নিকটও গিয়ে পৌঁছাল। সব শুনে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে কপিলা-বস্তুতে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে দূত প্রেরণ করেন। রাজার আমন্ত্রণ নিয়ে কপিলাবস্তু থেকে দূত এসে উপস্থিত হল রাজগৃহে বুদ্ধের আশ্রমে। দূত বুদ্ধকে কপিলাবস্তুতে যাবার জন্যে রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণ জানাবার পরিবর্তে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করে বসল। বুদ্ধের নিকট থেকে রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর নিয়ে সে আর কপিল-পুরীতে ফিরে গেল না। রাজা শুদ্ধোদন অধীর হয়ে পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিবারই ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

এরপর বুদ্ধ কিছুদিনের জন্য মৃগদায়ে চলে গেলেন। এবারে মৃগদায়ে আসার পর থেকে, তাঁর শিষ্য সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে যেতে থাকে। মৃগদায়ে তিনি প্রত্যহ ধর্মসভার আয়োজন করতে থাকেন। ধর্মসভায় উপস্থিত সকলের নিকট প্রত্যহ ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দান করতেন। এভাবে সেখানে বর্ষাকালটা কাটিয়ে তিনি পুনরায় উরুবিল্বে প্রত্যাবর্তন করেন। উরুবিল্বে প্রায় তিনমাস কাল অবস্থান করার পর, পৌষী পূর্ণিমার দিন তিনি পুনরায় রাজগৃহের বেণুকুঞ্জের আশ্রয়ে সশিষ্য আগমন করেন। পুত্রকে কপিলাবস্তুতে যাবার জন্য আমন্ত্রণবার্তাসহ পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করে বিফল মনোরথ হবার পর রাজা শুদ্ধোদন এবারে তাঁর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন অত্যন্ত সুচতুর মন্ত্রী

কালদায়ীকে রাজগৃহে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। মন্ত্রী কালদায়ী যথাসময়ে রাজগৃহে বুদ্ধের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণ বার্তা জ্ঞাপন করেন। পিতার আমন্ত্রণ বার্তা বুদ্ধ সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর কালদায়ী নিজেও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। কালদায়ী বুদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করে সেই শুভ সংবাদ বহন করে আশ্চর্যভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কপিলাবস্তুতে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধের কৃপাবলে তিনি আকাশ পথে ফিরে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। এরপর বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে কপিলাবস্তুতে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে এক শুভদিনে পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তিনি জন্মভূমির উদ্দেশ্যে পদযাত্রা আরম্ভ করেন। সেই বিরাট সঙ্গী দলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যেখানেই গিয়ে উপস্থিত, হলেন সেখানেই অগণিত লোক এসে তাদের সম্মুখে সমবেত হতে লাগলেন। বুদ্ধ সেই অগণিত লোকদের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম কথা শোনার পর তাঁদের অধিকাংশই বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবে কপিলাবস্তুর পথে প্রায়ই প্রত্যহই অগণিত লোককে ধর্মউপদেশ দানে মুগ্ধ করে, শেষে তাদের দীক্ষা দান করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া অনোমার তীরে, যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার সন্ন্যাসী জীবন। এই অনোমার তীরে দাঁড়িয়েই তিনি অঙ্গ থেকে একে একে খুলে ফেলেছিলেন তাঁর রাজবেশ। তারপর মস্তকের সুন্দর কেশ-দাম কর্তন করে ফেলেছিলেন। তারপর রাজবেশের পরিবর্তে অঙ্গে ধারণ করেছিলেন সন্ন্যাসীর বেশ অর্থাৎ কৌপীন। এরপর সারথি ছন্দক এবং অশ্ব-শ্রেষ্ঠ কন্থককে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই সব পূর্ব স্মৃতি আজ আবার একের পর এক ছবির মতো তাঁর মনে দেখা দিতে লাগল। সেদিন অনোমা তাঁকে জানিয়েছিল বিদায় সম্ভাষণ। আর আজ সেই অনোমাই তাঁকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। তখন বসন্তকাল। বসন্তের ছোঁয়াচ লেগে অনোমার শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনোমার তীরে সেই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, পূর্ব স্মৃতিচারণ করার পর বুদ্ধ পুনরায় কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে সদলবলে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।

সদলবলে বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে আসছেন, এই সংবাদ ইতিমধ্যেই কপিলাবস্তুর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কপিলা-বস্তুর প্রতিটি নাগরিকই তৈরী হয়েছিলেন। প্রতিটি গৃহ সুসজ্জিত করা হয়েছিল, পথ ঘাট উত্তমরূপে সুমার্জিত করা হয়েছিল। বুদ্ধ সদলবলে রাজধানী প্রান্তে এসে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গৃহ থেকে উলুধ্বনি

এবং শঙ্খধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত জয় কোলাহলের মধ্য দিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। রাজধানীর প্রান্তে ন্যগ্রোধারাম নামক স্থানে তিনি সদলবলে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন। বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে শাক্য বংশীয়গণের প্রায় সকলেই ন্যগ্রোধারামে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁদের সঙ্গে স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদন সেদিন পুত্রকে দর্শন করবার জন্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। শাক্যগণের মর্যাদা বোধ ছিল অতিশয় প্রখর। তাঁরা বড় একটা কাউকেই অভিবাদন জানাতেন না। শাক্যগণের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, কেবলমাত্র তাঁরাই প্রথমে বুদ্ধকে প্রণাম জানালেন। বয়স্ক শাক্যগণ বুদ্ধকে একজন মহামানব বলে স্বীকার করে নিলেও, মর্যাদাহানীর ভয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে কুণ্ঠিত হলেন। তাঁদের এই অহেতুক কুণ্ঠা দর্শনে, বুদ্ধ তখন তাঁদের সর্বসমক্ষে আসন হতে উত্থিত হয়ে শূন্যমার্গে বিচরণ করতে লাগলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ; তখন সকলেই বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলেন। স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদনও সেদিন সকলের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে পুত্রকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এনিয়ে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে তৃতীয়বার অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন।

এরপর বুদ্ধ পুনরায় আসন গ্রহণ করে, সভায় সমবেত শাক্যগণের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, সে সময়ে সভাস্থলে বৃষ্টিপাত হতে থাকে। সেই বৃষ্টিপাত ছিল চন্দন মিশ্রিত। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা মনে মনে সেই চন্দনবৃষ্টিকে কামনা করেছিলেন, কেবল তাঁদের দেহেই বারিপাত হয়েছিল। যাঁরা তা কামনা করেননি, তাঁদের দেহে বিন্দুমাত্র বারিও বর্ষিত হয়নি। কপিলাবস্তুতে পেঁছানোর পর অল্প সময়ের মধ্যে বুদ্ধ পর পর দুখানি অপ্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। সেদিনের ধর্মসভায় উপস্থিত শাক্যবংশীয়গণের অনেকেই বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবার জন্যে মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

সশিষ্য বুদ্ধ সেই ন্যগ্রোধারামের আশ্রমেই অবস্থিতি করতে লাগলেন। পরদিন শিষ্যগণসহ ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানীর পথে বের হলেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। রাজপুরীর বিলাসময় ভোজ্য দ্রব্য সকল পরিহার করে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে পুত্রকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখে তিনি কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারেন নি। রাজপুরীর বাতায়ন পথে বুদ্ধজায়া যশোধারাও স্বামীকে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখে দারুণভাবে মর্মাহত হন। বুদ্ধ কিন্তু কারুর অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহ থেকে বিরত হননি। পুত্রকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা থেকে বিরত করতে না পেরে রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে

শেষে পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, শাক্যকুমারের পক্ষে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা মোটেই শোভা পায় না। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদনকে জানান যে, শাক্য-বংশীয়গণ তাঁর অস্থি মাংসপূর্ণ দেহটিকেই কেবল তাঁদের নিজেদের বংশের বলে দাবী করতে পারেন। কিন্তু তাঁর নিজেকে নয়। বুদ্ধগণের পক্ষে ভিক্ষান্ন সংগ্রহই হল জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। বৃক্ষমূলে অথবা পর্বত কন্দর তাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থল। তিনি বুদ্ধকুলের নিষ্কলুষ প্রথাই অবলম্বন করে চলেছেন মাত্র। এর পর তিনি পিতার নিকট মহাধর্মপাল জাতক কাহিনীটি (৪৪৭) বর্ণনা করেন। তার ফলে রাজা শুদ্ধোদন স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। এর পর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম থেকে বিরত করবার জন্যে আর কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। কেবল একটি দিনের জন্যে অন্ততঃ সশিষ্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে, রাজপুরীর সকলের সাথে একত্রে অন্নগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পিতার সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে কতকটা বাধ্য হয়েই পরদিন তিনি পিতৃপ্রাসাদে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হয়ে, পিতার সঙ্গে আহার গ্রহণে সম্মত হন। সেদিন রাজপুরীতে বুদ্ধের আগমন বার্তা পেঁাছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মীয় পরিজন সকলেই এসে তাঁর চতুর্দিক ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ালেন। এতদিন পরে পুত্রকে দর্শন করে আর্যা গৌতমী আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। সেদিন বুদ্ধের আগমন বার্তা শোনার পর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন না একমাত্র বুদ্ধজায়া যশোধারা। বুদ্ধের আগমন বার্তা নিয়ে যে ভৃত্য তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, সেই ভৃত্যের মাধ্যমেই তিনি বলে পাঠালেন, যে প্রভু যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে নিজেই এসে দেখা দিয়ে যাবেন। আহার সমাপন করে বুদ্ধ সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল রাজপুরীর একপ্রান্তে নিতান্ত সাধারণ একটি কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পর যশোধারা সর্বপ্রকার সুখ ঐশ্বর্য সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সেই কক্ষটিতে পুত্র রাহুলকে নিয়ে অবস্থিতি করছিলেন। স্বামীর সংসার ত্যাগের পর থেকে যশোধারা পতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোরভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত বেশভূষা গ্রহণ করেন। সর্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য এমন কি মাল্য গন্ধাদি পর্যন্ত পরিহার করেন। সমস্ত-দিনে একবার মাত্র অতি সাধারণ আহার্য বস্তু গ্রহণ করতেন। মৃৎপাত্র ভিন্ন অপর কোন পাত্র ব্যবহার করতেন না। রত্নখচিত পালঙ্কের পরিবর্তে ভূমিতে তৃণ শয্যায় শয়ন করতেন। সে সময় অনেক শাক্যরাজকুমার তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে কঠোর সন্ন্যাসিনীর ব্রত ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে, তাঁর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েছিলেন। যশোধারা সে সমস্ত প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, পাণিপ্রার্থী রাজকুমারগণ তাঁর

জন্য যে সকল উপহার সামগ্রী এনে উপস্থিত করতেন, সে সমস্ত বস্তুকে তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং হস্তদ্বারা সেগুলোকে স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। সারীপুত্ত এবং মৌগ্যাল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ যখন যশোধারার কক্ষে প্রবেশ করেন, সে সময় রাজা শুদ্ধোদনও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সর্বপ্রথমে তিনিই সকলের সম্মুখে পুত্রবধূর সন্ন্যাসিনীর ন্যায়, আদর্শ জীবন ধারণের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। শুদ্ধোদনের প্রশংসার উত্তরে বুদ্ধ যশোধারার পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত চন্দ্রকিন্নর জাতকের উপাখ্যান (৪৮৫) সর্বসমক্ষে বর্ণনা করেন।

এতদিন পরে স্বামীকে নিকটে পেয়ে এবং তাঁর দর্শন লাভ করে মানসিক আবেগের বশে যশোধারার দুই নয়ন প্লাবিত করে অবিরাম ধারায় তখন কেবল অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল। কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে তখন ফুটে বেরোয় নি। সেই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বুদ্ধের চরণ যুগলের উপর নিজের মস্তকখানিকে ন্যস্ত করলেন। সেই অপূর্ব অপরূপ পবিত্র দৃশ্য দর্শনে উপস্থিত সকলেরই নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠল। স্বয়ং বুদ্ধের আয়ত নয়ন দুখানির কোলেও অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্র রাহুল এই সর্ব প্রথমে পিতাকে নিকটে পেয়ে অপলক নয়ন দুখানিতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লয়ে সকলের সম্মুখে উপস্থিত থেকে অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে এক দৃষ্টে পিতার পানে তাকিয়েছিল। জননীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ লক্ষ্য করে শিশুপুত্র রাহুল বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এরপর একটি ছোট নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হল। খানিকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে যশোধারা তাঁর শিশুপুত্র রাহুলকে উদ্দেশ্য করে প্রফুল্ল বদনে বলে উঠলেন, "তুমি তোমার পিতার নিকট থেকে পিতৃধন চেয়ে নাও।" পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর পক্ষে সে কথার অর্থ খুঁজে পাবার কথা নয়। বালক অনুভব করল নিশ্চয়ই তার জননী তাকে নূতন কোন লোভনীয় বস্তু চেয়ে নিতে বলছেন। জননীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্র রাহুল তার পিতার সম্মুখে গিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে সেই নূতন লোভনীয় বস্তুটিকে প্রাপ্তির আশায় তার ক্ষুদ্র দক্ষিণ হস্তটি পিতার প্রতি প্রসারিত করে দিল। তার পিতাও সহাস্যমুখে তেমনি নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর ভিক্ষা পাত্রখানিকে এগিয়ে ধরলেন তাঁর শিশু পুত্রটির সম্মুখে। তারপর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে ধীর শান্ত স্বরে উচ্চারণ করলেন, যে ধনলাভে আমি ধনী হয়েছি তুমিও যদি সেই ধন লাভ করতে ইচ্ছে কর তবে এই ভিক্ষাপাত্রখানিকে গ্রহণ কর। পুত্রের প্রতি বুদ্ধের এই প্রথম উপদেশ অথবা আদেশ। পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের এই নাটকীয় মুহূর্তটিকে অবলম্বন করে যুগে যুগে বহু শিল্পী অমর চিত্র সম্ভার রচনা করে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে অজন্তার সতেরো নম্বর

গুহার নাম না জানা শিল্পীর রচিত চিত্রখানিই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করছে।

পিতার আদেশ শোনার পর শিশুপুত্র রাহুলের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। রাহুল তখন মাতার অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে পিতার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে দাঁড়াল। বুদ্ধও পুত্রকে সস্নেহে আশীর্বাদ জানিয়ে তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। এর পর বুদ্ধ সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে পুত্র রাহুলের হস্ত ধারণ করে যশোধারার কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। শিশু পুত্র রাহুল জন্মের পর থেকে পিতাকে কখনও দেখতে পায়নি। জননীর স্নেহ যত্নে এবং পিতামহের অকুণ্ঠ আদর আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে সে এতদিন পর্যন্ত লালিত পালিত হয়েছে। আজ পিতাকে দেখতে পেয়ে, পিতার নির্দেশ শোনার পর এক মুহূর্তে তার শিশুমনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সেও রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলো। জননীর প্রতি, তার পিতামহের প্রতি একবারও সে ফিরেও তাকিয়ে দেখলো না, বাতায়ন পথে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন যশোধারা তাঁর শিশু পুত্রের প্রতি। তাঁর কেবলই যেন মনে হতে লাগল তাঁর জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও পিতৃধন লাভের আশায় আজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সহ্য করতে পারলেন না যশোধারা সেই নিদারুণ আঘাত। চৈতন্য হারিয়ে সেখানেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বুদ্ধ এদিকে পুত্র রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্যগণসহ ফিরে এলেন ন্যগ্রোধারামের আশ্রমে। সেখানে একখানি সামান্য পর্ণ কুটীরে রাহুলের থাকার ব্যবস্থা করা হল।

বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পর, রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর্যা গোতমীর পুত্র নন্দকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁকে সিংহাসন দান করতে মনস্থ করেছিলেন। নন্দ ছিলেন বুদ্ধেরই প্রায় সমবয়সী। এক বৎসরের কনিষ্ঠ মাত্র। কপিলাবস্তু আগমনের তৃতীয় দিনে নন্দকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের সঙ্গে জনপদকল্যাণীর (অপর নাম সুন্দরী) সঙ্গে শুভ বিবাহের দিন স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু উৎসবের দিনে বুদ্ধ অকস্মাৎ রাজপুরীতে উপস্থিত হয়ে নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ন্যগ্রোধারামের নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে পড়ে রইল উৎসবের সকল আয়োজন উপাচার। আশ্রমে ফিরে এসে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণের সর্বসমক্ষে নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রথমে নন্দ বুদ্ধের এ প্রস্তাব মেনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। শেষে বুদ্ধের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে কতটা বাধ্য হয়েই তাঁকে বুদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হয়েছিল। নন্দের গৃহত্যাগের পর থেকে নন্দের বাগদত্তা স্ত্রী জনপদকল্যাণী আহার নিদ্রা সবকিছু পরিত্যাগ করে তিল তিল করে মৃত্যুকে বরণ করেন। জনপদকল্যাণীর সেই মৃত্যু বড়ই করুণ

বড়ই মর্মান্তিক। জনপদকল্যাণীর শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণের ঘটনাটি সে যুগের একটি মর্মস্পর্শী এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা। অজন্তার ষোল নম্বর গুহার দেয়াল গাত্রে নাম না জানা শিল্পীকর্তৃক রচিত "মৃত্যুপথযাত্রী রাজকন্যা" (The dying princess) নামে বিখ্যাত চিত্রসম্ভার এই জনপদকল্যাণীর মৃত্যু-বরণের ঘটনাটির অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল।

নন্দের প্রতি জনপদকল্যাণীর সত্যিকারেরই ভালবাসা ছিল সন্দেহ নেই। স্ত্রীর প্রতি নন্দেরও যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তবে সুঠাম নারীদেহের প্রতিই বোধ হয় নন্দের আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। সেজন্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং আর্যা গৌতমীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও শ্রমণ ও সন্ন্যাসীগণের নিকট নন্দ ততটা উচ্চ সম্মান লাভ করতে পারেননি। বরং তাদের নিকট নন্দ কতকটা উপহাসের পাত্র বলেই বিবেচিত হতেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর অনেকদিন পর্যন্ত নন্দ তাঁর বাগদত্তা পত্নীর কথা ভুলতে পারেন নি। বুদ্ধের নির্দেশ মতো অনুশাসন প্রভৃতি এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানসমূহ মেনে চললেও তাঁর সমগ্র অন্তরখানি সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে রেখেছিল জনপদকল্যাণী। বুদ্ধ নন্দের এই শোচনীয় মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে শেষে তার প্রতিকারের উপায় গ্রহণ করেন। নন্দের চরিত্র বুদ্ধের অজানা ছিল না। তাই তিনি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করলেন। নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের ছলে একদিন তিনি ঋদ্ধিবলে দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে এসে উপস্থিত হলেন। দেবরাজের সভায় প্রবেশের পথের সম্মুখে অগ্নিদগ্ধ একটি মর্কটীকে তাঁরা দেখতে পেলেন। এরপর দেবরাজের সভায় উভয়ে প্রবেশ করলে পরে সেখানে অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী দেবকন্যাগণ এসে তাঁদের সম্মুখে নৃত্যগীত পরিবেশন করতে থাকেন। তখন বুদ্ধ সহাস্য মুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি বল নন্দ এই দেবকন্যাগণ সুন্দরী? না তোমার সেই জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে নন্দ জানালেন, জনপদকল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই অগ্নিদগ্ধ মর্কটীটি যেরূপ, এদের সঙ্গে তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেই রূপ। বুদ্ধ তখন নন্দকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় বলেন, "তুমি যদি এইরূপ রূপলাবণ্যময়ী দেবকন্যা পাবার অভিলাষী হও, তবে আমার উপদেশানুসারে চল।" সেই থেকে নন্দ অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে বুদ্ধের অনুশাসন একাগ্রচিত্তে মেনে চলতে থাকেন। আশ্রমের অন্যান্য শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ নন্দের এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রথমটায় বিস্ময় বোধ করেছিলেন। পরে সমস্ত ব্যাপারখানি যখন পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, তখন নন্দ হয়ে পড়লেন তাঁদের নিকট এক মহা উপহাসের পাত্র। নন্দ তখন নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে মন থেকে সমস্ত প্রকার কামনা বাসনা সব কিছু ত্যাগ করে একাগ্র চিত্তে ধর্মাচরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং বুদ্ধের কৃপাবলে অল্প দিনের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করতে সমর্থ হন।

ন্যগ্রোধারামে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণের চতুর্থদিনে প্রাতঃকালে ধর্মসভায় আসন গ্রহণ করে বুদ্ধ প্রথমে পুত্রকে উদ্দেশ করে "রাহুল" বলে ডেকে উঠলেন। পিতার সেই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি শোনা মাত্র বালক রাহুল ধীরে ধীরে পিতার নিকটে এসে নীরবে নত মস্তকে দণ্ডায়মান হল। বুদ্ধ তখন পুত্রকে তাঁর সম্মুখে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। আজ্ঞামত রাহুল তাঁর সম্মুখে আসন গ্রহণ করে উপবেশন করার পর বুদ্ধ ধীর শান্ত স্বরে পুত্রকে উদ্দেশ করে বলেন, "তুমি কি সত্যিই পিতৃধন কামনা কর?" পিতার প্রশ্নের উত্তরে বালকের মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ উত্তর বেরিয়ে আসে—হাঁ। এরপর বুদ্ধ রাহুলকে পুনরায় বলেন, পৃথিবীর তিলমাত্র স্থানের উপর, অথবা কোন বস্তুর উপর আমার কোন অধিকার নেই। সাধনা দ্বারা যে ধন আমি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি এবং যে ধনের সন্ধান সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেবার জন্যে আমি পথে বেরিয়েছি, সেই ধনই আমি তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি। পিতার বচন শুনে বালক রাহুল মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, হ্যাঁ আমায় তাই দিন। এর পর বুদ্ধ সারীপুত্তকে নিকটে আসতে নির্দেশ দিয়ে, তাঁকে উদ্দেশ করে জানালেন যে, "রাহুল তার পৈত্রিক ধন গ্রহণ করতে চাইছে।" সুতরাং "একে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" বুদ্ধের আদেশক্রমে সারীপুত্ত রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। রাহুল পরে অর্হত্ব লাভ এবং পিতামাতা উভয়েরই নির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বে সে নিজে নির্বাণ লাভ করেছিল।

নন্দের সংসার ত্যাগ এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে পিতা শুদ্ধোদন দারুণ মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। সেই ক্ষত উপশম হতে না হতে তার উপর আবার নতুন করে পঞ্চম বর্ষীয় বালক রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদ, শেলের মতই এসে বিদ্ধ করে বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের অন্তরখানিতে। আশ্রয়হীনা একাকিনী পুত্রবধূর মুখের পানে তাকিয়ে, অসহ্য যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। পরক্ষণেই ছুটে চলে যান ন্যগ্রোধারামে, তাঁর পুত্রের আশ্রমে। বুদ্ধ তখন ধর্মসভায় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রকে উদ্দেশ করে জানালেন আমি গৃহী মানুষ, সন্তান সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে গেলে পিতা মাতার অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত এসে লাগে তা আমি আমার জীবনে অতি উত্তমরূপেই অবগত হতে পেরেছি। তাই আমি আজ তোমাকে অনুরোধ জানাতে এসেছি যে, পিতা-মাতার বর্তমানে, তাদের অনুমতি ব্যতীত কাউকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়ে সন্ন্যাসী হতে দিও না। তোমার নিকট আমার একমাত্র এবং শেষ অনুরোধ। পিতার এই সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বুদ্ধ সেদিন পিতাকে জানিয়েছিলেন, যে এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করে চলবেন। বুদ্ধ তখনই সমবেত ভিক্ষু ও শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করে ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন থেকে কাউকেই যেন

তার পিতামার বর্তমানে তাদের বিনা অনুমতিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে দেওয়া না হয়। পিতার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে বুদ্ধের এই নিষেধ বাক্য বৌদ্ধবিনয়ের একটি প্রধান বিধিতে পরিণত হয়েছে। আজও সেই নিয়ম মেনে চলা হয়ে থাকে।

পঞ্চম বর্ষীয় বালক রাহুলের দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে শাক্য রাজকুমারগণের মধ্যে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস নেবার জন্যে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিল। শাক্যরাজকুমার-গণ দলে দলে এসে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে তাঁর শিষ্য সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগল। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর এরাই আবার দিকে দিকে বুদ্ধের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। এভাবে কপিলাবস্তুতে প্রায় একমাস কাল অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় রাজগৃহের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন। রাজগৃহের পথে মল্লদের রাজ্যে উপস্থিত হয়ে সেখানকার অনুপ্রিয় নামক স্থানের আম্রবনে তিনি কিছু-দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের কপিলাবস্তু ছেড়ে আসার পর তাঁর নিকট আত্মীয় মহানাম বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষু হবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। পৈত্রিক বিষয় সব কিছু দায় দায়িত্ব ভার তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিরুদ্ধের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একদিন সব খুলে বললেন। অনিরুদ্ধ নিজে যদিও ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং আরামপ্রিয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংকল্পের কথা শুনে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যে বিষয় সম্পদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে লোকে অনর্থক দুঃখ কষ্টের ভাগী হয়। সুতরাং বিষয় সম্পদে তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় তিনিও স্বাধীন সত্তার অধিকারী হতে ইচ্ছে করেন। জ্যেষ্ঠের কথা শোনার পর মুহূর্তের মধ্যেই যেন তাঁর এই মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল। বিলাস ব্যসনের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ মুহূর্তে একেবারে দূর হয়ে গেল। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন তিনিও। কিন্তু ইচ্ছামাত্রই তখন আর ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার উপায় নেই। রাহুলের দীক্ষার পর রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে বুদ্ধ অনুশাসন বেঁধে দিয়েছিলেন যে, পিতামাতার বর্তমানে তাদের অনুমতি ব্যাতিরেকে কাউকেই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তাঁর ভিক্ষুব্রত গ্রহণ পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় দেখা দিল, তাঁর জননীর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করা। ইতিপূর্বে একবার তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অনুমতি দিয়েছেন, সুতরাং এবার তাঁর পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে অনুমতি দান করা সম্ভব নয়। অনিরুদ্ধ কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে পুত্রকে তাঁর সংকল্প থেকে নিরস্ত করবার আশায় জননী এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। অনিরুদ্ধের সমবয়সী বন্ধু ভদ্রিক নামে অপর এক শাক্যরাজকুমার কিছুদিন

হল তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। রাজৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ এবং মোহ। সেই ভোগ বিলাসপ্রিয় ভদ্রিকের প্রসঙ্গ তুলে জননী বললেন, যদি তুই ভদ্রিককে তোর মতো সুখ ঐশ্বর্য সব কিছু পরিত্যাগ করিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে সম্মত করাতে পারিস তবে আমি তোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুমতি দেব। জননীর কথায় উৎসাহিত হয়ে অনিরুদ্ধ তখনই ছুটে চলে এলেন তাঁর প্রিয় বাল্য বন্ধু রাজা ভদ্রিকের নিকট। বন্ধুর নিকট এসেই তিনি বলে উঠলেন, ভাই, আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে তাঁর বিপদের কথা শুনে, ভাবাবেগে ভদ্রিক তখনই বলে ফেললেন, তোমার বিপদ দূর করবার মত ক্ষমতা যদি আমার থাকে, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তা নিশ্চয়ই করব। ভদ্রিকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মনে মনে ভীত হলেন এবং সব কথা বন্ধুকে বললেন। অনিরুদ্ধের কথা শুনে ভদ্রিক পড়লেন মহাবিপদে। বন্ধুকে দায়মুক্ত করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে গেলে তাকে রাজৈশ্বর্য সুখ ভোগ সব কিছু পরিত্যাগ করে, কঠোর ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জীবনের মূল্য আর কি রইলো? ভেবে ভেবে ভদ্রিক আর কূল কিনারা পেলেন না। শাক্যরাজকুমারগণ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। সুতরাং একবার তিনি যখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন তখন আর তার অন্যথা হতে পারে না। অন্ততঃ সেরকম কোন পথই তাঁর নিকট খোলা নেই। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুর কথায় তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা আনন্দ, ভৃগু এবং কিম্বিল নামে অপর দুজন শাক্য রাজকুমার ন্যগ্রোধারামে বুদ্ধকে দেখে এবং তার ধর্মোপদেশে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুব্রত পালনের জন্য কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। আনন্দ ছিলেন বুদ্ধেরই সমবয়সী, বুদ্ধ আর আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের পার্শ্বচর হিসেবে আনন্দের নাম সমগ্র বৌদ্ধগণের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এদের সঙ্গে যশোধারার অগ্রজ দেবদত্তও বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এরা সকলে মিলে একদিন তাঁদেরই সমবয়সী, রাজপুরীর ক্ষৌরকার উপালিকে সঙ্গে নিয়ে মল্লদেশের অনুপিয় আম্রকুঞ্জে যেখানে বুদ্ধ অবস্থিতি করছিলেন, উদ্যান ভ্রমণের ছলে সেদিকে চলতে আরম্ভ করলেন। শাক্যরাজ্যের সীমা রেখার নিকটে এসে তাঁরা অন্যান্য অনুচরগণকে বিদায় দিয়ে একমাত্র ক্ষৌরকার উপালিকে সঙ্গে নিয়ে অনুপিয় আম্রকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে চলতে চলতে তাঁরা মল্লদেশের অন্তর্গত এক রমণীয় বনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে অনুপিয় আম্রকুঞ্জ বেশী দূর নয়। এবার তাদের সন্ন্যাস জীবন শুরু হতে চলেছে। শাক্যরাজকুমারগণ সেই সুন্দর বনভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে একে একে গায় থেকে রাজকীয় আভরণসমূহ উন্মোচন

করে ফেললেন। তারপর সেগুলোকে একত্র করে ক্ষৌরকার উপালির হস্তে তুলে দিয়ে, তাকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, উপালি তুমি গৃহে ফিরে যাও, এসব রত্নালঙ্কার তোমার, এদ্বারা বাকী জীবন তুমি সুখেই কাটাতে পারবে। উপালি নির্বাক বিস্ময়ে নিতান্ত অভিভূতের ন্যায় প্রথমটায় সেগুলো গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, শাক্যরাজকুমারগণ এবং রাজা ভদ্রিক আজ তাঁদের যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করে কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে চলেছেন সন্ন্যাসী সেই বুদ্ধের নিকটে ? এই শাক্যরাজকুমারগণ তো নির্বোধ বা মূর্খ নয়। তবে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসীর নিকট এমন কিছু রয়েছে, যার কাছে রাজ্য, রাজত্ব অথবা পার্থিব সম্পদ সব কিছুই এমনি তুচ্ছ। শাক্যরাজকুমার-গণ ততক্ষণে তাঁর দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে চলে গিয়েছেন। সেই বনমধ্যে সে তখন সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে পাখীর কূজন সেই বনভূমির নিস্তব্ধতাকে যেন আরও গভীর করে তুলছিল। উপালির দুই হস্ত রত্নাভরণে পরিপূর্ণ। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি নিজের দুই হস্তের রত্নাভরণ-গুলোর প্রতি। এমনি সময় তাঁর মনে একবার ভেসে উঠলো ন্যাগ্রোধারাম আশ্রমে উপবিষ্ট অবস্থায় বুদ্ধের সেই শান্ত সৌম্য মূর্তিখানি। তখনি তাঁর মনে হল সেই শান্ত সৌম্য মূর্তির নিকট এ সমস্ত রত্নালঙ্কার নিতান্তই তুচ্ছ এবং অবহেলার বস্তু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই রত্নালঙ্কারগুলোর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা দিল। এগুলো সঙ্গে নিয়ে তিনি তখন বাড়ীর দিকে ফেরবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই নির্জন বনভূমির প্রান্ত থেকে কার যেন উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান এসে পোঁছাল তাঁর কানে, 'উপালি ফেরো'। উপালি তখন সেই আহ্বান ধ্বনি লক্ষ্য করে চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কৈ, কেউ তো কোথাও নেই। এ নিশ্চয়ই তাঁর মনের ভ্রম। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই, সেই আহ্বান ধ্বনি পুনরায় ভেসে এল, 'উপালি যেয়ো না ফেরো'। তখন তাঁর কেমন করে প্রত্যয় হল, এ আহ্বান ধ্বনি সম্পূর্ণ অপার্থিব। সেই আহ্বানে তাঁর মন প্রাণ একেবারে উতলা হয়ে উঠলো। যাঁরা ইতিপূর্বে তাঁদের এই সমস্ত অলঙ্কারপত্র তাঁর নিকট সঁপে দিয়ে চলে গিয়েছেন, তিনিও তখন তাঁদের পন্থা অবলম্বন করবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিলেন এবং সে সমুদয় অলঙ্কারপত্রকে লোষ্ট্রবৎ জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। শাক্যরাজকুমারগণের প্রতি তাঁর মনে একটা ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছিল। তাঁরা কিনা তুচ্ছ বিষয় সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা চলে গিয়েছেন প্রভু বুদ্ধের নিকটে মহাসুখের সন্ধানে। উপালি তখন মনে মনে স্থির করলেন যেমন করেই হোক শাক্যরাজকুমারগণের পৌঁছবার পূর্বেই তিনি গিয়ে উপস্থিত হবেন বুদ্ধের চরণতলে অনুপিয় আম্রকুঞ্জে। তাঁদের পূর্বেই তিনি গিয়ে বুদ্ধের শরণ নেবেন। তিনিও নির্বোধ নন।

উপালি তখন ভিন্ন পথ ধরে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে চলতে লাগলেন এবং শাক্যকুমারগণের এসে পেঁছানোর পূর্বেই তিনি অনুপির আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করে বুদ্ধের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে, বুদ্ধের শরণ নিলেন। বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। ইতিমধ্যে শাক্যকুমারগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে উপালিকে সেখানে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। পরে বুদ্ধ তাঁদের দীক্ষা দান করেন। দীক্ষা প্রাপ্তির পর শাক্যকুমারগণ জ্যেষ্ঠ হিসাবে উপালিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকেই সর্বপ্রথম প্রণাম জানালেন। বুদ্ধ শাক্যরাজকুমারগণের আভিজাত্যাভিমান দূর করে তাঁদের মনকে সর্বপ্রথম নির্মল করার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উপালি নিজের প্রতিভাবলে ভিক্ষু সংঘের শ্রেষ্ঠ বিনয়ধররূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছিলেন এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতির অনুষ্ঠানের অন্যতম সভাপতি হিসেবে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

রাজা ভদ্রিক তাঁর বংশগত আভিজাত্যের গর্বের জন্যেই বন্ধুকে দেয় প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করেন নি। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার পর অদ্ভুতভাবে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ভিক্ষুব্রত পালন করে অল্পদিনের মধ্যেই সাধন মার্গের উচ্চস্তরে উপনীত হতে সমর্থ হলেন। এবং অর্হত্ব লাভ করে হলেন মুক্ত পুরুষ। অর্হত্ব লাভ করে আনন্দের আবেগে প্রায়ই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো, "আহা কি আনন্দ, কি শান্তি।" সংঘের অন্যান্য ভিক্ষুগণ একথার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন না। ভদ্রিকের এই স্বগতোক্তিকে তাঁরা ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল রাজা ভদ্রিক তাঁর পূর্বেকার রাজৈশ্বর্য এবং সুখ ভোগের স্মৃতিকে মন থেকে দূর করতে পারেন নি। সেজন্যেই থেকে থেকে বিলাপের সুরে তাঁর মুখ থেকে আপনা থেকেই স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসে। এটা তাঁর আক্ষেপের সঙ্গে স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা ক্রমে গিয়ে বুদ্ধের কানেও উঠল। বুদ্ধ একদিন ভদ্রিককে ডেকে সকলের সম্মুখে প্রশ্ন করলেন, তুমি নাকি প্রায়ই উচ্চারণ করে থাক 'অহো সুখং?' উত্তরে ভদ্রিক জানালেন, হ্যাঁ। তখন বুদ্ধ পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করেন, কেন তুমি তা করে থাক? এবার ভদ্রিক উত্তরে জানালেন যে, যখন তিনি রাজা ছিলেন, তখন সর্বদাই তাঁকে প্রহরী বেষ্টিত হয়ে কাল কাটাতে হত। একাকী কোথাও যাবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত ছিল না। তাঁর মন তখন সর্বদাই অশান্তির মধ্যে ডুবে থাকতো। রাজা হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বন্দী অবস্থার মধ্যেই তাঁর জীবন কাটতো। এখন আর তাঁর সে উদ্বেগ বা ভাবনার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এখন তিনি মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন। এর চেয়ে আর কি সুখের আছে? ভিক্ষু

ভদ্রিকের মুখে থেকে এই কথা শুনে সংঘের অন্যান্য ভিক্ষুগণ সেদিন যুগপৎ বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধও সেদিন স্মিত হাস্যে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এর পর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, ভদ্রিক কেবল এ জন্মেই আনন্দ লাভ করেননি। পূর্বেও তিনি একবার এরূপ আনন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। এই বলে তিনি ভদ্রিকের সেই পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। সেই পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত 'সুখ বিহারী জাতক' (১০) নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এরপর বুদ্ধ অনুপ্রিয় আম্রকুঞ্জের আশ্রম থেকে পুনরায় পথে বেরিয়ে পড়েন। শিষ্যগণসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে, অগণিত নরনারীকে সত্য পথের সন্ধান জানিয়ে অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন রাজগৃহে। তখন শীতকাল। এবার বুদ্ধ রাজগৃহে এসে বেণুকুঞ্জের আশ্রমে না গিয়ে নগর ছাড়িয়ে লোকালয়ের বাইরে শীতবন নামক স্থানে শিষ্যগণসহ অবস্থান করতে থাকেন। শ্রাবস্তীর বিখ্যাত ধনী শ্রেষ্ঠী সুদত্তর ভগ্নীপতির বাসগৃহ ছিল রাজগৃহে। নানা প্রকার কাজকর্মের জন্য প্রায়ই আসতে হতো তাঁকে রাজগৃহে। বুদ্ধের রাজগৃহ আগমনের পর কোন কাজের উপলক্ষে সুদত্তও এলেন তাঁর ভগ্নীপতির নিকটে। যেদিন সুদত্ত এসে উপস্থিত হলেন সেদিন তাঁর ভগ্নীপতির বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন চলছিল। ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, পরদিন স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর আবাসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পুণ্য পদধূলি দান করবেন এবং সশিষ্য তাঁর নিকট থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করবেন। এই প্রথম তিনি বুদ্ধের নাম শুনলেন। বুদ্ধের নাম তাঁর কানে যাবার পর থেকেই তিনি কেমন যেন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁর সমগ্র দেহ মন যেন একেবারে উতলা হয়ে উঠল। মনে মনে বুদ্ধ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতে লাগলেন। তখনই তিনি বুদ্ধের আশ্রমের দিকে ছুটে চলে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর ভগ্নীপতি তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এ সময় লোকালয়ের বাইরে সেই নির্জন বনভূমির পথে অগ্রসর হওয়া মোটেই নিরাপদ নয় আর তা ছাড়া এই সময়টা তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকেন। সুতরাং এখন তাঁর নিকট গেলে কোন উদ্দেশ্যও সফল হবে না। এই বলে পর দিন সকাল বেলা তিনি সুদত্তকে সেখানে যাবার জন্যে নির্দেশ দেন। সারারাত্রি শ্রেষ্ঠীর চোখে আর নিদ্রা এলো না। বুদ্ধের কথা স্মরণ করতে করতে নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। ভাবাবেগে তিনি দেখতে পেলেন নক্ষত্রভরা আকাশের গায়ে জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখা দিয়েছে। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে দেখা দিলেন অপূর্ব কান্তিবিশিষ্ট এক দিব্য পুরুষ। সেই দিব্য পুরুষটি তাঁকে কিসের ইঙ্গিত জানিয়ে দিয়ে গেলেন। এর পরক্ষণেই তাঁর ভাবাবেগ কেটে গেল। পূর্বগগনে ততক্ষণে ঊষার প্রথম আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ধৈর্য ধারণ কর্তে আর অপেক্ষা

করে থাকতে পারলেন না। তখনই তিনি পথে বেড়িয়ে পড়লেন বুদ্ধের আশ্রমের উদ্দেশ্যে, যে সময় তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন সমস্ত নগর তখন নিদ্রামগ্ন। ক্রমে নগর ছাড়িয়ে অন্ধকার বনপথের মাঝখান দিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন তিনি। সে সময়ে তাঁর মনে একটু ভয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধ নামটি স্মরণ করে, সাহসে ভর করে দ্রুত পদে পথ চলতে আরম্ভ করলেন তিনি। এভাবে পথ চলে যখন তিনি শীতবনে এসে প্রবেশ করলেন তখনও অরুণোদয় হয়নি।

সে সময় বুদ্ধও বেরিয়ে পড়েছেন তাঁর প্রাত্যাহিক প্রাতঃভ্রমণে। সেই বনভূমির পথেই স্বয়ং বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন তিনি। বুদ্ধ ইতি-পূর্বে কোন দিন শ্রেষ্ঠী সুদত্তকে দেখেননি। পথে সুদত্তকে দেখামাত্র তিনি উদাত্ত স্বরে তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁকে আহ্বান জানালেন, বুদ্ধের মুখে নিজের নামোচ্চারণ শুনে তিনি প্রথমটায় বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথমে তাঁর পরিচয় হতে চলেছে, তিনি কি করে পূর্বেই তাঁর নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় তাঁকে আহ্বান জানালেন? বুদ্ধের উদাত্ত আহ্বানে তিনি দ্রুত পদে গিয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধের সম্মুখে। দাঁড়িয়ে একবার তাঁর প্রতি তাকিয়ে তিনি একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন এবং সেখানেই তিনি বুদ্ধের চরণে নিজেকে নিবেদন করলেন। শীতকালের প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ায় বুদ্ধের দেহে সামান্য একখানি মাত্র উত্তরীয় দেখতে পেয়ে, অবাক বিস্ময়ে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কিছুক্ষণ তাঁর দেহের প্রতি তাকিয়ে থেকে তার পর ধীরে ধীরে বলে উঠলেন, এই হিমেল হাওয়ায় আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না? আপনার নিদ্রার পক্ষেও কি কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। বুদ্ধের সঙ্গে শ্রেষ্ঠী সুদত্তের এই হল পরিচয়ের আরম্ভ। সুদত্তের প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ তখন বলে উঠলেন ঃ—

সব্বদা বে সুখন সেতি ব্রাহ্মণো পরিনিবুতো
যো ন লিম্পতি কামেসু সীতি ভূতো নিরুপধি।

(যার অন্তর থেকে কামনার বহ্নিজ্বালা অপসারিত হয়ে গিয়েছে, তার অন্তরে সর্বক্ষণ অনাবিল শান্তি তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। সেই ব্রাহ্মণ সকল সময়েই সুখেতে শয়ন করে থাকেন)

নির্বাক বিস্ময়ে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত গ্রহণ করলেন বুদ্ধের প্রথম বাণী। এরপর বুদ্ধ সুদত্তকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধের বচন শুনে শ্রেষ্ঠী সুদত্তের মন থেকে অন্ধকার অহঙ্কার সবকিছুই দূর হয়ে গেল। সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন তিনি। সুনির্মল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র দেহ মন। বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিলেন তিনি। ব্যাকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করে উঠলেন বৌদ্ধ, ত্রিশরণ। পরের দিন তাঁর নিকট থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

ভগ্নীপতির আলয়ে। পরের দিন বুদ্ধ পুনরায় শ্রেষ্ঠীর আলয়ে সশিষ্য উপস্থিত হয়ে, সুদত্তের হস্ত থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করলেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কৃতার্থ হলেন। এরপর সুদত্ত বুদ্ধকে সশিষ্য শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হয়ে সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাস করবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ সুদত্তের প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন নির্জন স্থানে যেন তাঁর আশ্রমের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। কেননা তিনি নির্জনতা পছন্দ করেন। বুদ্ধের উত্তর শুনে সুদত্ত একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন, শ্রাবস্তীর মত ঐশ্বর্যশালী ঘন লোকালয়সমৃদ্ধ স্থানে বুদ্ধের বাসোপযোগী নিরিবিলি পরিবেশযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কি? তখনই তিনি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যেমন করেই হোক বুদ্ধের বাসোপযোগী স্থানের সঙ্কুলান করতেই হবে। শ্রেষ্ঠী তখন বুদ্ধকে জানালেন যে, তাঁর বাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহে কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। বুদ্ধ তখন সুদত্তের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে, আগামী বর্ষাকালটা শ্রাবস্তীতে কাটাবেন বলে স্থির করলেন।

রাজগৃহের কাজ শেষ করে সুদত্ত শ্রাবস্তীতে নিজের দেশে ফিরে এলেন। সেকালে শ্রাবস্তীর মত ঐশ্বর্যশালী নগরী এদেশে খুব কমই ছিল। তখনকার দিনের ব্যবসায়ের একটি প্রাণকেন্দ্রও ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। তার উপরে কোশল রাজ্যের রাজধানী হিসাবেও এর সুখ্যাতি বড় কম ছিল না। হরিবংশ পুরাণমতে রাজা যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্তের নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ হয়েছিল শ্রাবস্তী। ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্রস্থল হবার দরুণ দেশ-বিদেশ থেকে ধনী শ্রেষ্ঠীর দল এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করছিলেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্তও ছিলেন তাঁদেরই একজন। দেশে ফিরে আসার পর সুদত্ত তাঁর আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের নিকটই তাঁর বুদ্ধ দর্শনের কাহিনী বলে শোনাতে লাগলেন। এর ফলে তাঁর নিকট আত্মীয়-পরিজন থেকে আরম্ভ করে বন্ধুবান্ধব সকলেই বুদ্ধের প্রতি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। বুদ্ধ সশিষ্য সেখানে উপস্থিত হয়ে, সেখানেই বর্ষাকাল যাপন করবেন জেনে সকলেই যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শ্রেষ্ঠী এবার তাদের জানালেন যে, বুদ্ধের বসবাসের জন্য নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে হবে। তখন সকলে মিলে উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রাবস্তী নগরীর মধ্যে সেরকম ধরনের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। নগরের উপকণ্ঠে ছিল রাজকুমার জেতের মনোরম একখানি উদ্যান বাটিকা। নগরের বাইরে, নির্জন পরিবেশের মধ্যে, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল এই উদ্যান বাটিকাখানি। শ্রেষ্ঠিগণ সকলে মিলে সেই উদ্যান বাটিকাটিকেই বুদ্ধের বাসস্থানের উপযুক্ত হতে পারে বলে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু গোল বাধলো রাজকুমার

জেতকে নিয়ে। রাজকুমার জেত কিছুতেই তাঁর মনোরম উদ্যানখানিকে হাতছাড়া করবেন না বলে শ্রেষ্ঠিগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন। শ্রেষ্ঠিগণও ছাড়বার পাত্র নন। যে করেই হোক যত অর্থের বিনিময়েই হোক, রাজকুমারের এই উদ্যানখানিকে তাঁরা বুদ্ধকে উৎসর্গ করার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে উঠলেন। উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে তাঁরা উদ্যানখানিকে গ্রহণ করার বাসনা প্রকাশ করায় রাজকুমার জেত এক অভিনব জেদ ধরে বসলেন। রাজকুমার জেত শ্রেষ্ঠিগণকে তাঁদের চেষ্টা থেকে নিরস্ত করবার জন্যে উপহাসের ছলে তাঁদের বললেন, সমগ্র উদ্যানখানিকে স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা আবৃত করতে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা যদি তাঁরা সংগ্রহ করে সমগ্র উদ্যানখানিকে আবৃত করে দিতে পারেন তবে সেই পরিমাণ অর্থের বিনিময়েই কেবল তিনি উদ্যানখানিকে হস্তান্তর করতে সম্মত আছেন। রাজকুমার জেতের কথা শুনে শ্রেষ্ঠী সুদত্তের মুখে আনন্দের হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি তখনই গো-শকটে করে তাঁর অট্টালিকা থেকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা এনে সমগ্র উদ্যানখানিকে সেই স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা আবৃত করতে আদেশ দান করলেন। শ্রেষ্ঠীর আদেশ মত স্বর্ণমুদ্রা এনে উদ্যানখানিকে সেই স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা আবৃত করার কাজ সত্বর আরম্ভ হয়ে গেল। এভাবে সমগ্র উদ্যানখানির তিন-চতুর্থাংশ যখন স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা আবৃত হয়ে গেছে, তখন সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে রাজকুমার জেত বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বাকী অংশটুকুকে আবৃত করতে নিষেধ করে, উদ্যানখানিকে তিনি তখনই শ্রেষ্ঠী সুদত্তকে দান করেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্তের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং বুদ্ধের প্রতি অচল ভক্তি দর্শনে, রাজকুমার জেত সেদিন বিস্ময়ে নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্তও বুদ্ধের প্রতি জেতের ভক্তি দেখে সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। রাজকুমার জেতের নামানুসারেই উদ্যানখানির নাম জেতবন হয়েছিল। সেই মনোরম উদ্যানটিতে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করে গড়ে তুললেন নয়নাভিরাম বিশাল এক সংঘারাম। উদ্যানখানিকে গ্রহণ করতে গিয়েও সুদত্তকে ব্যয় করতে হয়েছিল অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা। এই সংঘারামটি শ্রেষ্ঠী সুদত্তের (পরবর্তীকালে অনাথপিণ্ডদ) নামে অনাথপিণ্ডদের আরাম নামে পরিচিত হয়েছিল। এদিকে অসম্ভব মূল্যে গ্রহণ করে উদ্যানখানিকে হস্তান্তর করার দরুন রাজকুমার জেতের মনে দারুন অনুতাপের সঞ্চার হয়। অবশেষে পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের শরণ নিয়ে সেই অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন এবং জেতবন বিহারটির চারিপাশে একটি করে বিশাল সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রেষ্ঠী সুদত্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ বর্ষাকালটা শ্রাবস্তীতে কাটাবার জন্যে ভিক্ষুগণসহ রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলে, তাঁকে মহাসমারোহে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে জেত বনের বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেই শোভাযাত্রায় শ্রেষ্ঠী সুদত্তের পাঁচশত নিকট আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অগণিত স্ত্রী-পুরুষ যোগদান করেছিলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহিণী সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে পূত বারিপূর্ণ সুবর্ণ কলসী শিরে ধারণ করে সর্বাগ্রে পথ চলতে থাকেন। এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠী রমণীগণ নানাপ্রকার রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে মাঙ্গলিক সংগীত পরিবেশন করতে করতে অনুগমন করতে থাকেন। এভাবে সকলে মিলে শোভাযাত্রা সহকারে বুদ্ধকে নিয়ে এলেন সেই মহাবিহারে। সেখানে সকলে উপস্থিত হলে, শ্রেষ্ঠী সুদত্ত সকলের সম্মুখে সেই সুবর্ণ কলসী থেকে পূত বারি দুহস্তে গ্রহণ করে তর্পণ দ্বারা উদ্যানখানিকে উৎসর্গ করলেন বুদ্ধকে এবং ভিক্ষু সংঘকে। এর পর তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পর তাঁর নতুন নাম হয় অনাথপিন্ডদ। অনাথপিন্ডদের এই মহাবিহারে বুদ্ধ ঊনিশ বৎসর কাটিয়েছিলেন। এই মহা-বিহারে বুদ্ধ প্রত্যহ সায়ংকালীন ধর্মসভায় উপস্থিত ভিক্ষু ও ভক্তগণের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়বস্তু অবলম্বনে পূর্বে সংঘটিত অনুরূপ বিষয়বস্তুর কাহিনী বর্ণনা করতেন। স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে সংঘটিত সেই সমস্ত কাহিনীই পরে জাতক কাহিনী নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই জাতক কাহিনী সকল যে কেবল আমাদের দেশেই প্রচারিত হয়েছিল তা নয়, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ তখনকার দিনের পরিচিত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পরিভ্রমণ করে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে জাতক কাহিনী সকল কথাপ্রসঙ্গে প্রচার করে-ছিলেন। সেই সকল কাহিনীর অনেকগুলোই ঘুরে ফিরে কখনও বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আবার আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামে পুনরায় প্রচারিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজা সলোমনের নামে প্রচারিত বিখ্যাত বিচার কাহিনীটির উল্লেখ করা চলতে পারে। ঈশপের নামে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলো জাতকে বর্ণিত কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। অধিকাংশ জাতক কাহিনী এই জেতবন বিহারের ধর্মসভায় বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত হয়েছিল।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হবার পর থেকে তাঁর নাম চতুর্দিকে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চারিদিক থেকে প্রত্যহ অগণিত নরনারী এসে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে লাগলেন। নানা দেশ থেকেও দর্শনার্থীর দল এসে ভিড় জমাতে লাগলেন জেতবনের আশ্রমখানিতে। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী এমনিতেই ছিল সেকালের একটি জনাকীর্ণ শহর এবং ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। মগধের রাজা বিম্বিসারের ন্যায় কোশলরাজ প্রসেনজিতের নামও বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই দুজন নরপতির নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। মগধরাজ বিম্বিসার প্রসেনজিতের ভগ্নীকে

বিবাহ করেছিলেন এবং রাজমহিষীর স্নানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কাশী প্রদেশ যৌতুক হিসেবে লাভ করেছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। সেজন্য শাক্য রাজগণও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। রাজা প্রসেনজিতের রাজধানীর উপকণ্ঠে আশ্রমে অবস্থিতি করে বুদ্ধ অগণিত ভক্ত ও শ্রমণগণকে প্রাত্যহিক ধর্মসভায় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে চলেছেন। আর সেই সঙ্গে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাবলী উল্লেখ করে নতুন ধরনের উপদেশ দান করছেন, শুনে রাজা প্রসেনজিতের মনে বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে এবং ধর্ম সম্বন্ধে তাঁকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে তিনি তীর্থঙ্কর সন্ন্যাসীগণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। বলতে গেলে এটা ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর এই স্বভাবের পিছনে ছিল একটা গর্বোদ্ধত মনোভাব এবং প্রবল আভিজাত্যবোধ। বুদ্ধকে স্বচক্ষে দর্শন করে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে রাজা প্রসেনজিৎ একদিন শিবিকারোহণে জেতবনে বুদ্ধের ধর্মসভা চলাকালীন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা প্রসেনজিতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহের সমবেত ভক্ত ও দর্শনার্থিগণ সকলেই আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হয়ে রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এরপর রাজা প্রসেনজিৎ সকলকেই পুনরায় আসন গ্রহণ করে উপবেশন করবার জন্যে ইঙ্গিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সভাগৃহে তখনও বুদ্ধের আগমন হয়নি। রাজা প্রসেনজিতের ধর্মসভায় উপস্থিতির সামান্য পরে বুদ্ধ মূল গন্ধকুঠী থেকে সভাগৃহের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকলে, উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বুদ্ধ সভাগৃহে এসে দণ্ডায়মান হলে, রাজা প্রসেনজিতের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বুদ্ধের উপর। বুদ্ধ সভাগৃহে উপস্থিত সকলের প্রতিই তাঁর করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন এবং সেই সঙ্গে রাজা প্রসেনজিৎকেও। রাজা প্রসেনজিৎ ইতিপূর্বে বুদ্ধকে দেখেননি। এতদিন পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাই কেবল বিভিন্ন লোকের মুখে শুনে এসেছেন। এবার বুদ্ধের সম্মুখে এসে স্বচক্ষে তাঁকে দর্শন করে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। অমন সুন্দর তরুণ বয়সের পুরুষটিকে রাজা প্রথমটায় একজন সন্ন্যাসী বলে মনে করতে গিয়ে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। সম্যক সম্বুদ্ধ, তথাগত প্রভৃতি নামে যাঁর এত পরিচয় এবং এত সুখ্যাতি ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে তিনি সে সকল কথার কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পেলেন না। এত তরুণ বয়সে এত সব দৈব গুণের অধিকারী হওয়া যায়, এটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। সেজন্য সেদিন তিনি বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করতে পারেননি।

বুদ্ধ সেদিন সভায় উপস্থিত হয়ে সর্বসমক্ষে আসন গ্রহণ করে সর্বপ্রথম

রাজাকেই কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বুদ্ধের কুশল প্রশ্নের উত্তরে রাজা তাঁকে গৌতম সম্বোধন করে গর্বোদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি বোধিজ্ঞান আয়ত্ব হয়েছে? রাজার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ ধীর শান্ত স্বরে জানালেন, হাঁ। এর পর রাজা বুদ্ধকে কয়েকজন বর্ষীয়ান তির্থীক সন্ন্যাসীর নাম করে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতিবৃদ্ধ এই তির্থীকগণের এখনও পর্যন্ত বোধিজ্ঞান আয়ত্ব হয়নি আর আপনি তাঁদের চেয়ে বয়সে এত নবীন হওয়া সত্তেও কি করে বলতে পারছেন যে, আপনার বোধিজ্ঞান লাভ হয়েছে? রাজার এই প্রশ্ন শুনে সভাস্থ সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সকলেই মনে মনে দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে বুদ্ধের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এর উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ ধীরে ধীরে রাজাকে জানালেন, বিষধর সর্প, অগ্নি, রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী, এই চারের কোনটিকেই ছোট করে দেখা অথবা অবহেলা করা কোন মতেই সঙ্গত নয়। বিষধর সর্প, সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তবুও সে অতি ভয়ংকর। তার দংশনে মৃত্যু অনিবার্য। তেমনি অতি ক্ষুদ্র অগ্নি স্ফুলিংগ অনায়াসেই বিধ্বংসী দাবানলের সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিশু রাজপুত্রকেও অবহেলা করা নিতান্তই মূঢ়ের কাজ। আজকের শিশু রাজপুত্র দুদিন বাদে রাজা হয়ে সিংহাসনে উপবেশন করবে। আজকে যারা তাকে শিশু বলে অবহেলা করবে, সেদিন কিন্তু তারা রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়বে। আর সন্ন্যাসীর কোন মাপকাঠি নেই। দেহের বয়স দিয়ে তার অধ্যাত্ম সাধনার মান নির্ণয় করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। সিদ্ধি লাভই তাঁর একমাত্র মান। অপর কিছুই সেখানে নয়। বুদ্ধের মুখ থেকে এই উত্তর শুনে রাজা প্রসেনজিৎ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তখন তিনি তাঁর গর্বোদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করলেন। সভাস্থ সকল লোকে জয়ধ্বনি করে স্তুতি পরিবেশন দ্বারা রাজাকে স্বাগত জানালেন। এর পরে রাজা ধর্ম সম্বন্ধে আরও নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ অত্যন্ত সরলভাবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। এবারে রাজা বুদ্ধকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন সেগুলোকে গুরু-শিষ্য প্রশ্নোত্তর বলা চলতে পারে। বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে রাজা প্রসেনজিৎ প্রায়ই জেতবনে ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ধর্ম কথা শুনতেন। এর মধ্যে রাজা প্রসেনজিতের মনে একটি খেয়াল দেখা দিল। বুদ্ধের অলৌকিক শক্তি দর্শন করবার জন্যে কদিন ধরেই তিনি মনে মনে সংকল্প এঁটে চলেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তিনি তাঁর মনের অভিপ্রায় বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করে উঠতে সক্ষম হননি। অবশেষে একদিন তিনি বুদ্ধের নিকট তাঁর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলেন। বুদ্ধ বিভূতি প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের জীবনে তিনি খুব কমই বিভূতি প্রদর্শন করেছেন।

রাজার মনোভাব প্রকাশের পর বুদ্ধ মুখে কিছু বললেন না বটে তবে তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সেদিন মূলগন্ধকুঠীতে বুদ্ধ এবং রাজা প্রসেনজিৎ ব্যতীত নিকটে আর কেউ ছিলেন না। রাজা প্রসেনজিতের সম্মুখে বুদ্ধ ধ্যান গম্ভীর মুখে আসনে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় রাজা প্রসেনজিৎ অকস্মাৎ দেখতে পেলেন যে, তাঁর সম্মুখে শুধু একজন মাত্র নন, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় একসঙ্গে বহু বুদ্ধ সেখানে অবস্থান করছেন। তার মধ্য থেকে কোন্‌টি যে প্রকৃত বুদ্ধ তা কোনমতেই তিনি স্থির করে নিতে সমর্থ হলেন না। রাজা প্রসেনজিৎ বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন বুদ্ধগণের প্রতি। তারপর তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সম্মুখেই অন্যান্য বুদ্ধগণ অকস্মাৎ পুনরায় মিলিয়ে গেলেন। সেখানে তখন রইলেন কেবল পূর্বের মতই ধ্যান গম্ভীর অবস্থায় বুদ্ধ, আর তাঁর সম্মুখে বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় রাজা প্রসেনজিৎ। শ্রাবস্তীর এই ঘটনাখানিকে বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অজন্তার গুহাগুলিতে একাধিক চিত্র রচিত হয়েছে।

রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে ছোট-বড় নানা ধরনের অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা দ্বারা বুদ্ধ রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাজার একটি প্রশ্ন হল জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি, যিনি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ রাজাকে জানান জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কারুরই উপায় নেই। অর্থ, যশ, মান প্রভৃতি কোন কিছুই জরা-ব্যাধিকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সিদ্ধ মহাপুরুষ-গণের পক্ষেও ওই একই অবস্থা। এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিণামে পরিত্যাজ্য। রাজার অপর একটি প্রশ্ন হল মানুষের অন্তরের কোন্ কোন্ ভাব অনর্থ সৃষ্টি-কারী? রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান, লোভ, মোহ এবং দ্বেষ মানব মনের এই তিনটি ভাবই হল সবচেয়ে অধিক অনর্থ সৃষ্টিকারী। মানুষের মনে এই তিনটি ভাবের উদয় হলে তা থেকে প্রথমে মানব মনে নিদারুণ অশান্তি দেখা দেবে এবং তা থেকে পরিণামে অশেষ দুঃখ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হবে। কাকে দান করলে দানের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়? রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান, সুশীল ও সজ্জন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। এদের দান করলে দানের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

শ্রাবস্তীর এক ধনবান শ্রেষ্ঠী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলে, তার বিপুল ধনসম্পত্তি রাজার আদেশে রাজকোষাগারে নিয়ে আসা হয়। এর ফলে প্রায় আশি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রাজকোষাগারে জমা পড়ে। এই বিপুল সম্পত্তির সামান্যতম অংশও শ্রেষ্ঠীর জীবিত অবস্থায় কোন প্রকার সৎকাজে ব্যয়িত হয়নি। এত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠী নিজে অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন।

দান-ধ্যান তো দূরের কথা, শ্রেষ্ঠী নিজের সুখ-সুবিধার জন্যেও কখনও কপর্দকও ব্যয় করতেন না। বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে- রাজা তাঁকে শ্রেষ্ঠী সম্বন্ধে এবং তাঁর বিপুল ধনরাশির পরিণতি সম্বন্ধে সব কথা জানালেন। সব শুনে বুদ্ধ মন্তব্য করলেন, কৃপণের ধনের শেষ পর্যন্ত এরকম পরিণতিই হয়ে থাকে। অপরে তা ভোগ করে। মূর্খ এবং অসৎ ব্যক্তি নিজে কখনও সঞ্চিত অর্থের সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হয় না। সৎকর্মে অর্থ ব্যয়িত হলে তবেই তা সার্থক হয়ে দেখা দেয়। আর একদিন ধর্মসভায় কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ রাজাকে বলেন, মহারাজ জগতে চার রকমের লোক রয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হল তমোতম পরায়ণ। এ ধরনের ব্যক্তিগণ শত দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত থেকেও পাপ কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। সে আলোকের পরিবর্তে ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকারের প্রতি অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলতে থাকে। ফলে তার কর্মফল ক্রমশঃ অধিকতর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। আবার যে ব্যক্তি শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও সর্বদা সৎকাজে লিপ্ত থাকে সে ব্যক্তি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করে। তার কর্মফল হয় উজ্জ্বল। এরূপ ব্যক্তি হল তমোজ্যোতি-পরায়ণ। আর উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে যে ব্যক্তি সর্বদা পাপ কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখে, যে আলো থেকে ক্রমশঃ অন্ধকারের দিকে ছুটে চলতে থাকে এরূপ ব্যক্তি হল জ্যোতিতমপরায়ণ। যে ব্যক্তি সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সর্বদা সৎভাবে ধর্মপথে থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তিনি হলেন জ্যোতি-জ্যোতিপরায়ণ। তিনি আলো থেকে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর আলোর দিকেই যাত্রা করে থাকেন এবং পরিণামে মুক্ত পুরুষ হন। এভাবে বুদ্ধের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রাজা প্রায়ই তাঁকে নতুন নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন এবং বুদ্ধও রাজার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই যথোচিত উত্তর দান করে রাজাকে মুগ্ধ করতেন। মগধের রাজা বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের নাম বৌদ্ধ সাহিত্যের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

শ্রেষ্ঠী সুদত্ত যেদিন জেতবন বিহারটিকে বুদ্ধকে উৎসর্গ করে, তাঁর শরণ নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম হয় অনাথপিণ্ডদ। এই অনাথপিণ্ডদের নামও বৌদ্ধ সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সুদত্তের ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার সংবাদ পেয়ে তাঁর পাঁচশত বন্ধু বুদ্ধকে দর্শন করে তাঁর নিকট থেকে ধর্মকথা শুনবার জন্যে সকলে মিলে একদিন জেতবন মহাবিহারের ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হন। এরা সকলেই ছিলেন তির্থীক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের শিষ্য। এরা সকলেই সেদিন মালা চন্দন প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ সন্দর্শনে এসেছিলেন। বুদ্ধের নিকট থেকে ধর্মকথা শুনে তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হন। সেই থেকে তাঁরা প্রত্যহই মালা চন্দনাদি দ্বারা বুদ্ধের চরণ বন্দনা করতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ধর্ম কথা শুনতেন। অবশেষে তাঁরা সকলে মিলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথে চলতে আরম্ভ করেন।

শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করে বুদ্ধ এর পর পুনরায় রাজগৃহে ফিরে আসেন এবং সেখানে প্রায় আট মাসকাল সময় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি সশিষ্য রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহারে পুনরায় বর্ষাযাপনের উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন। বুদ্ধের শ্রাবস্তী ত্যাগ করে চলে যাবার পর অনাথ-পিন্ডদের সেই পাঁচশত বন্ধু যাঁরা বুদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথ চলতে শুরু করেছিলেন সেই শ্রেষ্ঠিগণ বুদ্ধ শাসন পরিত্যাগ করে পুনরায় তাঁদের পূর্ব গুরুগণের নির্দেশ মেনে চলতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে ফিরে এলে অনাথপিন্ডদ তাঁর বন্ধুবর্গকে পুনরায় বুদ্ধের সম্মুখে এনে উপস্থিত করেন এবং আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করেন। বুদ্ধ তখন সেই পাঁচশত শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সত্য সত্যই আমার নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে-ছিলে? বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে শ্রেষ্ঠিগণ সম্পূর্ণ নিরুত্তর রইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে একজন সাহস সঞ্চার করে নির্ভয়ে বলে উঠলেন "হাঁ ভদন্ত"। এবার বুদ্ধ তাঁদের উদ্দেশ করে জানালেন, উপাসকগণ তোমরা জেনে রাখ, সর্বনিম্নে অবীচি (নরক) থেকে আরম্ভ করে ভবাগ্র (স্বর্গলোক) পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এমন কেউ নেই, যিনি শীলাদিগুণে বুদ্ধের সমকক্ষ হতে পারেন। তার চেয়ে উর্ধ্বে ওঠার তো কোন প্রশ্নই দেখা দিতে পারে না। একথা বলার পর তিনি তাঁদের ধর্মসম্বন্ধে পুনরায় উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। এবার তাঁদের মন ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে এবং তাঁরা পুনরায় বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন।

কথাচ্ছলে প্রকারান্তরে বুদ্ধ তাঁর নিজের পরিচয় অনেকবারই দিয়েছেন। সর্বপ্রথমে তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করেছিলেন, মৃগদাবের সন্নিকটে পরিব্রাজক উপকের নিকট। তারপর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ যখন কোনমতেই তাঁর কথায় প্রত্যয় মানতে চাইছিলেন না, সে সময়ে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে তাঁদের সমক্ষে একবার নিজের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। এবার অনাথ-পিন্ডদের বন্ধুগণের নিকট স্পষ্টভাবে তিনি নিজের পরিচয় ব্যক্ত করলেন। এরকম স্পষ্ট ভাষায় তিনি নিজের পরিচয় খুব কমই প্রদান করেছেন।

শ্রাবস্তী নগরবাসী মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা তাঁর পিতৃদত্ত অলংকার-পত্রাদি সবকিছু বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ সেই অর্থ দ্বারা শ্রাবস্তীর পূর্বদিকে একখানি রমণীয় উদ্যান ক্রয় করেন, এবং সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করে সেটি বুদ্ধকে উৎসর্গ করেন। এই বিহারের নাম পূর্বারাম। বুদ্ধ তাঁর জীবনের ছয় বৎসরকাল এই বিহারে অতিবাহিত করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশাখার নাম অমর হয়ে আছে মহোপাসিকা নামে। বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক এবং পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী। অঙ্গদেশের অন্তর্গত ভদ্রঙ্করে নামক স্থানে ছিল তাঁদের বাস। সে সময়ে অঙ্গদেশ মগধ রাজ্যের

অন্তর্গত ছিল। বুদ্ধ একবার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভদ্রঙ্করে উপস্থিত হয়ে সেখানকার জনগণকে ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে এসেছিলেন। সে সময়ে বিশাখা ছিল সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধীসম্পন্না বিশাখা সেই অল্প বয়সেই বুদ্ধের ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং সে সময়েই তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করে সাধন মার্গের উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মগধ রাজ্যে যত শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল সে তুলনায় তখনকার দিনে কোশল রাজ্যে তত ধনী শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল না। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর ভগিনীপতি মগধরাজ বিম্বিসারকে একবার অনুরোধ করেছিলেন তাঁর রাজ্য থেকে কয়েকজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে কোশল রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু মগধের ধনী শ্রেষ্ঠিগণ কেউই মগধ ত্যাগ করে কোশল রাজ্যে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে সম্মত হলেন না। অবশেষে রাজা বিম্বিসারের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী সাকেত নগরে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বিশাখা তখন পনের বছরের বালিকামাত্র।

শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী মৃগার তাঁর পুত্র পূর্ণবর্ধনের বিবাহের জন্যে একটি উপযুক্ত কন্যার খোঁজ করছিলেন। পূর্ণবর্ধন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সর্ব-সুলক্ষণাযুক্ত পঞ্চকল্যাণী পাত্রী না পেলে তিনি কিছুতেই বিবাহ করবেন না। পূর্ণবর্ধনের আত্মীয়স্বজনগণ অবশেষে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে দেখে তাকেই উপযুক্ত পাত্রী বলে নির্দেশ করেন। সেই অনুসারে পূর্ণবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্যে আহার্য দ্রব্যাদি চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা রন্ধন করিয়েছিলেন। পতিগৃহে যাবার পূর্বে কন্যাকে তিনি হেঁয়ালীপূর্ণ দশটি উপদেশ দান করেন, যাতে অপরে তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হতে না পারে। শ্রেষ্ঠী মৃগার সম্মুখে উপস্থিত থেকে সেই কথাগুলো সবই শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু কোন কথারই মর্মার্থ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। যাকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ-গুলো দেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র তিনিই তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

শ্রেষ্ঠী মৃগার ছিলেন একজন তির্থীকের শিষ্য। তাঁর গুরুর নাম ছিল নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র। পুত্রবধূকে স্বগৃহে এনে, মৃগার সর্ব প্রথমে বিশাখাকে তাঁর গুরুর নিকট এনে উপস্থিত করলেন, তাঁর আশীর্বাদ লাভের আশায়। বিশাখা তাঁর শ্বশুরের গুরুকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাতে গুরু ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যকে এই অলক্ষুণে পুত্রবধূকে গৃহ থেকে অবিলম্বে দূর করে দেবার জন্যে পরামর্শ দেন। মৃগার গুরুর

ব্যবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন এবং পুত্রবধূর অপরাধ মার্জনা করবার জন্যে গুরুকে অশেষ মিনতি জানাতে থাকেন। গুরু বিশাখাকে অলক্ষুণে বলেছিলেন তার কারণ তিনি বিশাখাকে দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি শ্রমণ গৌতমের একজন শিষ্যা। মৃগার গুরুর আদেশ মত বিশাখাকে পরিত্যাগ করলেন না সত্য, কিন্তু তখন থেকে তিনি বিশাখাকে সুনজরে দেখতে পারতেন না। বিশাখার সামান্যমাত্র কথা কানে গেলেও মৃগার রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন। একদিন মৃগার দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন, এমন সময় এক অর্হৎ ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রেষ্ঠী মৃগারের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলেন। অর্হৎকে দেখতে পেয়ে বিশাখা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, আপনি দয়া করে এখন অন্য কোথায়ও গমন করুন, এ বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি এখন "পুরাণ ভক্ষণ" করছেন। মৃগার পুত্রবধূর কথার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেননি। "পুরাণ ভক্ষণ" কথাটি শুনেই তিনি একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। এবং তক্ষুনি বিশাখাকে গৃহ থেকে অবিলম্বে দূর করে দেবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। বিশাখা কিন্তু শ্বশুরের ক্রোধ দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। গৃহের অন্যান্য পরিজনদের সম্মুখে বিশাখা "পুরাণ ভক্ষণ" কথার অর্থ সবিস্তারে বর্ণনা করে, শ্বশুরকে তখন বুঝিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফল গ্রহণ করেছেন মাত্র। মৃগার তখনকার মতো শান্ত হলেন বটে, কিন্তু পুত্রবধূর উপর তাঁর রোষ পূর্বের ন্যায়ই বর্তমান রয়ে গেল।

আর একদিন রাত্রিবেলা নবজাত অশ্বশাবককে দেখবার জন্যে বিশাখা প্রদীপ হস্তে গৃহের বাইরে গেলে মৃগার তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, তোমার পিতা বিবাহের পরে তোমাকে উপদেশদানচ্ছলে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে যে দশটি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল "গৃহের আগুন বাইরে নিয়ে যেও না", তবে কিজন্য আজ তুমি প্রদীপ হস্তে গৃহের বাইরে গিয়েছিলে? শ্বশুরের মুখ থেকে একথা শোনার পর বিশাখা তখন তাঁর পিতার উপদেশগুলোর মর্মার্থ সব কিছুই একে একে সবিস্তারে বর্ণনা করে মৃগারকে বুঝিয়ে দেন। তখন মৃগার তাঁর নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে পুত্রবধূর নিকট দারুণভাবে লজ্জিত হলেন। এর পর বিশাখা স্পষ্ট ভাষায় শ্বশুর মৃগারকে জানিয়ে দিয়ে বলেন যে, তিনি বুদ্ধের একজন শিষ্যা এবং ত্রিরত্নের উপাসিকা। যদি শ্বশুরালয়ে তাঁকে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার দেওয়া না হয় তবে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে যেতে প্রস্তুত। পুত্রবধূর এ কথার পর মৃগার আর তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি। এর কিছুদিন বাদে বিশাখা বুদ্ধ সমেত জেতবন বিহারের সমস্ত ভিক্ষুগণকে তাঁর গৃহে অন্ন গ্রহণ করবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে সশিষ্য বুদ্ধ মৃগার শ্রেষ্ঠীর বাসভবনে এসে দ্বিপ্রহরে অন্নগ্রহণ করেন। আহার শেষে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি-

বর্গের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম কথা শুনে শ্রেষ্ঠী মৃগার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বুদ্ধের চরণাশ্রয় করে তিনি তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এরপর মৃগার পুত্রবধূকে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন "মা এতদিনে তুমি তোমার এই সন্তানকে উদ্ধার করলে।" সেই থেকে বিশাখার "মৃগার মাতা" নামে নতুন পরিচয় হয়েছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশাখার নামের সঙ্গে "মৃগার মাতা" নামটিও দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের শরণ নেবার পর শ্রেষ্ঠী মৃগার বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্যরূপে পরিণত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্যে এবং নতুন নতুন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্যে শ্রেষ্ঠী মৃগার অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। শ্বশুরের বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বিশাখা প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষুর জন্যে ভোজ্য দ্রব্য দান করতেন এবং কোন ভিক্ষু পীড়িত হয়ে পড়লে তার সেবা-যত্নের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতেন। বিশাখা তাঁর পিতৃদত্ত সমস্ত রত্নালঙ্কার বিক্রয় করে শ্রাবস্তীর পূর্বদিকে একটি নতুন মহাবিহার নির্মাণ করিয়ে দেন, একথা পূর্বে একবার বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠী মৃগার এবং তাঁর পুত্রবধূ বিশাখার নাম বৌদ্ধ সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মহোপাসিকা নামে বিশাখা বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত হয়ে আছেন। তখনও ভিক্ষুণী সংঘের সৃষ্টি হয়নি।

শ্রাবস্তী থেকে বুদ্ধ চলে আসেন পুনরায় রাজগৃহে। সেখানে বেনুকুঞ্জের আশ্রমে তিনি চতুর্থ বর্ষা উদযাপন করেন। এ সময়ে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দেখা দেয়। রাজগৃহের তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জীবকের চিকিৎসার গুণে তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। জীবক তিনটি পদ্মফুলের মধ্যে ঔষধ রেখে বুদ্ধকে সেই তিনখানি ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে বলেন এবং তাতেই রোগের সম্পূর্ণ উপশম হয়। বুদ্ধের সাহচর্যে আসার পর থেকে তিনি নিজেও বুদ্ধের একজন বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার তিনি বুদ্ধকে দর্শন করতেন। তাঁর বাস ছিল রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতের নিকটবর্তী আম্রকাননে। রাজা বিম্বিসার আম্রকাননটি জীবককে তাঁর বাসের জন্য প্রদান করেছিলেন। জীবক বুদ্ধের বাসের জন্যে তাঁর আম্রকাননে একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজগৃহে এলে বুদ্ধ প্রায়ই জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং সেখানে অবস্থিতি করতেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করে বুদ্ধ বেনুকুঞ্জের আশ্রমেই অবস্থিতি করতে থাকেন। সেখানে প্রত্যহ ধর্মসভার অধিবেশনও হতে থাকে। সেই ধর্মসভায় দূর-দূরান্ত থেকেও লোকের সমাগম হত। যাঁরাই সেই ধর্মসভায় যোগদান করতেন তাঁরা সকলেই বুদ্ধের সুমধুর ধর্মালাপে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং সেখানেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। একবার বৈশালী থেকে কয়েকজন ভক্ত এসে বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত জানিয়ে নিবেদন করলেন,

ভদন্ত বৈশালীতে নিদারুণ মহামারী দেখা দিয়াছে। সেই মহামারীর কবলে পড়ে প্রত্যহ বহুলোক প্রাণ হারাচ্ছে। আপনি যদি দয়া করে একবার বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তবেই মহামারী দূর হয়ে যাবে। লোকে শান্তি পাবে নচেৎ কিছুতেই সেখানকার লোকেদের নিস্তার পাবার উপায় নেই। বৈশালীতে মহামারী দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার লিচ্ছবীগণ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে মহামারীর উপশম ঘটাবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেন তীর্থিকগণ। তীর্থিকগণের শত চেষ্টাতেও যখন মহামারীর কিছুমাত্র উপশম দেখা দিল না বরং প্রত্যহ মৃত্যুর হার আরও বেশী পরিমাণে দেখা দিতে লাগল, তখন তীর্থিকদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে অবশেষে কয়েকজন লিচ্ছবী এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের নিকটে। লিচ্ছবীগণের কাতর অনুরোধে বুদ্ধ কয়েক জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ঋদ্ধিবলে আকাশপথে এসে উপস্থিত হলেন বৈশালীতে। বুদ্ধের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে মহামারীর উপশম হয়ে গেল। সমগ্র লিচ্ছবী রাজ্য শান্তি পেল। তীর্থিকগণের শত চেষ্টায় যা সম্ভব হয়নি, বুদ্ধের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে তা সম্ভব হয়ে গেল। বুদ্ধের এই অলৌকিক শক্তি দর্শন করে লিচ্ছবীগণের প্রায় সকলেই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। গোশৃঙ্গি নামে এক ধনী ব্যক্তি বুদ্ধের বাসের জন্য বৈশালীর উপকণ্ঠে মহাবন নামক প্রশস্ত শালবনে সুন্দর একখানি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে সেই বিহার, কূঠাগারশালা নামে পরিচিত হয়েছিল। বুদ্ধ সেই বিহারে পঞ্চম বর্ষা উদযাপন করেছিলেন।

বুদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশ শাক্যবংশ নামে পরিচিত। আর তাঁর মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয়ই কৌলিয় বংশ। কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের ভগ্নীদ্বয় মহামায়া এবং আর্যা গৌতমী যথাক্রমে তাঁর মাতা এবং বিমাতা। বুদ্ধজায়া যশোধারা হলেন তাঁর মাতুল সুপ্রবুদ্ধের কন্যা। কিংবদন্তী অনুসারে কোলি (কদম্ব) বৃক্ষের নামানুসারে এই রাজবংশ কৌলিয় রাজবংশ নামে পরিচিত হয়েছিল। শাক্য এবং কৌলিয় এই উভয় রাজ্যই আবার পরস্পর সংলগ্ন। উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করে বয়ে চলেছিল ক্ষুদ্র রোহিণী নদী। বুদ্ধ যখন বৈশালীতে ছিলেন তখন শাক্য ও কৌলিয়ের মধ্যে রোহিণী নদীর জলের বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে একবার গুরুতর অশান্তি দেখা দিয়েছিল। সেই অশান্তি ক্রমে যুদ্ধের পর্যায়ে গড়িয়ে যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল। উভয় পক্ষই মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপর পক্ষকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে এমন সময়ে বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে আকাশপথে অকস্মাৎ বিবদমান দলের একেবারে মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়ে হস্ত উত্তোলন করে উভয় পক্ষকে নিরস্ত্র হতে সঙ্কেত জানালেন। বুদ্ধের হস্ত উত্তোলন করার সাথে সাথে বিবদমান পক্ষদ্বয় মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শান্তভাব ধারণ করল। তারপর সেই রোহিণী

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে উভয়পক্ষের লোকজনদের একত্রিত করে তাদের সম্মুখে অমৃতময় মধুর বাণী বর্ষণ করে তাদের মন থেকে বিবাদের সমস্ত কালিমা দূর করে দিলেন। উভয় পক্ষকে উপদেশ দান কালে তিনি তাঁর পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে তিনখানি ঘটনার উল্লেখ করেন। সেই তিনখানি ঘটনা পরে বৃক্ষধর্ম জাতক (৭৪), স্পন্দন জাতক (৪৭৫) এবং কুনাল জাতক (৫৩৬) নামে পরিচিত হয়।

এই ঘটনার পর বুদ্ধ কিছুদিন বৈশালীর কুঠাগারশালায় অবস্থিতি করেন। সে সময়ে তাঁর পিতা শুদ্ধোদন গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। পিতার কঠিন রোগের সংবাদ যখন তাঁর নিকটে এসে পৌঁছাল তখন তিনি দেখতে পেলেন পিতার অন্তিমকাল নিকটবর্তী হয়েছে। এ সময়ে একবার অন্ততঃ পিতার নিকট উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কালবিলম্ব না করে কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আকাশপথে কপিলাবস্তুতে এসে উপস্থিত হলেন এবং রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন দান করেন। অন্তিম সময়ে পুত্রকে দেখতে পেয়ে রাজা শুদ্ধোদনের মুখে অনাবিল হাসির রেখা ফুটে উঠলো। পিতার সেই অবস্থায় বুদ্ধ পিতাকে ধর্ম সম্বন্ধে এবং পার্থিব সবকিছুর অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। পুত্রের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শুনে রাজা শুদ্ধোদন অর্হত্ব লাভ করলেন। সেই অন্তিম সময়ে অর্হত্ব প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে প্রণিপাত জ্ঞাপন করার সময়েই তাঁর নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। পিতার নির্বাণপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ কিছুদিন পর্যন্ত কপিলাবস্তুর সেই ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে অবস্থিতি করেন।

রাজা শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর সংসারের প্রতি আর্যা গোতমীর আর কোন প্রকার আকর্ষণই রইলো না। তাঁর একমাত্র পুত্র নন্দ বহুদিন পূর্বেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছেন। পৌত্র রাহুলও তাই। সংসারের প্রতি তাঁর শেষ আকর্ষণ বলতে যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল রাজা শুদ্ধোদনের অবর্তমানে সেটুকুও তখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুবিশাল রাজপুরী তখন তাঁর নিকট কারাগারের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। সংসার কারাগার থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তখন তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে পদব্রজে এসে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার সংকল্প পুত্রের নিকট ব্যক্ত করেন। কিন্তু বুদ্ধ কিছুতেই আর্যা গোতমীর আবেদনে অনুমতি দান করলেন না।

পুত্রের নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতির বদলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেও আর্যা গোতমীর সংকল্পে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। বরং পূর্বের চেয়ে তিনি আরও দৃঢ়ভাবে তাঁর কর্তব্য স্থির এবং সুনিশ্চিত করে ফেললেন। যে করেই হোক তিনি পুত্রের নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেনই। এবার তিনি শুধু

একা নন, যে সমস্ত শাক্য রাজকুমার বুদ্ধের প্রথম বার কপিলাবস্তু আগমনের সময়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, সেই সকল শাক্য রাজকুমারগণের জননী, জায়া প্রভৃতি যাঁরা সংসারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বীতস্পৃহ হয়ে কোন ক্রমে দিনাতিপাত করে চলেছিলেন, এবার তাঁরাও সকলে মিলে আর্যা গোতমীর অনুসরণে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপন করে সেখানে যোগদানের জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেন। এদিকে বুদ্ধ সংঘের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে একমাত্র অমঙ্গলের আশঙ্কায়ই ভিক্ষু সংঘে নারী জাতিকে স্থান দিতে অসম্মত হয়ে আর্যা গোতমীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দান না করে বৈশালীতে এসে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণে অভিলাষী প্রায় পাঁচশত অসূর্যম্পশ্যা শাক্য রমণী যাঁরা ইতিপূর্বে কখনও সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেননি, তাঁরা সকলে মিলে আর্যা গোতমীর সঙ্গে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কপিলাবস্তু থেকে এসে উপস্থিত হলেন বৈশালীতে। শ্রান্ত, ক্লান্ত সেই রমণীগণের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, দয়ার অবতার আনন্দের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তাঁর দুনয়ন থেকে অবিরলধারায় তখন কেবল অশ্রু নির্গত হতে থাকে। শাক্যরমণীগণ আর্যা গোতমীর সঙ্গে বুদ্ধকে দর্শন করে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবার পরেও বুদ্ধ তাঁদের সংঘে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। একমাত্র আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অবশেষে বুদ্ধ নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিতে সম্মত হন এবং নারী সংঘের জন্যে আরও কয়েকটি কঠোর নিয়মের প্রবর্তন করেন। তা সত্ত্বেও বুদ্ধ আনন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আনন্দ নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিয়ে তুমি সংঘের আয়ু কমিয়ে দিয়েছ।" মহাপ্রজাপতি আর্যা গোতমীর নেতৃত্বে সেই পাঁচশত শাক্য রমণী ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে, বুদ্ধ প্রবর্তিত কঠোর নিয়ম মেনে চলতে থাকেন। পরে তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অধিক পরিমাণে রমণীগণ এসে সেই ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করতে থাকেন।

ভিক্ষুণী সংঘের জন্য বুদ্ধ বিশেষ যে সমস্ত কঠোর নিয়মের প্রবর্তন করেন, মহাপ্রজাপতী গোতমী এবং অন্যান্য শাক্য বংশীয় রমণীগণ সে সকল কঠোর বিধিব্যবস্থা সানন্দে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করার অল্পদিনের মধ্যেই আর্যা গোতমী অর্হত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্হত্ব লাভ করার পর মনের আনন্দে একদিন তিনি পুত্রকে দর্শন করতে এসে সুললিত গাথার মাধ্যমে পুত্রকে বন্দনা করে বললেন, বুদ্ধ তুমি জগতের মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার দুঃখ মোচন করেছ এবং আমার মত বহু লোকের দুঃখ মোচন করেছ। কখনো মাতা, কখনো পিতা, কখনো পুত্র, আবার কখনও ভ্রাতারূপে বহুবার আমি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেছি এবং পুনঃ পুনঃ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হয়েছি। এবারই তোমার কৃপাবলে

আমি দুঃখ সাগর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। সেজন্য তোমায় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং প্রণাম নিবেদন করছি। আর্যা গৌতমীর এই স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী একশত কুড়ি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলে পালি গ্রন্থাদিতে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রাজা শুদ্ধোদনের ন্যায় আর্যা গৌতমীর নির্বাণপ্রাপ্তির সময়েও স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন।

আর্যা গৌতমীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে সম্পূর্ণ একা পড়ে গেলেন বুদ্ধ-জায়া যশোধারা। স্বামীর সংসার ত্যাগের পর তিনি নিজেও সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কঠোরভাবে জীবন যাপন করে চলেছিলেন। সর্বপ্রকার আভরণ ত্যাগ করে, কেশ মুন্ডন করে তিনিও যথার্থ সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন। সমস্ত দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার গ্রহণ করতেন এবং মৃৎপাত্রে আহার্যবস্তু গ্রহণ করতেন। সন্ন্যাসিনী হওয়া সত্ত্বেও পতিকুলের এবং পিতৃকুলের সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারিণী হয়েছিলেন তিনি। এই অবস্থা তাঁর নিকট অসহ্য বলে বোধ হওয়ায় এবং এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশায় তিনিও আর্যা গৌতমীর পথ অবলম্বন করবার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হন। তাঁর সঙ্গে সাড়া দিয়ে শাক্যবংশীয় আরও প্রায় পাঁচশত রমণী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদানের জন্যে তৈরী হলেন। কপিলাবস্তুর প্রজাবৃন্দ এবং কোলিয় প্রজাবৃন্দ যশোধারাকে তাঁর সংকল্প থেকে বিরত করবার জন্যে কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু যশোধারা তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত কপিলাবস্তুর প্রজাবৃন্দ এবং কোলিয় প্রজাবৃন্দ তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিণীগণকে রথ প্রভৃতি দিয়ে বৈশালী যাত্রায় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যশোধারা তাঁদের কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেননি। সেই পাঁচশত রমণীগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কপিলাবস্তু থেকে বৈশালী পদব্রজে গমন করে-ছিলেন। বৈশালীতে উপস্থিত হয়ে তিনি এবং অপর শাক্য রমণীগণ আর্যা গৌতমীর নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধ সে সময় বর্ষাবাসের জন্যে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে চলে এসেছিলেন। আর্যা গৌতমীর নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি শ্রাবস্তী চলে আসেন এবং জেতবন বিহারে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেন। বুদ্ধ তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করেন।

বুদ্ধ বৈশালীতে সর্বপ্রথম ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। এবার শ্রাবস্তীতে বৈশালীর আদর্শে একটি ভিক্ষুণী সংঘ গঠন করেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুণী সংঘ গঠিত হওয়ার পর দলে দলে রমণীগণ এসে বুদ্ধের নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সেই ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনাথপিন্ডদের কন্যাও ছিলেন। এই ভিক্ষুণী সংঘ জেতবন বিহারের নিকটেই স্থাপিত হয়েছিল।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে তাঁর জীবনের উনিশ বৎসর সময় অতি-

ব্যাহিত করেছেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করে গিয়েছেন। রাজগৃহের বেনুকুঞ্জের আশ্রমে এবং শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারেই তিনি সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন। জেতবনের ধর্মসভায় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কালে প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত থেকে একটি দুটি কাহিনীর অবতারণা করতেন। সেগুলোই পরে জাতক কাহিনী নামে প্রচারিত হয়েছে। অধিকাংশ জাতক কাহিনী এই জেতবনের আশ্রমেই বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল। নানা দিক থেকে এই জেতবন বিহারটির নাম বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনার কেন্দ্রস্থল এই বিহারটি। বিভিন্ন সময়ে এই বিহারটিতে বুদ্ধের অবস্থান কালে যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং যেগুলোর উল্লেখ বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় তার কয়েকটি মাত্র এখানে তুলে ধরা হল।

শ্রাবস্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা পটাচারা। রূপে গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। বাড়ীর এক যুবক দাসের প্রতি পটাচারা প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। পিতা শ্রেষ্ঠী কন্যার এই অবৈধ প্রণয়ের বিষয় অবগত হয়ে সেই যুবকটিকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে দেন। পরে কন্যার বিবাহের জন্য একটি সুপাত্র স্থির করে বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করে ফেলেন। শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে যখন বিবাহের উৎসবের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, শ্রেষ্ঠী কন্যা পটাচারা সেই সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে পিতৃগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন এবং সেই যুবকের সাথে মিলিত হয়ে দুজনে মিলে দূর দেশে চলে গেলেন। গভীর অরণ্যের ধারে, ছোট একখানি গ্রামে উপস্থিত হয়ে, দুজনে মিলে সেখানে বাসা বেঁধে ঘর সংসার করতে আরম্ভ করেন। পটাচারা তাঁর অলঙ্কার পত্র সবকিছুই বিক্রী করে ফেলেন এবং সেই অর্থ দিয়ে তাঁদের সংসারটিকে চালাতে থাকেন। এভাবে দুজনের ছোট সংসারখানি বেশ সুখেই চলছিল। ক্রমে পটাচারা সন্তান-সম্ভবা হলে পিতৃগৃহে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পিতৃগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলে, সেখানে তাঁকে নিদারুন ভৎসনা ও দুর্ব্যবহার পেতে হবে তা জেনেও সে পিতৃগৃহে যাবার জন্যে অতি মাত্রায় জেদ প্রকাশ করতে থাকে। স্বামীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও পটাচারা পিতৃগৃহে যাবার সংকল্প ত্যাগ করেননি। স্বামীও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। অবশেষে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে পটাচারা একদিন নিজেই একাকী পিতৃগৃহে যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি। পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে খানিক দূর অগ্রসর হবার পর, পথে বন মধ্যে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদিকে তাঁর স্বামী তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেই বনমধ্যে এসে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতে

পেয়ে আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন এবং পুত্রসহ স্ত্রীকে কুটিরে নিয়ে আসেন। পিতা মাতার আদর যত্নে সেই শিশু ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকে। শিশুটি যখন হাঁটা চলা করতে শিখলো তখন পটাচারা পুনরায় সন্তানসম্ভবা হলেন। এবারেও তিনি পূর্বের মতই পিতৃগৃহে যাবার জন্যে জেদ ধরে বসলেন, স্বামী তাঁকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলেন না। স্বামীর একান্ত অমত সত্ত্বেও পটাচারা শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন। তখন বাধ্য হয়ে স্বামীকেও সঙ্গে চলতে হল। নিজেদের গ্রামখানা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যখন তারা এসে উপস্থিত হলেন, সে সময়ে আকাশ ঘন কালো মেঘে আবৃত হয়ে উঠলো এবং একটু পরেই আরম্ভ হল মুষলধারায় বৃষ্টিপাত। সেই প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে তার স্বামী পটাচারা এবং শিশুপুত্রটিকে নিয়ে পড়ে গেলেন মহাবিপদে। যেমন করেই হোক সামান্য একটু আশ্রয় তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। অবশেষে নিকটে লতা গুল্মে বেষ্টিত একটি ঝোপ দেখতে পেয়ে সেটিকে আপাততঃ পটাচারার আশ্রয়স্থল হিসাবে তৈরী করে নেবার জন্যে তাঁর স্বামী সেখানে গিয়ে প্রবেশ করতেই এক বিশালাকার কেউটে সাপ ছোবল মেরে নিমেষের মধ্যে তার প্রাণ সংহার করে দেয়। এই আকস্মিক বিপদে পটাচারার মস্তকে যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো। আর ঠিক সেই সময়েই সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হল তার পুত্র। এর পর পটাচারার নিকটে তার পিতৃগৃহে যাওয়া ব্যতীত অপর কোন পথ আর খোলা রইল না। তিনি তখন নবজাত পুত্রটিকে কোলে নিয়ে অপর পুত্রের হাত ধরে কোনমতে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। সামনে পড়ল ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী। জল অল্প হলেও তার স্রোত ছিল ভয়ঙ্কর, দুটি শিশুকে নিয়ে একসঙ্গে পার হবার কোন উপায় নেই দেখে পটাচারা তার বড় পুত্রটিকে সেই স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সদ্যজাত পুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে পরপারে গিয়ে উঠলেন। তারপর সদ্যজাত শিশুটিকে একটি বৃক্ষের তলে শুইয়ে রেখে বড় পুত্রটিকে নিয়ে যাবার জন্য স্রোতের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার পুত্রটি মাকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে ওঠে এবং মায়ের পৌঁছানোর পূর্বেই সেও গিয়ে জলে নামে। জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের প্রবল টানে শিশু মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেল, তাকে কিছুতেই আর উদ্ধার করা সম্ভব হল না। পটাচারা নিতান্ত অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সে-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। কিছুই করে উঠতে পারলেন না তিনি। এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এল তাঁর সদ্যজাত শিশুর আর্ত কান্নার স্বর। পিছনে তাকিয়ে দেখেন বনের মধ্য থেকে এক শৃগাল এসে তার সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। একটির পর একটি নির্মম শোকের আঘাতে পটাচারা একেবারে জ্ঞানহারা নির্বাক হয়ে গেলেন। তার অঙ্গ থেকে বসনখানি কখন খসে পড়ে গেছে সে খেয়ালটুকু

পর্যন্ত তাঁর নেই। সেই অবস্থায় পথ চলতে চলতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন পিতৃগৃহের দরজার সম্মুখে। পিতৃগৃহের দরজা খোলা অবস্থাতেই ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন তার বিশাল পিতৃগৃহ একেবারে শূন্য। নিকটে কেউ কোথাও নেই। তারপর দূরে মাঠের মধ্যে দেখতে পেলেন সেখানে দাউ দাউ করে চিতাগ্নি জ্বলছে। সেই চিতাগ্নি লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতা মাতাকে সেখানে একসঙ্গে দাহ করা হচ্ছে। এবার পটাচারার শেষ অবলম্বনটুকু বলতেও আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পটাচারা পুনরায় ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকেন। সেই অবস্থায় ক্রমে নগর ছাড়িয়ে জেতবন আশ্রমের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময় আশ্রমে সান্ধ্য ধর্মসভার অধিবেশন চলছে। পটাচারা ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তার দর্শনে উপস্থিত ভক্তগণের অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। কেউ আবার বিরক্তি প্রকাশ করে হস্ত উত্তোলন করে ইঙ্গিতে তাকে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে নির্দেশ দেন। সে সময় বুদ্ধ একবার পটাচারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে ভগ্নী বলে সম্বোধন করলেন, সভাস্থ সকল লোকের দৃষ্টি তখন পটাচারার প্রতি আকৃষ্ট হল। বুদ্ধের সস্নেহ সম্ভাষণে পটাচারা পুনরায় যেন সম্বিত ফিরে পেলেন, এবং তখন নিজের অবস্থায় নিজেই দারুণভাবে লজ্জিত হলেন। এ সময় সভার একপ্রান্ত থেকে একখানি উত্তরীয় এসে পড়ল তাঁর দেহের উপর। সেই উত্তরীয়খানি দিয়ে তিনি লজ্জা নিবারণ করলেন। এরপর তিনি বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। বুদ্ধ তাকে সুললিত গাথার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে বলেন, এই পৃথিবীতে, পিতামাতা, ভাই, বন্ধু কেউই মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ পেতে সমর্থ নয়। আপনজন বলতেও কেউই নেই। সজ্জন ব্যক্তিগণই কেবল একথা জেনে নিজ নিজ মুক্তির চেষ্টায় পথে অগ্রসর হয়ে থাকেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শোনার পর পটাচারার শোকের উপশম হয়। বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করেন। যে পটাচারা প্রথম জীবনে অত্যন্ত একগুঁয়ে বলে পরিচিত ছিলেন সেই পটাচারা পরবর্তী জীবনে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরা-রূপে সম্মানিতা হয়েছিলেন। নিজের জীবনে তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, বিনয়ই হল নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কোন প্রকার জেদের বশবর্তী হওয়া মোটেই নারীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। জেদের বশবর্তী নারী পরিণামে তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে।

শ্রাবস্তীর এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে কিসা গোতমী। কিন্তু তার বিয়ে হয়েছিল অবস্থাপন্ন ঘরে। সাধারণ ঘরের মেয়ে বলে শ্বশুরালয়ের কেউই তাকে সমাদর করত না এবং সম্মান দেখাতো না। স্বামীর নিকটও সে ছিল নিতান্ত অবহেলার পাত্রী। এই অবস্থার জন্য সে কেবল নিজের অদৃষ্টকেই

দায়ী করতো। অপর কাউকেই সে দোষ দিত না। যথাসময়ে কিসা গোতমীর কোল জুড়ে এক সোনার চাঁদ ছেলের আগমন হল। সেই ছেলে শুধু কিসা গোতমীরই নয়, তার শ্বশুরালয়ের সকলেরই নয়নের মণি হয়ে দাঁড়াল। ছেলেকে কোলে নিয়ে ভবিষ্যতের সুখের নীড় রচনা করতে থাকে কিসা গোতমী। ক্রমে ছেলেটি কৈশোরে পদার্পণ করল। এবার তার নিকট এক নতুন সমস্যা এসে দেখা দিল। বিদ্যালাভের জন্য এবার ছেলেকে পাঠাতে হবে সুদূর তক্ষশীলায়। একমাত্র সন্তানকে অত দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে কি নিয়ে থাকবে সে? ভাবতে গিয়ে কোন কূল কিনারা পায় না কিসা গোতমী। শেষে সাব্যস্ত করা হল যে, ছেলেকে অত দূরদেশে পাঠানো চলবে না, বাড়ীতে সে গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করবে। এ প্রস্তাবে সকলেই খুশী হলেন।

বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ, হঠাৎ একদিন ছেলের ভয়ানক জ্বর হল। বাড়ীর লোকজন সকলেই মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বৈদ্য এলো, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা যথারীতি সবকিছুই করা হল। কিন্তু ছেলের জ্বরের উপশম কিছুতেই হল না। অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। সকলের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল প্রতিপন্ন করে দিয়ে পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেটির মৃত্যু হল। এই নির্মম আঘাত সহ্য করতে না পেরে কিসা গোতমী পাগলিনী হয়ে গেলেন। মৃত ছেলেকে কাঁধে নিয়ে তিনি প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, যদি তার ছেলেকে কেউ বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, সেই আশায়। পথে যাকেই দেখতে পেলেন তাকেই বলতে লাগলেন আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও। বুদ্ধের একজন শিষ্য সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কিসা গোতমী তাঁকেই বললেন, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও। তখন সে ব্যক্তি সস্নেহ বচনে কিসা গোতমীকে বললেন, তুমি ভগবান বুদ্ধের নিকটে যাও। একমাত্র তিনিই তোমার দুঃখ দূর করতে পারবেন। শ্রাবস্তীর নিকটেই জেতবন বিহারে আছেন তিনি। কিসা গোতমী মৃত ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে ছুটে চলে এলেন জেতবন বিহারে। ভিক্ষুগণকে শুধালেন, কোথায় আছেন ভগবান বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ অভাগিনী কিসা গোতমীর অবস্থা দেখে সেদিন চোখের জল সম্বরণ করতে পারেন নি। অদূরেই দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন বুদ্ধ। কিসা গোতমীকে সস্নেহ বচনে তিনিই আহ্বান জানিয়ে বললেন, এদিকে এস। সেই উদাত্ত আহ্বানে পাগলিনী কিসা গোতমী ছুটে গিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লেন বুদ্ধের পদযুগলের সম্মুখে। মৃত ছেলেটিকে তাঁর পদপ্রান্তে শুইয়ে রেখে, চিৎকার করে কেঁদে বললেন, প্রভো আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন। বুদ্ধ পুনরায় তাকে সস্নেহ বচনে ভগিনী সম্বোধন করে বললেন, যাও বোন তুমি কেবল একমুঠো সরষে নিয়ে এস এমন বাড়ী থেকে, যে বাড়ীর কারুর কখনও মৃত্যু ঘটেনি। বুদ্ধের বচনে আশায় উৎফুল্ল হয়ে সে তক্ষুণি ছুটে চলে গেল শ্রাবস্তী নগরে এবং লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে সরষে ভিক্ষা করে ঘুরতে

লাগল। কিন্তু এমন বাড়ীর সন্ধান সে পেল না, যে বাড়ীর কারুর কখনও মৃত্যু ঘটেনি। তখন তাঁর চৈতন্যোদয় হল। শূন্য হস্তে শ্রান্ত, ক্লান্ত অবস্থায় সে তখন পুনরায় ফিরে এল জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকটে। এবার মৃত পুত্রকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বুদ্ধের শরণ নিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষুণী সংঘে স্থান দিলেন। বুদ্ধের কৃপায় কিসা গৌতমী সত্যের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। জন্মালে মরতে হবেই, এর অন্যথা নেই। আবার মৃত্যু কখন আসবে তারও স্থিরতা নেই। অমৃতের সন্ধান লাভ করাই হল জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অমৃতের সন্ধান না পেয়ে শত বৎসর বেঁচে থেকেও কোন লাভ নেই।

ভিক্ষুগণসহ প্রত্যহ বুদ্ধ শ্রাবস্তীর পথে বেরোতেন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে। ভিক্ষুগণের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখেই তাঁরা ভিক্ষাপাত্র হস্তে গিয়ে দাঁড়াতেন। গৃহস্থগণের সকলেই যে ভিক্ষান্ন দান করতেন, এমন নয়। এমন অনেক লোকই ছিল যারা ভিক্ষা দান করা তো দূরের কথা, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের নামও পর্যন্ত শুনতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও বিনয়ের অংশ হিসেবে তাঁরা সকলের দ্বারেই গিয়ে উপস্থিত হতেন। রাজা প্রসেনজিতের এক পুরোহিত ছিলেন, তাঁর নাম তোদেয়। বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী তুদিত গ্রামখানি ছিল তাঁর ভূ-সম্পত্তির অন্তর্গত। তুদিত গ্রামের অধিপতি হিসেবেই লোকমুখে তার নাম দাঁড়িয়েছিল তোদেয়। তার আসল নাম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সেই ব্রাহ্মণ যেমন ছিলেন কৃপণ, তেমনি তাঁর স্বভাবখানিও ছিল অত্যন্ত কোপন। তাঁর বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে কোন ভিক্ষু গিয়ে উপস্থিত হলে, তিনি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে কখনও ইতস্ততঃ করতেন না। একটি কপর্দকও তিনি কখনও কাউকে দান করতেন না। ভিক্ষুর শীল অনুযায়ী ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে বুদ্ধ প্রায়ই উপস্থিত হতেন তোদেয়র বাড়ীর দরজার সম্মুখে এবং প্রতিবারই তোদেয়র নিকট থেকে ভিক্ষান্নের পরিবর্তে কটুবাক্য শুনে তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হ'ত। অর্থ ও সম্পদের প্রতি তাঁর এত মোহ ও আকর্ষণ ছিল, একমুষ্ঠি ভিক্ষান্ন কখনও কাউকে দিতে পারতেন না। কালের কুটিল নির্দেশে সেই তোদেয়কে তার বিশাল সম্পত্তির সব কিছুই ফেলে রেখে পরলোকে যাত্রা করতে হল। তোদেয়র পুত্র শুভ ছিলেন পিতার ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ। দান ধ্যান করতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর শুভ মহাসমারোহে পিতৃকার্য সম্পন্ন করেন এবং সেই উপলক্ষে প্রচুর দান দক্ষিণা বাবদ ব্যয় করেন। এর কিছুদিন বাদে শুভ তাঁর বাড়ীর নিকটে একটি কুকুরছানাকে দেখতে পেয়ে মমতাবশতঃ তাকে আদর করে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কুকুর ছানাটি দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠল। শুভ যতক্ষণ বাড়ী থাকতেন, ততক্ষণ কুকুরটি

তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। এর ফলে কুকুরটির প্রতি শুভর একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। একদিন শুভ বাড়ী ছিলেন না, সে সময়ে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বুদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে। বুদ্ধকে দেখতে পেয়েই কুকুরটি ভীষণভাবে গর্জন করে উঠে একেবারে তেড়ে এলো। বুদ্ধ তখন সহাস্য বদনে কুকুরটিকে বললেন, যখন তুমি এ বাড়ীর কর্তা ছিলে, তখন সর্বদাই আমাকে তুমি তাড়িয়েছ, এবারে কুকুর হয়ে এসেও আবার তুমি আমাকে তাড়াতে এসেছ? বুদ্ধের মুখ থেকে এই কটি কথা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে কুকুরটি হঠাৎ যেন কি রকম হয়ে গেল। সে তখন ধীরে ধীরে বাড়ীর এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লো। নড়াচড়া করবার মত শক্তিটুকুও যেন তার আর নেই। শুভ বাড়ী ফিরে এসে তার প্রিয় কুকুরটিকে সে অবস্থায় দেখে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনলেন। এর পর বুদ্ধের উপর শুভ ভয়ানক চটে গেলেন। তাঁর পিতা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে চলে গিয়েছেন, আর সেই সন্ন্যাসীটা বলে কিনা তিনি আবার কুকুর হয়ে ফিরে এসেছেন? বুদ্ধকে যথাসম্ভব গালমন্দ দেবার জন্যে শুভ তৈরী হয়ে পুনরায় বাড়ী থেকে বেরোলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন জেতবনে। তখন মধ্যাহ্নকাল। বুদ্ধ সে সময়ে গন্ধ কুঠীতে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। শুভ গন্ধ কুঠীর দিকে এগিয়ে গেলেন। শুভকে আসতে দেখে, দূর থেকেই বুদ্ধ তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, তোমার পিতা স্বর্ণ দ্বারা যে সকল তৈজসপত্র নির্মাণ করিয়েছিলেন, তুমি সেগুলো পেয়েছ কি? বুদ্ধের কথায় শুভর সমস্ত ক্রোধ মুহূর্তে একেবারে জল হয়ে গেল। বুদ্ধের কথার উত্তরে সে তখন নিতান্ত অভিভূতের মত আড়ষ্টভাবে বলে উঠলো, 'না প্রভু'। বুদ্ধ তখন পুনরায় তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তবে যাও ওই কুকুরটাকে গিয়ে বল, সে সমস্ত কিছুর সন্ধান তোমাকে দেবার জন্যে। বুদ্ধের কথা শুনে যতশীঘ্র সম্ভব শুভ সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এল। বাড়ী এসে দেখে কুকুরটা তখনও সেই অবস্থাতেই নিতান্ত নির্জীবের মত শুয়ে আছে। শুভ তখন গিয়ে কুকুরটিকে আদর করে বলল, বাবা আমার জিনিসপত্রগুলো এবার আমায় দিয়ে দাও। শুভর কথা শুনে কুকুরটি খানিকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজা পেরিয়ে নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কুকুরটি ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বহুকালের পুরাণো একটি বটবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখল, নিকটে অপর কেউ আছে কিনা। তারপর সম্মুখের দুটি পা দিয়ে, এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে লাগল। এবার ইঙ্গিত পেয়ে শুভ সেখানকার মাটি খুঁড়ে তার পিতার লুক্কায়িত সমস্ত তৈজসপত্রাদি পেয়ে গেলেন।

শুভ তার পৈতৃক সম্পদ সবকিছুই ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু মনে শান্তি

পেলেন না। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে জীবের অদ্ভুত পরিণতির কথা। যতই ভাবেন, ততই তাঁর মন আরও অশান্তিতে ভরে ওঠে। কিছুতেই শান্তি পেলেন না তিনি। অবশেষে জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকটে পুনরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি। জীবজগতের আসা-যাওয়া এবং সেই সঙ্গে জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বুদ্ধকে। উত্তরে বুদ্ধ জানালেন, প্রত্যেক মানুষের জন্যে মৃত্যুর পরপারে অপেক্ষা করে রয়েছে, তার জীবনে কৃতকার্যের ফল। যাকে কর্মফল বলা হয়। সেই কর্ম-ফলই তাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুনর্জন্মের দিকে। কর্মের ফল অনুসারেই তার পুনর্জন্ম হবে। মানুষের মধ্যে যারা হিংস্র প্রকৃতির এবং গুপ্ত হত্যাকারী অথবা প্রাণী হত্যা করে তাতে আনন্দ লাভ করে, মৃত্যুর পর কর্মের ফল অনুসারে তারা নরকে গমন করে, এবং অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়। আর যদি সে পরজন্মে মনুষ্য কুলে জন্মগ্রহণও করে, তবে তার নিতান্ত অল্প আয়ু হয়। প্রাণী হত্যাকারী অল্প আয়ু হয়ে জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রাণী হত্যা করে না অথবা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অপরাধ-মূলক কোন কর্মে লিপ্ত হয় না, মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি সুখ ভোগ করে। আর যদি সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করে। হিংসা ত্যাগ করে, জীবের মঙ্গল কামনায় যে নিযুক্ত থাকে, সে দীর্ঘায়ু হয়। যদি কেউ পরপীড়ন করে, তাতে আনন্দ লাভ করে। তবে পরজন্মে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলে চিররুগ্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি পরপীড়ন থেকে বিরত থাকে এবং কখনও কারুর মনে আঘাত দেয় না, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে যদি পুনরায় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যে ব্যক্তি সামান্য কারণে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সর্বদাই অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, অথবা সর্বদাই অপরের ভুল ত্রুটির দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকগামী হয়ে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যদি সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে নিতান্ত কুৎসিত এবং শ্রীহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত জীবন সে অপরের উপহাসের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকে। ক্রোধ প্রবণতা শ্রীহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর শান্ত স্বভাব ব্যক্তি প্রিয়দর্শন হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং সকলেরই বিশ্বাসভাজন এবং প্রিয়পাত্র হয়ে সুখে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। আর যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরায়ণ এবং পরশ্রীকাতর হয়, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যদি সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে পঙ্গু অথবা অক্ষম হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরশ্রীকাতরতা অক্ষমতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ঈর্ষাহীন ও উদারচেতা হন, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে থাকেন। আর যদি তিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি সুস্থ এবং ক্ষমতাবান হন। ঈর্ষাহীনতা ক্ষমতা লাভের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও দান ধ্যান

করে না, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যদি সে মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কৃপণতা অথবা দানে কুণ্ঠিত হবার পরিণতি বিত্তহীনতা। দানশীল ব্যক্তি মৃত্যুর পর অনন্ত সুখভোগ করেন। আর যদি তিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি বিত্তশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতা বিত্তশালী হবার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি দাম্ভিক ও অহংকারী এবং যে গুরুজনকে সম্মান দেয় না, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকগামী হয় এবং অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। আর যদি সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে তার জন্ম হয় নীচকুলে। দাম্ভিকতা এবং অহংকার সর্বদাই নীচতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। নিরহংকারী এবং দম্ভহীন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ ভোগ করে। আর যদি সে মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করে। নিরহংকারিতা এবং দম্ভহীনতা উচ্চতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের বিচার করে না অথবা পাপ-পুণ্য সম্পর্কে অবগত হতে কোন চেষ্টা করে না, সাধু-সজ্জনের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের স্পৃহাও যার নেই, সে ইহজন্মে যেমন নির্বোধ হয়ে জীবন কাটায় পরজন্মেও সে তেমন নির্বোধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হয় এবং যিনি জ্ঞানার্জনের জন্যে সাধু-সন্ন্যাসী অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে যথাযথ উপদেশ গ্রহণ করে নিজের মানসিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হন, তিনি পরজন্মে মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মহাজ্ঞান লাভের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই অল্প কটি কথার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধ কর্মচক্রের জটিল আবর্ত্তনের বিচিত্র কাহিনী শুভ'র নিকট বর্ণনা করেন। বুদ্ধের মুখ থেকে একথা শোনার পর শুভ ভাবাপ্লুত হৃদয়ে বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, পরে পিতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানান। বুদ্ধ শুভ'র প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন হলেন।

বুদ্ধ একদিন ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রাবস্তীর নগরবাসীগণের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে ফিরছিলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন ভরদ্বাজের গৃহের সম্মুখে। ভরদ্বাজ ছিলেন শ্রাবস্তীর একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ যাগযজ্ঞ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। অব্রাহ্মণ বিশেষ করে মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুগণের প্রতি তাঁর অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। কোন ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাঁর দরজার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি অবজ্ঞাভরে কটুবাক্য প্রয়োগ করে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন। বুদ্ধ যখন ভরদ্বাজের দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, সে সময়ে ভরদ্বাজ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিলেন। বুদ্ধ নিঃসংকোচিত্তে একেবারে ভরদ্বাজের যজ্ঞাগ্নির নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। একে ত ভরদ্বাজ মুণ্ডিত [illegible] ভিক্ষুগণকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তার উপর

এই ভিক্ষুকে একেবারে যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হতে দেখে তিনি ক্রোধে একেবারে গর্জন করে উঠলেন এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় কটূক্তি বর্ষণ করতে গিয়ে তাকে "বৃষল" বলে উঠলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের সেই রূঢ় সম্ভাষণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। ব্রাহ্মণের মুখের পানে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শান্ত-স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৃষল' কাকে বলে জানেন কি? বুদ্ধের শান্ত বচন শুনে ব্রাহ্মণ একেবারে হতচকিত হয়ে গেলেন। মুহূর্তে তাঁর সমস্ত ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনিও তখন তেমনি শান্তস্বরেই উত্তরে জানালেন, 'না'। বুদ্ধ তখন বলতে আরম্ভ করলেন, যে ব্যক্তি অযথা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার বিস্মৃত হয়, প্রকৃত গুণীজনের সমাদর করতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাকেই বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে অথবা পরদ্রব্য অপহরণ করে, তাকে বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা ফেরৎ দেয় না অথবা সামান্য অর্থের লোভে কুকাজে রত হয়, তাকে বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি কর্তব্য পালন করে না এবং তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাকে বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি কিছুই দান করে না, শ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভিক্ষাদানের বদলে কটূক্তি বর্ষণ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়, তাকে বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি ব্যভিচারে নিজেকে লিপ্ত রাখে তাকে বৃষল বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজে সিদ্ধ পুরুষ না হয়েও অপরের নিকট নিজেকে সিদ্ধ পুরুষ বলে প্রচার করে অযথা প্রশংসা অর্জনের চেষ্টা করে সে, ব্যক্তি হল নিকৃষ্টতম বৃষল।

বুদ্ধের কথায় বিশেষ করে তাঁর শেষের কথাগুলো শুনে ব্রাহ্মণ একেবারে হতচকিত হয়ে গেলেন। বুদ্ধ পুনরায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, কর্মই মানুষকে বৃষল করে দেয়, জন্ম নয়। নীচ কুলে জন্মলাভ করেও কেউ যদি সৎকর্ম করে, তবে সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে সে অধঃপতিত হয়। বংশ মর্যাদা তাকে অধঃপতনের হাত থেকে কখনই রক্ষা করতে পারে না। ইহকালেও তাকে দণ্ডভোগ করতে হয় এবং পরকালেও তাই। কর্মই মানুষকে বৃষল করে তোলে, আবার কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণত্ব এনে দেয়।

বুদ্ধের বাণী শুনে ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের মন থেকে সকল অহঙ্কার সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সত্যের আলোকে উদ্ভাষিত হয়ে উঠলো তাঁর অন্তঃকরণ। এতদিনে সত্যি সত্যিই তাঁর যাগযজ্ঞের ফল লাভ হল। মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণের প্রতি তাঁর ক্রোধের পরিবর্তে, তাঁর সমগ্র হৃদয় আপ্লুত করে দেখা দিল প্রবল ভক্তির জোয়ার। সেখানেই বেদীর সম্মুখেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন বুদ্ধের পদপ্রান্তে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন, ত্রিশরণ।

শ্রাবস্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার প্রকৃত নাম কি ছিল জানা

যায় না। 'উদক শুদ্ধিক' নামেই ছিল তাঁর পরিচয়। প্রত্যহ দু'বার তিনি নদীর জলে অবগাহন করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এভাবে প্রত্যহ দুবার অবগাহনের দ্বারা তাঁর দৈনন্দিন পাপকর্ম যদি কিছু থাকে, তবে সে সমস্তই দূর হয়ে যাবে। বুদ্ধ একদিন নিতান্ত অযাচিতভাবেই তাঁর ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং বুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আগমনে ব্রাহ্মণ প্রথমটায় বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। পরে স্বয়ং বুদ্ধকে তাঁর নিজ ভবনে পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। ব্রাহ্মণ সত্যিই নিতান্ত সাধাসিধে ধরনের লোক ছিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সত্যিই দিনে দুবার অবগাহন কর? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, রাত্রিতে যদি কোন পাপকর্ম করা হয়, তবে সে কলুষ প্রাতঃকালীন অবগাহনের দ্বারা দূর হয়। আর দিবা ভাগে যদি কোন পাপ কর্ম করা হয় তবে সেই কলুষ বৈকালিক অবগাহনের দ্বারা দূর হয়। বুদ্ধ এবার ব্রাহ্মণকে বললেন, তুমি যেভাবে নিজেকে কলুষ থেকে মুক্ত করতে চাইছ, কলুষ থেকে সেভাবে মুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। মনের কলুষ কেবল মাত্র অবগাহনের দ্বারা দূর হয় না। সর্বদা ধর্ম পথে থেকে চিত্তকে শুদ্ধ রাখতে হবে এবং মনকে নির্মল রাখতে হবে। সেজন্য প্রত্যেককেই যত্নের সঙ্গে শীল রক্ষা করে চলতে হবে। বুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। তখন তিনি প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন। এরপর তিনি বুদ্ধের পদযুগল আশ্রয় করে তাঁর শরণ কামনা করে, ত্রিশরণ উচ্চারণ করলেন।

শ্রাবস্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল মানস্ফীত। এরও প্রকৃত নাম জানতে পারা যায় না। তিনি ছিলেন সত্যি সত্যিই মানস্ফীত। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, এবং তা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। কোন গুরুজন ব্যক্তিকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, নিজের পিতামাতাকে পর্যন্ত তিনি কখনও সম্মান দেখাতেন না। এত দূর ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। লোকদত্ত তাঁর এই নামটি সার্থক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সর্বদাই তিনি অহঙ্কারে একেবারে স্ফীত হয়ে থাকতেন। একদিন মানস্ফীত জেতবন ধর্মসভার নিকটস্থ পথ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে দেখতে পেলেন সেখানে অগণিত নরনারী। সবাই নীরবে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট থেকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বুদ্ধের বাণী শ্রবণ ও গ্রহণ করছেন। সেই বিশাল জনতার সম্মুখে বুদ্ধকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে দেখে তাঁর অন্তরে কৌতূহল দেখা দিল। সেই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তিনি ধীরে ধীরে ধর্মসভায় প্রবেশ করে এক পাশে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর ভাবখানা এই যে, যদি বুদ্ধ নিজে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তবেই তিনি বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলবেন। নচেৎ নয়। সভা ভঙ্গ হল, কিন্তু বুদ্ধ নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে এলেন না। বুদ্ধ গন্ধকুঠীর দিকে যখন অগ্রসর হতে যাবেন এমন সময়ে বুদ্ধের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনতে পেলেন মানস্ফীত। বুদ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন,

হে ব্রাহ্মণ, মান অহঙ্কার কারও পক্ষেই শোভনীয় বস্তু নয়। যেজন্য তুমি এখানে এসেছ, কেবলমাত্র সেইটুকুই যদি তুমি গ্রহণ করতে পার, তবে তুমি কৃতার্থ হবে। সুতরাং সর্বাগ্রে তোমার সে প্রচেষ্টা করা উচিৎ। বুদ্ধের কথা কটি শোনামাত্র ব্রাহ্মণ যেন কেমন হয়ে গেলেন। মুহূর্তে তাঁর মন থেকে মান অহঙ্কার প্রভৃতি সবকিছু দূর হয়ে গেল। তার পর বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করে তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। সভাস্থ সকলেই সেই অদ্ভুত দৃশ্য সেদিন নীরবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর মান এবং স্ফীতি উভয়ই দূর হয়ে গিয়ে তিনি হলেন বুদ্ধের একজন উপাসক।

দৈনন্দিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করাই ছিল ভিক্ষুগণের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। বুদ্ধ নিজেও প্রত্যহ ভিক্ষুগণের সঙ্গে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বেরোতেন। শ্রাবস্তীর এক পল্লীতে ছিল ব্রাহ্মণ উদয়ের বাস। যজন যাজনের দ্বারা তিনি যা সংগ্রহ করতে পারতেন, তাই দিয়ে তার ক্ষুদ্র সংসারখানি বেশ ভালভাবেই চলে যেত। ভিক্ষাপাত্র হস্তে বুদ্ধ তার দ্বারে এসে উপস্থিত হলে তিনি বুদ্ধের পাত্রখানিকে পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা দান করতেন। পর পর বুদ্ধ কয়েকদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন উদয়ের গৃহে। প্রতিবারই তিনি পরিপূর্ণ করে দিলেন বুদ্ধের পাত্রখানিকে ভিক্ষান্ন দ্বারা। শেষে একদিন তিনি বুদ্ধকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আমার এইখানেই কেবল আপনি বার বার আসেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে বুদ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, মেঘ বার বার বারিবর্ষণ করে ধরণীতলকে সিক্ত করে, কৃষক বার বার বীজ বুনে এই ধরণীতে করে শস্যোৎপাদন। বার বার খাদ্য শস্যে ভরে ওঠে এই দেশ। গাভী বার বার দুগ্ধ দান করে। প্রার্থীগণ চলে যান বার বার দাতার নিকট। দাতা বার বার তাঁদের দান করেন এবং স্বর্গসুখের অধিকারী হন। সে রকম বার বার চলে জন্ম-মৃত্যুর লীলা। বার বার মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বার বার মানুষ নীত হয় শ্মশানে। একমাত্র যাঁরা অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরাই কেবল বার বার জন্মগ্রহণ করেন না। বুদ্ধের বচন শুনে ব্রাহ্মণ অন্তঃদৃষ্টি লাভ করলেন এবং তাঁর চরণ আশ্রয় করে তাঁর শরণ কামনা করলেন।

শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা সংসারে বীতরাগ হয়ে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন। যথারীতি তিনি ভিক্ষুণী ব্রত পালন করে চলছেন। একদিন জেতবনের ধর্মসভায় বুদ্ধ এসে সবেমাত্র আসন গ্রহণ করেছেন এমন সময়ে সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধকে দেখে উচ্চৈস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করেন। কিছুতেই তাঁকে শান্ত করতে পারা গেল না। অবশেষে ভিক্ষুণী বুদ্ধের পদযুগলের নিকট একেবারে আছড়ে পড়ে তাঁর পদযুগল ধারণ করে পুনঃ পুনঃ তাঁর নিকট কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তখন কয়েকজন ভিক্ষুণী এসে সেই ভিক্ষুণীকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষুণীর হঠাৎ এই অদ্ভুত

আচরণে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়ে এর কারণ জানবার জন্যে বুদ্ধের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। বুদ্ধ তখন সকলকে উদ্দেশ করে ধীরে ধীরে বললেন, এই ভিক্ষুণী পূর্ব জন্মে একবার তাঁর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত আচরণ করে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। সেই পূর্ব-জন্ম বৃত্তান্ত এখন তাঁর মনে পুনরায় উদিত হওয়াতে তিনি আত্মসম্বরণ করে নিজেকে স্থির রাখতে সমর্থ হননি, তাই এভাবে আত্মহারার ন্যায় রোদন করছেন। এই বলে বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত উপস্থিত সকলের নিকট ব্যক্ত করেন। সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত ষড়দন্ত জাতক কাহিনী (৫১৪) নামে পরিচিত হয়ে আছে। অজন্তার গুহায় এই জাতক কাহিনীটি অবলম্বনে একাধিক চিত্র রচিত রয়েছে। সেই ভিক্ষুণী পরবর্ত্তীকালে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

শ্রাবস্তী নগরের এক অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা উৎপলবর্ণা। তিনি ছিলেন অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী। তাঁর রূপের খ্যাতি সেকালে শ্রাবস্তী নগরে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ধনবান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় এমন কি কয়েকজন নৃপতিও উৎপলবর্ণাকে বিবাহ করবার জন্য তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এর ফলে উৎপলবর্ণার পিতা পড়েছিলেন মহাসমস্যায়। উৎপলবর্ণার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তাঁর মাতুল পুত্র নন্দও ছিল একজন। এমন কন্যার বিবাহ দিলে শেষে অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এই আশঙ্কায় পিতা কন্যাকে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করবার জন্যে পরামর্শ দেন। উৎপলবর্ণা অল্প বয়স থেকেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। পিতার এই প্রস্তাবে তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং নিজের চেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ব অর্জন করতে সমর্থ হন। তিনি প্রায়ই শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী একটি নির্জন বনে গুহার মধ্যে একাকী ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন তাঁর মাতুল পুত্র নন্দ তাঁর এই নির্জনবাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর শীল নষ্ট করে। সেই পাপের ফলে মেদিনী বিদীর্ণ হয়ে নন্দকে গ্রাস করে। পরবর্তী জীবনে নৃপতি বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী সংঘের অগ্রসাধিকার পদ লাভ করেছিলেন।

জেতবনের ধর্মসভায় ভিক্ষু ও ভক্তগণ ব্যতীত প্রতিদিনই নূতন নূতন লোকের সমাগম হতে থাকে। নবাগতদের বেশীর ভাগই বুদ্ধের ধর্ম উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই আবার সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন। শ্রাবস্তীর এক ধনী ব্রাহ্মণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রথমে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং উপাসক শ্রেণীভুক্ত হন। পরে তিনি অনুভব করলেন যে সংসারে থেকে ঠিকমত ধর্মপথে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তিনি সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করেন। জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার সংসার ত্যাগে তাঁর অনুজ বুদ্ধের উপর বিষম রুষ্ট হলেন। তিনি বুদ্ধকে গালমন্দ দেবার জন্যে জেতবনে ছুটে এলেন এবং বুদ্ধকে লক্ষ্য করে নানা প্রকার অসংযত কটুবাক্য উচ্চারণ করতে থাকেন। বুদ্ধ কিন্তু তাঁর অসংযত আচরণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, অথবা কোন উত্তর দান পর্যন্ত প্রয়োজনবোধ করলেন না। বুদ্ধের সেই নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করে সেই ব্রাহ্মণের ক্রোধ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলে বুদ্ধ তখন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে এবং মধুর বচনে বলতে আরম্ভ করেন, আচ্ছা বলুন তো আপনার গৃহে কোন বিশিষ্ট অতিথিবর্গের আগমন হলে আপনি তাদের জন্যে সুরচিত ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করেন কি? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, হাঁ। তখন বুদ্ধ আবার বললেন, যদি আপনার সেই অতিথিবর্গ সে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যের কিছুই গ্রহণ না করেন, তবে সেগুলো কার হয়? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, সেগুলো তবে আমারই থেকে যাবে। এবার বুদ্ধ আবার বললেন, আপনি আমায় লক্ষ্য করে যেসব কটুবাক্য উচ্চারণ করেছেন, তার কোনটিই আমি গ্রহণ করি নি, সুতরাং সেগুলো আপনারই যথার্থ প্রাপ্য হল। ক্রোধী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করাটা চরম মূর্খতা। তাতে তার নিজেরই অকল্যাণ সাধিত হয়। ক্রোধী ব্যক্তির ক্রোধের সম্মুখে যিনি শান্তভাবে অবিচল থাকেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন, এবং এভাবেই নিজের এবং অপরের হিতসাধনে সক্ষম হন। একমাত্র ধর্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণই তাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করতে পারেন না। বুদ্ধের কথায় ব্রাহ্মণের অন্তঃদৃষ্টি লাভ হল। তিনি তখন বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন এবং অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই ব্রাহ্মণ অর্হত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বুদ্ধ একবার বৈশালী থেকে জেতবনে এসেছিলেন, সেখানে ষষ্ঠ বর্ষা যাপন করবার জন্যে। বুদ্ধ জেতবনে আসার অনেক দিন পরেও সেখানে বৃষ্টির কোন নামগন্ধও ছিল না। প্রচণ্ড খরায় তড়াগ প্রভৃতি জলশূন্য হয়ে শুষ্ক হয়ে যায়। দেশে ভয়ানক জলকষ্ট দেখা দেয়। কৃষকেরা বৃষ্টির অভাবে খাদ্য-শস্য বপন করতে পারছিলেন না। সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবারও উপক্রম হয়ে উঠেছিল। জেতবনের পিছন দিকে একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। তার শোভা ছিল অত্যন্ত মনোরম। জলের অভাবে সেই পুষ্করিণীর শোভা লুপ্ত হয়েছে। সেখানে তখন কর্দম ছাড়া জলের চিহ্নমাত্রও ছিল না। মৎস্য ও কূর্মগণ কর্দমের তলায় আত্মগোপন করতে গিয়ে বিফল হচ্ছে। মাংসাশী পাখীগণ সমানে তাদের সংহার করে তাদের মাংসে উদর পূর্তি করে চলেছে। প্রাতঃকালে পুষ্করিণীর নিকটে পায়চারী করতে করতে বুদ্ধ জলজ প্রাণীগণের এ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং সেদিনই জলজ প্রাণীগণের দুর্দশা মোচন করবেন বলে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন। পরে যথা সময়ে ভিক্ষুগণের সঙ্গে ভিক্ষায়

সংগ্রহের জন্যে নগরে চলে গেলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে পুনরায় জেতবনে ফিরে এসে তিনি যথারীতি দ্বিপ্রাহরিক কাজকর্ম সমাধান করে নিলেন। তারপর এসে উপস্থিত হলেন পুষ্করিণীর পাড়ে। তখন বেলা অপরাহ্ন গড়িয়ে গিয়েছে। পুষ্করিণীর সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে তিনি আনন্দকে বললেন, তাঁর স্নান বস্ত্রখানি সেখানে নিয়ে আসার জন্যে। বুদ্ধের কথায় আনন্দ রীতিমত বিস্মিত হলেন। তিনি তখন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, জল কোথায় যে আপনি স্নান করবেন? বুদ্ধ তখন আনন্দকে মৃদুহাস্যে জানালেন যে, এখুনি মুসল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পুষ্করিণীটি জলে ভরে উঠবে। বুদ্ধের কথা শেষ হবার অল্প পরেই সমস্ত আকাশ ঘন কালো মেঘে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলধারায় বর্ষণও শুরু হয়ে গেল। প্রবল বর্ষণের ফলে সেই শুষ্ক পুষ্করিণীটি অল্প সময়ের মধ্যেই জলে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বুদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন জল ক্রমে সে পর্যন্ত এসে গেল। স্নান সেরে বুদ্ধ সভায় এসে আসন গ্রহণ করে ভক্তগণকে বলেন, শুধু এবারেই নয়, ইতিপূর্বেও তিনি বারি বর্ষণ করিয়ে জলজ প্রাণীগণকে রক্ষা করেছিলেন। এই বলে তিনি তাঁর সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বলতে থাকেন। তাঁর সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত মৎস্য জাতক (৭৫) কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

জেতবনে বর্ষাকালটা কাটিয়ে বুদ্ধ সদলবলে চলে আসেন রাজগৃহে। রাজগৃহে এসে তিনি বেণুকুঞ্জের আশ্রমে সশিষ্য অবস্থিতি করতে থাকেন। এবার রাজগৃহে আসার পর থেকে তাঁর শিষ্য সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যেতে থাকে। পূর্বে যাঁরা তির্থীকগণের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস-জীবন-যাপন করছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসে বুদ্ধের নিকট থেকে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত হতে থাকেন। এ ব্যাপারে তির্থীকগণ বুদ্ধের উপর ভয়ানকভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তখন থেকে তাঁরা বুদ্ধের একেবারে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন এবং সর্বপ্রকারে বুদ্ধের অনিষ্টসাধনে তৎপর হলেন।

রাজা বিম্বিসারের অপর এক পত্নী ছিলেন। তাঁর নাম ক্ষেমা। তিনি ছিলেন রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁর রূপের খ্যাতি সেকালে এ অঞ্চলে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। রাণী ক্ষেমা নিজেও ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে রূপগর্বিতা। সেজন্য তিনি রাজপুরীর সকলের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতেন না। রাজা বিম্বিসারের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পত্নী ক্ষেমাকে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত করিয়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করাবার জন্যে। কিন্তু ক্ষেমা এতদূর রূপগর্বিতা এবং অহঙ্কারী ছিলেন যে, তাঁকে কিছুতেই একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকটে এনে উপস্থিত করা রাজার পক্ষে এতদিন সম্ভব হয়নি। এবার বুদ্ধের রাজগৃহে আগমনের পর রাজা বিম্বিসার তাঁর পত্নী

ক্ষেমাকে ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন, একবার অন্ততঃ বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে। অবশেষে রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাণী ক্ষেমা রাজার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রাজপত্নী ক্ষেমার জন্যে একটি দিন নির্দিষ্ট করা হল। সেদিন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে বুদ্ধ এবং অপর কয়েকজন ভিক্ষু ব্যতীত অপর সকলেই সেখান থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। পত্নী ক্ষেমাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা বিম্বিসার যথা সময়ে এসে উপস্থিত হলেন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে।

শিবিকা থেকে অবতরণ করে বিম্বিসার ক্ষেমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন বুদ্ধের বেণুকুঞ্জের আশ্রমের বিশ্রামশালায়। তাদের জন্য পূর্ব থেকেই আসন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। বুদ্ধের সম্মুখে উভয়েই আসন গ্রহণ করলেন। রূপগর্বে গর্বিতা ক্ষেমার আর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী যুবতী একখানি বিশাল তালবৃন্ত হস্তে, বুদ্ধকে ব্যজন করে চলেছেন। রাণী ক্ষেমা, যার রূপের খ্যাতি সমগ্র মগধ রাজ্যে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যিনি আপন রূপের গর্বে নিকট আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলতে ইতস্তত করতেন, সেই রাণী ক্ষেমা বুদ্ধের নিকট দণ্ডায়মানা এই যুবতীর রূপলাবণ্য দেখে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কোন মানবীর দেহে এত রূপলাবণ্য থাকতে পারে, এ তিনি কখনও কল্পনা করতে পারেন নি। যুবতীর রূপের ছটায় সমস্ত গৃহখানিই অপরূপ দীপ্তিতে একেবারে উদ্ভাষিত হয়ে গিয়েছিল। রাজা ও রাণীর সম্মুখে বুদ্ধ নীরবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট, আর তাঁর পাশে দণ্ডায়মানা যুবতী তালবৃন্ত হস্তে তাঁকে ব্যজন করে চলেছেন। অপার বিস্ময়ে দুচোখ ভরে দেখতে লাগলেন রাণী ক্ষেমা সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য। যতই দেখেন ততই তাঁর দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যেতে থাকে। সমস্ত কুটির তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কারুর মুখেই কোন প্রকার ব্যক্য স্ফূর্তি নেই। এরপর ধীরে ধীরে এক অদ্ভূত কান্ড দেখা দিতে লাগল। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই সেই পরমা সুন্দরীর দেহে ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। তার সেই অপার্থিব অলৌকিক রূপলাবণ্য ক্রমশঃ তার দেহ থেকে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। তার দৃষ্টির সম্মুখেই যুবতীর দেহ থেকে ধীরে ধীরে যৌবন অপসৃত হয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে বার্ধক্য এসে তার দেহটিকে অধিকার করে নিল। তারপর ধীরে ধীরে জরা এসে দেখা দিল তার দেহে। এবার তালবৃন্তখানিকে চালনা করাও আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। যে রমণীর রূপের ছটায় খানিকক্ষণ পূর্বেও সমস্ত কুটিরখানি অপার্থিব সৌন্দর্যের আভায় একেবারে উদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল, তার দৃষ্টির সম্মুখেই সেই রমণী ধীরে ধীরে বিগত যৌবনা হয়ে শেষে জরাগ্রস্ত হয়ে একেবারে হতশ্রী হয়ে গেলেন। এরপর মৃত্যু এসে সবকিছুরই অবসান ঘটিয়ে দিয়ে গেল। রূপগর্বে গর্বিতা রাণী ক্ষেমার এবার অন্তঃদৃষ্টি লাভ

হল। বৃথাই রূপের অহঙ্কার। দেহ লাবণ্যকে গ্রাস করে নেবার জন্য বার্ধক্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বার্ধক্যের পিছনে ধেয়ে চলে আসছে জরা। গ্রাস করে নেবে তার অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরীকে। তখন গর্ব করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর নির্মম মৃত্যু এসে, তার যাদু দন্ড বুলিয়ে দিয়ে সব কিছুই নিরব নিথর করে দিয়ে চলে যাবে। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার পাবার উপায় নেই। বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেকে তিনি তখন বুদ্ধের চরণ তলে লুটিয়ে দিলেন। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করলেন তিনি। পরবর্তীকালে ভিক্ষুণী সংঘের অন্যতম অগ্রসাধিকা হিসাবে তিনি নিজের পরিচয় রেখে গিয়েছেন এবং বুদ্ধের কৃপায় অর্হত্ব লাভ করেছিলেন তিনি। ক্ষেমাকে শাসন করবার জন্যই বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে অপূর্ব রমণীর সৃষ্টি করে তার অহঙ্কার চূর্ণ করে মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছিলেন।

পর্বতবেষ্টিত রাজগৃহ নগরীর বাইরে ছিল গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যের একপাশে ছিল সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু আদিম জাতীয় লোকের বাস। তাদের মধ্যে নর-মাংসভোজীও কিছু ছিল। সুযোগ পেলেই তারা নগরীতে প্রবেশ করে অতর্কিতে গৃহস্থ ঘরের শিশু সন্তানদের অপহরণ করে নিয়ে পালাতো এবং সেই সমস্ত শিশুদের মাংসে নিজেদের উদর পূর্তি করতো। হারীতি নামে এক রমণী ছিল তাদের একজন। তার স্বামীর নাম ছিল পাণ্ডিক। এদেরও কয়েকটি পুত্র-কন্যা ছিল। পুত্র-কন্যাদের প্রতি হারীতি এবং পাণ্ডিকের স্নেহ ভালবাসা নিতান্ত কম ছিল না। বিশেষ করে হারীতি তার শিশু-পুত্রটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতো। দুদণ্ড তাকে না দেখে সে থাকতে পারতো না। এমনি ছিল তার মায়ার বন্ধন। অথচ সেই মায়াবতী রমণী নিজে ছিল একজন সন্তানঘাতিনী এবং শিশু মাংসভোজী। ভিক্ষের ছল করে সে প্রায়ই নগরের মধ্যে প্রবেশ করতো। এবং গৃহস্থগণের অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের শিশু চুরি করে তাদের মাংসে উদর পূর্তি করতো। হারীতির দৌরাত্ম্যের কথা বুদ্ধের নিকটও পৌঁছেছিল। হারীতিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে বুদ্ধ একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের ছলে নগর ছাড়িয়ে একেবারে হারীতিদের পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হারীতি সে সময় গৃহে উপস্থিত ছিল না। তার আদরের দুলাল পুত্রটি তখন গৃহের বাইরে খেলা করছিল। বুদ্ধ শিশুটিকে সস্নেহ সম্ভাষণ দ্বারা কাছে টেনে নিলেন। তারপর উভয়ে মিলে একসঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে এসে উপস্থিত হলেন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে। শিশুটিকে আদর আপ্যায়ন করে খাইয়ে দাইয়ে আশ্রমের এককোণে রেখে দেওয়া হল। এদিকে হারীতি গৃহে ফিরে এসে তার নয়নের মণি শিশুপুত্রটিকে দেখতে না পেয়ে প্রথমটায় একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠল। তারপর জানতে পারলো যে বেণুকুঞ্জের আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসী নিজে এসে তার শিশুপুত্রটিকে নিয়ে

গিয়েছেন। এই সংবাদ জানতে পেরে হারীতি ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলো। তক্ষুণি সে ছুটে চলে গেল বেণুকুঞ্জের আশ্রমের দিকে। বুদ্ধ তখন দ্বিপ্রাহরিক কাজকর্ম সেরে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় ঝড়ের বেগে ভীষণ মূর্তিতে এসে দেখা দিল হারীতি বুদ্ধের সম্মুখে। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সে উন্মত্তের ন্যায় বুদ্ধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল; কিন্তু বুদ্ধকে সে কিছুতেই নাগালের মধ্যে পেল না। পুনঃ পুনঃ সে বুদ্ধকে আক্রমণ করতে গেল। কিন্তু প্রতিবারই সেই একই অবস্থা হল। অবশেষে সে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে কাতর কণ্ঠে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাল। বুদ্ধ তখন তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ধীরে ধীরে জানালেন, তুমি তো সন্তানের জননী। অপত্য স্নেহ যে কি বস্তু, তা তুমি উত্তমরূপেই অবগত আছ। তুমি যেমন তোমার সন্তানকে স্নেহ কর, প্রতিটি জননীই তাদের নিজ নিজ সন্তানকে সেরকম স্নেহ করে থাকেন। তবে কিজন্য তুমি অপরের সন্তান অপহরণ করে সেই সব জননীর প্রাণে নিদারুণ আঘাত দাও? বুদ্ধের মধুর বচনে হারীতি চেতনা লাভ করতে সমর্থ হয়। তখন সে বুদ্ধের নিকট প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আর কখনও সে অপরের শিশু সন্তান অপহরণ করবে না। এর পর হারীতি তার নিজের, তার স্বামীর এবং পাঁচটি ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে বুদ্ধকে অনুরোধ জানালে বুদ্ধ তার সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। বুদ্ধ তখুনি সংঘের ভিক্ষুগণকে সমবেত করে তাদের আদেশ দান করলেন, তাদের ভিক্ষালব্ধ অন্ন থেকে কিছু কিছু তুলে রেখে প্রতিদিন হারীতিকে দান করার জন্যে। বুদ্ধের সেই আদেশ অনুসারে প্রতিটি বিহারেই হারীতির জন্যে পৃথকভাবে অন্ন সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই হারীতি পরে বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবিকা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যে হারীতি এককালে শিশুঘাতিনী ছিল, সেই হারীতি পরে পরিবর্তিতা হয়ে শিশুর রক্ষাকারিণী এবং শুশ্রূষা-কারিণী হয়ে উঠেছিল এবং আরও পরবর্তীকালে শীতলামাতারূপে সকলের পূজিতা হয়েছিল। অজন্তার এক নম্বর গুহায় হারীতি এবং তার স্বামী পাঞ্চিকের পাশাপাশি অবস্থিত দু'খানি মূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তি দু'খানির পাদদেশে বালসুলভ ক্রীড়ায় মত্ত অবস্থায় কয়েকটি শিশুর মূর্তিও খোদিত রয়েছে। শিশুঘাতিনী হারীতি পরশমণির চরণ সংস্পর্শে দেবীর আসন লাভ করলেন।

ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করায়, সেইসব ব্যক্তিবর্গের নিকট আত্মীয়-স্বজনগণ বুদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁকে নানা প্রকার কটূক্তি করতে এসে শেষে নিজেরাও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন। রাজগৃহেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজগৃহের বিলঙ্গিক ভরদ্বাজ নামে এক ব্যক্তি একদিন

তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের সংসার ত্যাগের ফলে বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং বুদ্ধকে কটূক্তি বর্ষণ করবার জন্য বেণুকুঞ্জে এসে উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রথমেই বলে উঠলেন, নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করলে তার ফল বায়ুর বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত ধূলির ন্যায় তার নিজের উপর এসে পড়ে। বুদ্ধের এই কথা শুনে বিলঙ্গিক ভরদ্বাজ চমকে উঠলেন। তখন তিনি নিজেই নিজের ভ্রম বুঝতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করা দূরে থাকুক তিনি এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধের চরণাশ্রয় করে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার বাসনা জানালেন। বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। বুদ্ধ নির্দেশিত সাধনমার্গ অবলম্বন করার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সিদ্ধিলাভ করে হলেন মুক্ত পুরুষ।

অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজ নামে অপর এক ব্যক্তিও তাঁর নিকট আত্মীয়ের সংসার ত্যাগের ফলে বুদ্ধের প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর উপর অত্যন্ত কর্কশভাষা প্রয়োগ করেন। বুদ্ধ তাঁর কর্কশ ভাষণের প্রত্যুত্তরে সম্পূর্ণ নিরুত্তর থাকেন। বুদ্ধকে নিরুত্তর দেখে অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজ মনে করলেন যে, বুদ্ধ এবার তাঁর নিকট পরাজিত হয়েছেন। তখন বুদ্ধ ধীরে ধীরে অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, ক্রোধ প্রকাশ এবং অবাক্য কুবাক্য বলে নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরুত্তর হতে দেখে কেউ যদি নিজেকে জয়ী বলে মনে করেন, তবে তিনি অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত রয়েছেন। ক্রোধের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করা থেকে যিনি বিরত থাকতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে জয়ী হন। বুদ্ধের এই কথা কটির মধ্য থেকে অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজ যেন কিছু দুর্লভ বস্তু পেয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সকল ক্রোধের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। ক্রোধের পরিবর্তে ভক্তিতে ভরে উঠল তাঁর সমগ্র অন্তর। তখন তিনি বুদ্ধের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করেন। বুদ্ধের কৃপার ফলে অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজও অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের নিকট সকলেরই ছিল সমান অধিকার। উচ্চ-নীচ বলে কোন কিছুই ছিল না তাঁর নিকট। অনেক সময় দেখা যেত বার্ধক্য পরিবারের লোকেরা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা, যাঁরা বুদ্ধের নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করতেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই বৈষম্যমূলক আচরণ দেখতে পাওয়া যেত। বুদ্ধ সেদিকে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। যখনই সে রকম কোন বৈষম্যমূলক আচরণ তিনি লক্ষ্য করতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেগুলোকে সংশোধন করে দিতেন। ভিক্ষুগণকে লক্ষ্য করে প্রায়ই তিনি বলে উঠতেন, নদীর জল সাগরে পতিত হলে, যেমন তার কোন পৃথক সত্তা থাকে না অথবা কোন পরিচয় থাকে না তখন যেমন সে হয়ে দাঁড়ায় কেবল সাগরের জল, তেমনি যে কেউ ভিক্ষুধর্ম আশ্রয় করে একবার ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করলে তখন আর তার পূর্বের পরিচয় থাকে না।

তখন তিনি কেবল ভিক্ষু বলেই পরিচিত হন। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে স্থান দিয়েছেন তিনি। জন্ম নয় কর্মকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

স্নীত ছিল রাজগৃহের ধাঙড়। প্রত্যহ রাস্তাঘাট ঝাট দেওয়া এবং ময়লা পরিষ্কার করাই ছিল তার কাজ। নীচকুলে ছিল তার জন্ম। সেজন্য উচ্চকুলের লোকেদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা তার কোন দিনই ছিল না। ধাঙড় হলেও স্নীতের অন্তর ছিল অতি বিশুদ্ধ। তার দৈনন্দিন কাজে কোন দিনই সে অবহেলা করেনি। দিন শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী যেত সে। সংসারে তার পোষ্যবর্গও ছিল নিতান্ত কম নয়। তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেও সে কোন দিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেনি। সাধ্যমত সকলেরই জন্যে সমভাবে চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও পাঁচজন গৃহীর ন্যায় সংসারের প্রতি কোন মোহ অথবা আকর্ষণ ছিল না স্নীতের মনে। তার অন্তর ছিল সন্ন্যাসীর মতই উদাসীন। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে তার প্রাণে আনন্দ দেখা দিত। কিন্তু তাদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হবার মত সৌভাগ্য থেকে সে আজন্ম বঞ্চিত হয়েছিল। অনেকদিন সে বুদ্ধকেও সশিষ্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণে যেতে দেখেছে। যখনই সে বুদ্ধকে তাঁর শিষ্যবর্গসহ পথে য়েতে দেখেছে তখনই সে তার দুনয়ন ভরে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। পরক্ষণেই আবার যথারীতি সে নিজের কাজে মনোনিবেশ করেছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ কর্তব্য সমাপন করে নিজের কুটীরখানিতে ফিরে গিয়েছে। সে দিনও সে এমনি-ভাবেই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করে চলেছিল। এমনি সময়ে সে দেখতে পেল সশিষ্য বুদ্ধকে সেই পথে অগ্রসর হয়ে আসতে। সন্ন্যাসীর দল নিকটে এলে স্বভাবতই সে কুণ্ঠিত মনে রাজপথ থেকে সরে এসে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনি বুদ্ধ এগিয়ে গেলেন তার দিকে। বুদ্ধকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সুনীত ততোধিক কুণ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ পিছন দিকে সরে যেতে লাগল। অবশেষে নগর প্রাচীরের নিকট চলে এল সে। আর পিছনে যাবার উপায় নেই। সেখানে একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধ। স্নীতকে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বুদ্ধ বললেন, "স্নীত তুমি এসো আমার সঙ্গে"। বুদ্ধের কথা শুনে স্নীত প্রথমটায় বুঝতে পারেনি সেকথার সারমর্ম। হতভম্বের মত সে কেবল বুদ্ধের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার পর বুদ্ধ যখন পুনরায় শুধালেন, "তুমি ভিক্ষু সংঘে যোগদান করে ভিক্ষু হও", তখন সুনীতের আনন্দের আর সীমা রইলো না। সে নিজে একজন অচ্ছ্যুৎ, সকলেই তার সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলে, আর আজ কিনা বুদ্ধ স্বয়ং তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তাকে বলছেন ভিক্ষু সংঘে যোগ দিতে? এতবড় অসম্ভব কথা সে স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারেনি। বুদ্ধ তাকে নিয়ে এলেন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে। বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে স্নীত ভিক্ষু

হলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হলেন একজন মুক্ত পুরুষ অর্হৎ। তখন তার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর বুদ্ধ একদিন অন্যান্য ভিক্ষুগণের সম্মুখে সুনীতের অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না। তাঁর নিকট উচ্চ-নীচ বলেও কোন ভেদ ছিল না। সকলেরই ছিল তাঁর নিকট সমান অধিকার। সকলের প্রতিই তিনি করুণা বর্ষণ করেছেন। তাঁর করুণা থেকে পশুপাখীরাও বাদ যায়নি। সকলকেই তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তার শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেও জাত্যাভিমান থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সমর্থ হননি। বিশেষ করে বুদ্ধের নিকট আত্মীয় এবং শাক্যবংশীয়গণ। পরে বুদ্ধের উপদেশের ফলে তাঁদের ভ্রান্ত জাত্যাভিমান দূর হয়। বুদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে অনেকের আবার পদমর্যাদা বোধও ছিল। বিশেষ করে উচ্চবংশীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে। আবার বুদ্ধের সাহচর্যে এসেছিলেন এমন লোকেদের মনেও যথেষ্ঠ অহঙ্কার বোধ জাগ্রত ছিল। সেজন্য তারা সর্বদাই সকলের নিকট গর্ব করে বেড়াত। এমন লোকেদের মধ্যে প্রধান ছিল সারথি ছন্দক। ভিক্ষু সমাজে তার গর্ববোধ নিয়ে শেষে সমালোচনা হতে থাকলে কথাটা ক্রমে বুদ্ধের নিকটে গিয়ে পেঁাছায়। বুদ্ধ একদিন ভিক্ষুগণের সমক্ষে ছন্দককে যথেষ্ট তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সে অনুরূপ আচরণ করতে না পারে সেজন্য তার দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করেন। পরে বুদ্ধের উপদেশে সকলেই নিজ নিজ গর্ববোধ এবং ভ্রান্ত জাত্যাভিমান থেকে মুক্তি লাভ করেন। সুনীতের বেলায় তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেও অর্হত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। কর্মই হল সবকিছু। কর্ম দ্বারাই মানুষের বিচার এবং তার মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে তার কর্মের দ্বারাই। জন্ম অথবা জাতি দিয়ে নয়।

সোপাকের জন্ম নগরের বাইরে চণ্ডাল পল্লীতে। জন্মের অল্পদিন পরেই সে হয়ে পড়ল পিতৃহীন। পিতৃব্যের আদর-যত্নে সে বড় হয়ে উঠতে থাকে। ছেলে ভবিষ্যতে একদিন মানুষ হয়ে উঠবে সেই গর্বে মায়ের বুক ভরে ওঠে। ইতিমধ্যে পিতৃব্য বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে আনলেন। তখন থেকে সোপাকের আদর-যত্নে হঠাৎ ভাটা পড়ল। পিতৃব্য-পত্নী সোপাককে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তার মায়েরও এমন কোন সঙ্গতি ছিল না যাতে সে পুত্রকে নিয়ে অপর কোথাও গিয়ে উঠতে পারে। সোপাকের পিতৃব্য-পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করার পর থেকে সোপাকের উপর তার পিতৃব্যও ক্রমে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। আদর-যত্নের পরিবর্তে পিতৃব্যের দুর্ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন ক্রমশ বেড়েই চলতে থাকে। অবশেষে একদিন এক অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পিতৃব্য সোপাককে নির্মমভাবে প্রহার করে একেবারে মৃতপ্রায় করে ফেলে।

তারপর সোপাকের মৃত্যু হয়েছে ভেবে তাকে নিকটস্থ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে এক মৃতদেহের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়ে এল। উদ্দেশ্য রাত্রিতে শবখাদক শেয়াল-কুকুরের দল এসে যথারীতি তার সৎকার করবে। সোপাকের জননী সে সমস্ত কিছুই জানতে পারেননি। অধিক রাত্রিতে সোপাকের জ্ঞান ফিরে এল। তৎক্ষণ সেখানে শবখাদক শেয়াল-কুকুরের দল এসে জুটেছে। সেই ভীষণ স্থানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বালক সোপাক তখন কেবল উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে বলতে লাগল, কে কোথায় আছো আমাকে রক্ষা কর, বাঁচাও! তার কাতর বিলাপ কারুরই কানে গিয়ে প্রবেশ করেনি। উপরন্তু তার সেই কাতর বিলাপে শেয়াল-কুকুরের দল আরও অধিক সংখ্যায় সেখানে এসে জড় হতে লাগল। যখন সে দেখল যে তার আর রক্ষা পাবার মতো কোন উপায় নেই, তখন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগল। এমন সময় সেই ভীষণ ভূমি হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। সোপাক দেখতে পেল তার সম্মুখে এক অতীব সুন্দর মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই মানুষটি সোপাককে বললেন ভয় নেই। সোপাকের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। তার পর সেই মানুষটি সোপাককে বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর আশ্রমে, তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করল বালক সোপাক।

এদিকে সোপাকের জননী তাঁর পুত্রকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পাগলের মত দিশেহারা হয়ে সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথাও পুত্রকে দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলেন বেণু কুঞ্জের আশ্রমে। বুদ্ধের পদদ্বয়ের সম্মুখে আছড়ে পড়ে বুদ্ধের পদদ্বয় বুকে ধারণ করে কেঁদে আকুল হয়ে কাতর কণ্ঠে তাঁকে মিনতি করে বললেন, প্রভু আমার পুত্রকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, তুমি তাকে আমার নিকট এনে দাও। সোপাকের জননীর কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভগ্নী সম্বোধন করে মধুর বচনে বললেন, অধীর হয়ো না, জগতে কেউ কারুর নয়। মৃত্যু ধেয়ে আসছে, তার হাত থেকে তোমার পুত্র সোপাক ও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। বুদ্ধের বচন শুনে সোপাকের জননী নতুন কিছুর সন্ধান পেলেন। পুত্রের জন্য তাঁর উদ্বেগও ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে লাগল। তিনি তখন বুদ্ধের চরণ স্পর্শ করে বলে উঠলেন, প্রভো তোমার চরণে আমাকে আশ্রয় দাও। বুদ্ধ তাকে দীক্ষা দান করলেন। ঠিক সেই সময়ে তার হারিয়ে যাওয়া কিশোর পুত্র সোপাক মুণ্ডিত মস্তকে শ্রমণের বেশে এসে উপস্থিত হলেন জননীর সম্মুখে। আনন্দের আবেগে সোপাকের জননীর দু নয়ন প্লাবিত করে তখন কেবল অশ্রুধারা নির্গত হতে লাগল।

বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে অচ্ছুৎ চণ্ডাল পুত্র সোপাক এবং তার জননী নব জীবন লাভ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সোপাক সিদ্ধির চরম শিখরে

আরোহণ করে অর্হত্ব অর্জন করতে সমর্থ হলেন। একদিন বুদ্ধ সোপাককে গন্ধ কুটীরে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তাকে পর পর দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অপূর্ব প্রতিভাধর কিশোর ভিক্ষু সোপাক সে সব কটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করে সমগ্র ভিক্ষু সংঘকে বিস্মিত করে দেন। বুদ্ধ এর পর সোপাককে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাঁকে উপসম্পদা দানের জন্যে নির্দেশ দেন। সাধারণতঃ বিশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কাউকে উপসম্পদা প্রদান করা হয় না। বুদ্ধ পুত্র রাহুলকেও তার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে সে সম্মান দেওয়া হয়নি। কিন্তু চণ্ডাল পুত্র সোপাকের বেলায় তার ব্যতিক্রম হল। সোপাকের এই উপসম্পদা বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইতিপূর্বে ধাঙড় সুনীতের বেলায় বুদ্ধ বলেছিলেন, যে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়। চণ্ডালপুত্র সোপাকের বেলায় তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া গেল।

রাজগৃহ থেকে বুদ্ধ সদলবলে পুনরায় কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে গিয়ে উপস্থিত হন। এবার শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের আগমনের ফলে যারা ইতিপূর্বে কেবল বুদ্ধের নামই শুনেছেন অথচ তাকে চাক্ষুষ দেখেননি, অথবা তাঁর নিকট থেকে ধর্মকথা শোনেননি, সেই সব ব্যক্তিগণ দলে দলে এসে তার মুখে ধর্ম কথা শুনে তাঁর শরণ নিতে আরম্ভ করলেন। এভাবে উপাসক এবং ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে বুদ্ধের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের প্রভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে তীর্থিক সম্প্রদায় মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাদের বহু শিষ্যবর্গ ইতিমধ্যেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, বুদ্ধ শাসন মেনে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তখন তীর্থিকগণ সকলে মিলে এর একটা যথাবিহিত উপায় উদ্ভাবন করবার জন্যে পরামর্শ করতে লাগলেন। তীর্থিকগণের মধ্যে কয়েকজন এমন মত প্রকাশ করলেন যে, বুদ্ধের আশ্রমটি যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানটি হল কোশল রাজধানীর উপকণ্ঠের সর্ব-শ্রেষ্ঠ রমণীয় স্থান। সেজন্য লোকের দৃষ্টি সহজেই গিয়ে পড়ে জেতবনে। সুতরাং সেই রমণীয় স্থানটিতে যদি তাঁরাও অনুরূপ ধরনের একটি আশ্রম নির্মাণ করেন তবে নিশ্চয়ই বুদ্ধের প্রভাবে ভাটা দেখা দেবে এবং তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তীর্থিকগণের মধ্যে তখন সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং জেতবনে বুদ্ধের আশ্রমের সন্নিকটে নিজেদের জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু কেবল সঙ্কল্প গ্রহণ করলেই তো আর কাজ শেষ হয়ে যাবে না, তার জন্যে রাজার অনুমোদনের একান্ত প্রয়োজন। রাজা প্রসেনজিৎ নিজেও ছিলেন বুদ্ধের একজন ভক্ত ও শিষ্য। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে জেতবনের সন্নিকটে নতুন আশ্রম নির্মাণের জন্যে অনুমোদন লাভ করা সম্ভবপর হবে না বলে অনেকেই মত প্রকাশ করলেন। তখন তীর্থিক-গণের মধ্য থেকে বর্ষীয়ান এক ব্যক্তি বলে উঠলেন উৎকোচ দানে বশীভূত করা

যায় না, এমন ব্যক্তি বড় একটা কেউ নেই। সুতরাং কোশল রাজকেও উৎকোচদানে বশীভূত করতে হবে এবং এজন্য অন্ততঃ পক্ষে লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। সেই ব্যক্তির কথানুসারে তীর্থিকগণ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করে রাজ কর্মচারিগণের সহায়তায় সেই সমুদয় মুদ্রা রাজা প্রসেনজিৎকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। এর পর তীর্থিকগণের মধ্যে একজন সুচতুর ব্যক্তি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন এবং রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা প্রসেনজিৎ তীর্থিকগণের সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। যাতে বৌদ্ধগণের নিকট থেকে কোন প্রকার বাধা এসে উপস্থিত হতে না পারে, সেজন্য তীর্থিকেরা পূর্ব থেকেই রাজাকে জানিয়ে রাখলেন যে, যদি ভিক্ষুগণ নতুন আশ্রম নির্মাণের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আপনার নিকট এসে উপস্থিত হন, তবে আপনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে তাদের বিদায় দেবেন। রাজা তাদের সেই প্রার্থনাও মঞ্জুর করেন।

এরপর তীর্থিকেরা স্থপতি সংগ্রহ করে মহাধর্মধামের সঙ্গে জেতবনের আশ্রমের একেবারে পার্শ্বেই তাদের জন্যে নতুন আশ্রম নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিল। তাদের সেই আশ্রম নির্মাণের উদ্যোগের ফলে সেখানে অবিশ্রান্তভাবে গোলযোগ উপস্থিত হতে থাকলে, বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ তখন তীর্থিকগণের সমস্ত পরিকল্পনা বুদ্ধের গোচরে নিয়ে আসেন। তখন বুদ্ধ আনন্দকে জানালেন এই স্থান তীর্থিকগণের আশ্রম নির্মাণের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাঁরা নির্জন পরিবেশ পছন্দ করেন না। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করাও সম্ভব হবে না, তখনই তিনি আশ্রমস্থিত সমস্ত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে তাঁদের একত্রিত করে আদেশ দিলেন যে, তোমরা এক্ষুনি গিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তীর্থিকগণের আশ্রম নির্মাণ বন্ধ করার জন্যে নির্দেশ দিতে রাজাকে অনুরোধ জানাও। বুদ্ধের আদেশে ভিক্ষুগণ সকলে মিলে এসে উপস্থিত হলেন রাজপুরীতে। ভিক্ষুগণের আগমন সম্বন্ধে রাজা প্রসেনজিৎ পূর্ব থেকেই আঁচ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উৎকোচগ্রাহী রাজা ভিক্ষুগণের সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ না করে দূতমুখে বলে পাঠালেন তিনি এখন রাজপুরীতে উপস্থিত নেই। দূতের কথা শুনে ভিক্ষুগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে বুদ্ধকে জানালেন সেই কথা। সব শুনে বুদ্ধ তাঁর অগ্রশাবকদ্বয় সারীপুত্ত ও মোগ্যাল্লায়নকে পাঠালেন রাজার নিকটে। বুদ্ধের অগ্রশাবকদ্বয়ের আগমন সত্ত্বেও রাজা পুনরায় ঐ একই প্রকার ভান করে রইলেন এবং দূতমুখে পুনরায় বলে পাঠালেন তিনি এখন রাজপুরীতে উপস্থিত নেই। সারীপুত্ত ও মোগ্যাল্লায়ন ফিরে এসে বুদ্ধকে জানালেন রাজার চাতুরীর কথা। বুদ্ধ সারীপুত্তকে উদ্দেশ্য করে জানালেন, দুবার মিথ্যা সংবাদ দিয়ে রাজার পক্ষে রাজপুরীর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে

বসে থাকা আর সম্ভবপর হবে না। এবার তাঁকে প্রাসাদ থেকে বাইরে আসতেই হবে।

সেদিন বুদ্ধ এ সম্বন্ধে আর কাউকে কিছু বললেন না। এদিকে নতুন আশ্রম নির্মাণের কাজে তীর্থিকগণের মধ্যে উদ্যোগ-আয়োজনের মাত্রা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরদিন প্রভাতে বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে এসে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং বুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছেন জেনে রাজা এবার আর পূর্বের মতো মিথ্যা অভিনয় দ্বারা আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হলেন না। এবার তিনি প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে বুদ্ধের নিকটে এসে তাকে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করে তাঁর হাত থেকে ভিক্ষাপাত্রখানি নিজে স্বহস্তে গ্রহণ করে সাদরে তাঁকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন এবং উপস্থিত পাঁচশত ভিক্ষুকে উপযুক্ত খাদ্যবস্তু প্রদান করলেন। এরপর বুদ্ধ রাজার সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মহারাজ কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নয়। দুই প্রব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ এবং বিদ্বেষ উপস্থিত করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার। এই বলে তিনি প্রাচীন কালের উৎকোচ গ্রহণকারী ভরু রাজার কাহিনী বর্ণনা করে সেই রাজার অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত করেন। সেই কাহিনী ভরু জাতক কাহিনী (২১৩) নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেই কাহিনী শুনে রাজা প্রসেনজিৎ তীর্থিকগণের জন্যে নতুন আশ্রম নির্মাণ করার কাজ বন্ধ করার জন্যে নির্দেশ দান করেন এবং যতটুকু কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছিল সে সমুদয় বিনষ্ট করে ফেলবার জন্যে অনুচরবর্গকে আদেশ দান করেন।

তীর্থিকেরা কিন্তু এতেও নিরুৎসাহ হননি। তীর্থিকের দল পুনরায় বুদ্ধকে এবং তাঁর শিষ্যবর্গকে জনসমক্ষে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করে অপদস্থ করবার জন্যে নূতন করে চক্রান্ত করতে আরম্ভ করেন। তপস্যার দ্বারা যারা ঋদ্ধিবল লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন করাটা এমন কিছুই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তীর্থিকগণের মধ্যে সে ক্ষমতা কারুর কারুর ছিল। বুদ্ধ কিন্তু নিজে ছিলেন অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শনের একান্ত বিরোধী। অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ তিনি নিজের জীবনে খুব কমই প্রদর্শন করেছেন। ইতিপূর্বে রাজা প্রসেনজিৎকে একবার মাত্র তিনি তার নিজের যোগ বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়ে তাঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়েছিলেন। তীর্থিকেরা এবার দাবী করতে লাগলেন যে, লোকে কেবলমাত্র সাময়িক মোহের বশবর্তী হয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ তাঁদের সমকক্ষ সন্ন্যাসী নন এবং তাঁর যোগ বিভূতি প্রদর্শনেরও কোন ক্ষমতা নেই। একথা তাঁরা জোর গলায় প্রচার করতে আরম্ভ করলে কথাটা ক্রমে রাজা প্রসেনজিতের কর্ণগোচর হয়। এ ব্যাপারে বুদ্ধ অবশ্য নিরুত্তরই থাকেন, কেননা এসব অবান্তর কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করা তিনি কখনই সমীচীন বলে মনে করতেন না। এদিকে এ ব্যাপার

নিয়ে তীর্থিকগণের আস্ফালন ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলতে থাকে। অবশেষে রাজা প্রসেনজিৎ স্বয়ং একদিন বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে সর্বসমক্ষে তাঁর নিজের যোগ বিভূতির কোন অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন করিয়ে এর একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসা করে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাজার আবেদনের উত্তরে বুদ্ধ এবার স্মিতহাস্যে তাঁর সম্মতি জানালেন। তখনি ঠিক হল, বুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট দিনে রাজার আম্রকাননে উপস্থিত থেকে সর্বসমক্ষে তাঁর যোগ বিভূতি প্রদর্শন করবেন। এদিকে সেই নির্দিষ্ট দিনে বুদ্ধের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য তীর্থিক সন্ন্যাসীগণকেও আহ্বান জানানো হল। বুদ্ধের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হবার জন্যে তৈরী হলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থিক সন্ন্যাসী পূরণ কাশ্যপ। বুদ্ধের বিরোধিতায় যে সকল তীর্থিক সন্ন্যাসী সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। আর অন্যান্য তীর্থিক সন্ন্যাসী যাঁরা সর্বদাই বিরোধিতা করেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে নির্গন্থ জ্ঞাতি পুত্র, কুকুধ, কাত্যায়ন, কোর ক্ষত্রিয়, মস্করি গোশালি পুত্র (এর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আজীবক অথবা আজীবিক নামে পরিচিত হন ও সঞ্জয়ী বৈরট্টি পুত্র সারীপুত্ত ও মোগ্যল্ল্যায়ন সংসার ত্যাগ করে এসে প্রথমে এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, পরে বুদ্ধ শিষ্য অশ্বজিতের নিকট বুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এরা সদলবলে এসে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন)।

পূরণ কাশ্যপের আশী হাজার শিষ্য এবং শিষ্যা ছিলেন। তখনকার দিনে অনেকে তাঁকেই বুদ্ধ বলে মনে করতেন। তিনি কোনপ্রকার বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। সবদাই নিজের দেহটাকে অনাবৃত রাখতেন। বৌদ্ধগণের মতে ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দাসীপুত্র। বাল্যকালে প্রভুর গৃহে অতি সাধারণ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। পূরণ কাশ্যপকে লোকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো।

নির্দিষ্ট দিনে বুদ্ধ এসে উপস্থিত হলেন রাজপুরীর সংলগ্ন আম্রকাননে। সেখানে ততক্ষণে বহুলোকেই এসে সমবেত হয়েছিলেন। অলৌকিক কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আশায়। এদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বৌদ্ধগণের বিরোধী, তাঁরাই সেদিন ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে স্বয়ং রাজা প্রসেনজিৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এবারে যোগ বিভূতি প্রদর্শনের পালা। প্রথমে বুদ্ধই অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করলেন। একটি সুস্বাদু আম্রফলের আঁটি বুদ্ধের আদেশে উপস্থিত সর্বজনের কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে সেই কাননের মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা হল। দেখতে দেখতে সকলের বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে সেই আঁটি থেকে একটি আম্র বৃক্ষের চারাগাছ দেখা দিল, তারপর ধীরে ধীরে সেই চারাগাছটি ক্রমে বর্ধিত হয়ে উঠতে লাগল এবং অতি অল্প সময়েই মধ্যেই একটি সুবিশাল আম্রবৃক্ষে পরিণত হল। দেখতে

দেখতে সমগ্র আম্রবৃক্ষটি মুকুলে ভরে গেল এবং সেই মুকুল থেকে অনতি-বিলম্বে আম্রফল দেখা দিল। সমগ্র বৃক্ষটি ফলভারে একেবারে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা দেখা দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ফলগুলো সুপক্কভাব ধারণ করলো। উপস্থিত সকলেই সেই সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে অপার আনন্দ অনুভব করতে সমর্থ হলেন। চতুর্দিকে বুদ্ধের জয়-জয়কার ধ্বনি উত্থিত হল। উপস্থিত সকলেই তার অত্যাশ্চর্য বিভূতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

এবার পূরণ কাশ্যপের পালা। পূরণ কাশ্যপ বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমতুল্য কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, কোন প্রকার অবাস্তব দৃশ্য অথবা ঘটনার অবতারণা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম হলেন। লোকে তখন পূরণ কাশ্যপের এবং তীর্থিকগণের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠল, পূরণ কাশ্যপ সেই নিদারুণ অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস মতে পূরণ কাশ্যপ প্রকাশ্যে বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমেছিলেন বলে, পরকালে তার অধোগতি হয়েছিল।

পূরণ কাশ্যপের জলে আত্মনিমজ্জনের পর, তার আশী হাজার শিষ্য ও শিষ্যাগণের অধিকাংশই বুদ্ধের ধর্মশাসন গ্রহণ করেন। সেই সমস্ত ভক্ত ও উপাসকগণকে দীক্ষা দানের পর বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিন মাস কাল তিনি অবস্থিতি করেন বলে বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত রয়েছে। এই তিনমাস কাল তিনি তাঁর জননী মহামায়ার নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যা করেন। পরে তিনি ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গ থেকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত সোপানের সাহায্যে সাঙ্কাশ্যা নগরের সন্নিকটে অবতরণ করেন। যেদিন বুদ্ধ অবতরণ করেন সেদিন সাঙ্কাশ্যা নগরে এক বিশাল জন সমাগম হয়েছিল। সেখানে বুদ্ধের অগ্রশাবকদ্বয় সারীপুত্ত ও মৌগ্যাল্ল্যায়নও উপস্থিত ছিলেন। সারীপুত্ত ও মৌগ্যাল্ল্যায়ন যখন রাজগৃহে বেণুকুঞ্জের আশ্রমে এসে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তার এক সপ্তাহকাল পরে প্রথমে মৌগ্যাল্ল্যায়ন অর্হত্ব লাভ করেন এবং তার একপক্ষকাল পরেই সারীপুত্তও অর্হত্ব লাভ করেন। মৌগ্যাল্ল্যায়ন ও সারীপুত্তের অর্হত্ব লাভ করার পরেই বুদ্ধ ভিক্ষুগণের সর্বসমক্ষে এদের দুজনকে ভিক্ষু সংঘের অগ্রশাবক বলে ঘোষণা করেন। মৌগ্যাল্ল্যায়ন এবং সারীপুত্তের অগ্রশাবকের পদ লাভে সংঘের অন্যান্য ভিক্ষুগণের মধ্যে যথেষ্ট ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। ভিক্ষুগণ সারীপুত্তের প্রতি বিশেষভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। ভিক্ষুগণের এই মনোভাব বুদ্ধের অজানা ছিল না। বিরুদ্ধ-বাদিগণের সূক্ষ্ম কূট তর্কজাল অনায়াসে ছিন্ন করে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল সারীপুত্তের। আর মৌগ্যাল্ল্যায়নের ছিল অদ্ভুত ঋদ্ধিবল। ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত সম্বন্ধে অন্যান্য ভিক্ষুগণের মন থেকে ঈর্ষা এবং বিরূপ

ধারণার অপসারণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ সাঙ্কাশ্যা নগরীর সেই মহতী জনসভায় সর্ব-সমক্ষে সারীপুত্তকে ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধে একের পর এক সুকঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। সারীপুত্তও সে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করে উপস্থিত সকলকেই বিস্মিত করে দেন। এর পর থেকে সারীপুত্ত সম্বন্ধে ভিক্ষুগণের মনে আর কোন ঈর্ষার ভাব রইল না। তখন সকলেই মনে-প্রাণে সারীপুত্তের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। অজন্তার সতের নম্বর গুহায় সাঙ্কাশ্যা নগরের ধর্মসভা সম্বন্ধে সুন্দর একখানি চিত্র রয়েছে। চিত্রখানি পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন। নাম না জানা শিল্পীর রচিত সেই অমূল্য চিত্রসম্ভারখানির মধ্যে পরিবেশিত জনতার একাংশে বেশ কয়েকজন বিদেশী ব্যক্তিকেও দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব বিদেশীগণের মুখাবয়ব এবং পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁরা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী।

সাঙ্কাশ্যা নগরের ধর্মসভার অধিবেশন শেষ করে বুদ্ধ সদলবলে পুনরায় চলে আসেন জেতবন বিহারে। তীর্থিকেরা ছিলেন চিরকালই বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মমতের বিরোধী। তাঁরা কিছুতেই বুদ্ধের প্রাধান্য সহ্য করতে পারলেন না। তীর্থিক সন্ন্যাসী পূরণ কাশ্যপের জলে নিমজ্জন দ্বারা আত্মবিসর্জনের পর থেকে তীর্থিকগণ বুদ্ধের উপর একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। বুদ্ধের নামটি পর্যন্ত তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। অথচ তাঁরা নিজেরাও ছিলেন অহিংসা মন্ত্রেই দীক্ষিত। সর্বজীবে দয়া ছিল তাঁদেরও মূলমন্ত্র। তা সত্বেও তাঁরা বুদ্ধের বিরোধিতায় এতদূর নীচে নেমে গিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁদের সহ্যগুণ এবং মহত্বগুণ সকল কর্দমলিপ্ত হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন সুবিধা করে উঠতে না পেরে শেষে তাঁরা স্বয়ং বুদ্ধকেই সর্বজন সমক্ষে হেয় এবং কুৎসিৎ প্রকৃতির বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে নারী-ঘটিত মিথ্যা কলঙ্কের অপবাদ প্রচার করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন উপায়েই হোক না কেন, বুদ্ধকে সর্বজন সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতেই হবে এবং বৌদ্ধগণের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতেই হবে। মানব জীবনের সবচেয়ে নিন্দনীয় এবং কদর্যতম অপচেষ্টার সেই কলঙ্কভার শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই মস্তক অবনত করে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চিঞ্চা মানবিকা শ্রাবস্তী নগরবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের কুলবধূ। অপরূপ রূপ-লাবণ্যের জন্যে তার খ্যাতিও ছিল প্রচুর। সেকালে তার মত রূপসী কুলবধূ শ্রাবস্তী নগরে বেশী ছিল না। শ্রাবস্তীর তীর্থিক সম্প্রদায়ের সে ছিল একজন প্রব্রাজিকা। কিন্তু তা সত্বেও তার চরিত্র নির্মল ছিল না। নিজের রূপ-গর্বে সে ছিল যথার্থই গর্বিতা। তীর্থিকগণ বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার জন্যে এই রূপবতী রমণীর সাহায্য প্রার্থনা করলে, সে সানন্দে তীর্থিকগণের অপ-চেষ্টার প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানিয়েছিল। তীর্থিকগণকে সে নাকি এমন

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল, যে তার পক্ষে বুদ্ধকে রূপের ফাঁদে ফেলে মায়াজালে আবদ্ধ করাটা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না। এরকম প্রতিশ্রুতি পেয়ে তীর্থিকেরাও সেদিন চিঞ্চার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এবারে চিঞ্চার সাহায্যে তাঁদের লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরে আসবে এই আশায় সেদিন তীর্থিকের দল আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।

চিঞ্চা প্রত্যহ বুদ্ধের ধর্মসভায় যোগদানের জন্যে আসতে থাকে। বুদ্ধের মুখ থেকে ধর্মকথা শোনা তার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। সেদিকে তার মনোযোগ অথবা আগ্রহ কোনটিই ছিল না। তার চেষ্টা ছিল কেবল বুদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। ধর্মসভায় এসে সে একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে আসন গ্রহণ করতো। সাধারণতঃ ভিক্ষুণীগণ একটু দূরে গিয়ে উপবেশন করতেন। কিন্তু চিঞ্চা একেবারে বুদ্ধের যতটা সম্মুখে এসে আসন গ্রহণ করতে পারা যায় সে চেষ্টা সর্বদাই করতো। তার এই ব্যবহার ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং অনেকেই তার চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ পোষণ করতেন। ধর্মসভায় আসন গ্রহণ করার পরেও চিঞ্চা সর্বসমক্ষে এমন সব হাব-ভাব দেখাতো, যেগুলো গৃহস্থ ঘরের কুলবধূর পক্ষে আদৌ শোভনীয় হতে পারে না। তার এই অশোভনীয় আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতেন না। সভাভঙ্গের পরে যখন সভাস্থ সকলেই নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং ভিক্ষুগণ তাঁদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে মনোনিবেশ করতেন। চিঞ্চা তখনও নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করতো না। ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি এসে দেখা দিলে চিঞ্চা ধীরে ধীরে নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে এমনভাবে পথে পা বাড়াতো, যেন কোন প্রণয় প্রার্থীর আকুল আগ্রহাতিশয্যের ফলেই এতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ পায়নি। জেতবনের ভিক্ষুগণও এই রূপবতী রমণীটির চালচলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই রমণীটি যে কোন অনর্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এভাবে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইলো না।

কিছুদিন বাদে চিঞ্চা প্রকাশ্যে এমন ভাব দেখাতে লাগলো, যেন সে গর্ভবতী হয়েছে। ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে মাঝে মাঝে সে বুদ্ধের প্রতি এমন সব সম্ভাষণমূলক শব্দ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে দিল, যাতে সাধারণ লোকের মনে স্বভাবতই বুদ্ধের প্রতি একটা সন্দেহের ভাব এনে দিতে পারে। বুদ্ধ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নির্বিকারভাবে চিঞ্চার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দান করে যেতেন। এমনিভাবে আরও কিছুদিন কাটাবার পর ধর্মসভায় চিঞ্চার যোগদানের সময় থেকে গণনা করে, নবম মাস আরম্ভ হলে, সে বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার জন্যে এক অতি কুৎসিত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। একখানি ভারী কাষ্ঠখণ্ডকে সূত্রদ্বারা উত্তমরূপে উদরে বেঁধে সে নকল গর্ভ তৈরী করে একদিন ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হল। ধর্মসভায় প্রবেশ করে সে একেবারে

বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপবেশন করে এমন ভাব দেখাতে আরম্ভ করে দিল, যেন গর্ভভারে সে একেবারে চলৎ শক্তি রহিত হয়ে পড়েছে। তারপর শত শত ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে সে কাতরভাবে বুদ্ধকে সম্বোধন করে বলে উঠল, "তুমিই তো এর জন্য দায়ী, সুতরাং এখন তুমিই আমার জন্যে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দাও।" এতবড় সাংঘাতিক কথা শুনে, সভাস্থ সকলেই নির্বাক বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহবিক্রমে বুদ্ধের উত্তরও শুনতে পাওয়া গেল। বুদ্ধ চিঞ্চাকে লক্ষ্য করে গর্জন করে বলে উঠলেন, "ভিক্ষুণী, তোমার যা অবস্থা হয়েছে, তা তুমি আর আমি ভিন্ন অপর কেউই তো তা জানেন না"। ইতিমধ্যে সকলের অলক্ষ্যে দুটি নেংটি ইঁদুর এসে চিঞ্চার বস্ত্রাভ্যন্তরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। সে ইঁদুর দুটি চিঞ্চার নকল গর্ভের বন্ধনের সূত্রগুলো কেটে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। চিঞ্চা তার কিছুই আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। বুদ্ধের গর্জনমুখর উক্তি শুনে, চিঞ্চা উঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে সর্বসমক্ষে উপহাসের পাত্র করে তোলার জন্যে যেমনি অঙ্গ-ভঙ্গি করতে গেল অমনি উদর থেকে ভারী কাষ্ঠখণ্ডটি স্খলিত হয়ে তার নিজেরই পায়ের আঙ্গুলের উপর পড়ে সেখানে দারুণ ক্ষতের সৃষ্টি করে দিল। এভাবে নিজের চাতুরী সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়াতে একদিকে সে যেমন লজ্জা পেল, অপরদিকে নিদারুণ যন্ত্রণাও ভোগ করতে হল। এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি নয়। ধর্মসভায় সমবেত ভক্তগণ এই চরিত্রহীনা রমণীর জঘন্যতম ব্যবহারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও ধিক্কার দিতে দিতে সেখান থেকে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দেন। রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের মত বিদায় নিল চিঞ্চা মানবিকা। বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতেগিয়ে তীর্থিকগণ নিজেদের মুখেই ভাল করে চুন-কালি মেখে বসলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে এদেশে তীর্থিকগণের প্রভাব অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খদ্যোতের ন্যায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করতে গিয়ে এবার তাদেরই চরিত্র আরও মসীলিপ্ত হল। অপর দিকে বুদ্ধের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের খ্যাতি সর্বত্র শতগুণে বৃদ্ধি পেল। কয়েকদিন পরে জেতবনের ধর্মসভায় বুদ্ধের ভক্ত এবং শিষ্যগণ এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন এবং তীর্থিকগণের জঘন্য অপচেষ্টার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সে সময়ে বুদ্ধ গন্ধ কুঠী থেকে সভায় আগমন করে আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ ভক্তগণের আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের উদ্দেশ করে জানালেন, যে চিঞ্চা কেবল এজন্মেই নয় পূর্বজন্মেও তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার জন্য একবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। এবং সেই অপরাধের ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এরপর তিনি সেই পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত বলতে থাকেন। সেই পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত "মহাপদ্ম জাতক" নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এরপর

আর একদিনও ধর্মসভায় চিঞ্চার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বলেন চিঞ্চা পূর্বে আরও একবার তাঁর বিরুদ্ধে অমূলক অপবাদ রটাবার চেষ্টা করেছিল এবং তার জন্যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই বলে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সেই অতীত বৃত্তান্ত "বন্ধন মোক্ষ জাতক" (১২০) নামে পরিচিত হয়ে আছে।

বর্ষাকালটা বুদ্ধ কোন একটি আশ্রমে কাটিয়ে দিতেন। এ সময়ে তিনি পাদপরিক্রমায় বেরোতেন না। ভিক্ষুগণকেও তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বর্ষাকালটা কোন এক স্থানে অবস্থিতি করে কাটিয়ে দেবার জন্যে। বর্ষাকালে পদদলিত হয়ে সামান্যতম কীটপতঙ্গাদিরও যাতে কোন প্রকার ক্ষতি হতে না পারে, সেই জন্যই তিনি এই ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অষ্টম বর্ষা যাপন করবার জন্য বুদ্ধ জেতবন থেকে ভর্গদেশের অন্তর্গত শিশুমার গিরির সন্নিহিত ভেসকলাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বৎসরাজ উদয়নের পুত্র বোধি শিশুমার গিরির কোকনদ প্রাসাদে বাস করতেন। ভেসকলা-বনে বুদ্ধের আগমনের সংবাদ পেয়ে বোধি পাত্র-মিত্র সমেত বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সেখানে এলেন। বুদ্ধের নিকট থেকে ধর্মকথা শুনে বোধি পরম তৃপ্তি লাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তাঁর অনুগামিগণও বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বোধি তাঁর প্রাসাদে সশিষ্য বুদ্ধকে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানালে বুদ্ধ তা গ্রহণ করেন এবং পরদিন সশিষ্য কোকনদ প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বোধির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

রাজকুমার বোধি একদিকে যেমন ছিলেন বিলাস-ব্যসনপরায়ণ অপর দিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে তিনি সবকিছুই করতে পারতেন। তাঁর মনোরম কোকনদ প্রাসাটিকে নির্মাণ করবার জন্য তিনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পনিপুণ একজন বর্ধকীকে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাসাদখানির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর বোধি বর্ধকীর কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তার চক্ষু দুটিকে উৎপাটিত করে তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, যাতে সে অপর কোন নৃপতির জন্যে কোকনদ প্রাসাদের অনুরূপ আর কোন প্রাসাদ নির্মাণ করতে সক্ষম হতে না পারে। রাজকুমার বোধির এই নৃসংশ আচরণের কথা ভিক্ষুগণ অবগত হয়ে ভেসকলাবনের আশ্রমে তাই নিয়ে একদিন সকলে মিলে যখন আলোচনা করছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন, যে, বোধি কেবল এ জন্মেই নয়, পূর্বেও সে অনুরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল। এই বলে তিনি বোধির পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী ধোনসাখ জাতক (৩৫৩) নামে পরিচিত হয়ে আছে। ভেসকলাবনে বর্ষাকালটা কাটিয়ে বুদ্ধ ভর্গদেশের বিভিন্ন স্থানে পাদপরিক্রমা করে ধর্মপ্রচার

করতে থাকেন। অগণিত নরনারী তাঁর মুখে ধর্ম কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

নবম বর্ষার আগমনের পূর্বে বুদ্ধ ভর্গদেশ থেকে বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বীতে সদলবলে চলে আসেন। রাজা উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত পূর্বেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বুদ্ধের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন। বুদ্ধ সদলবলে কৌশাম্বীর পথে রওনা হয়েছেন জেনে তিনি নগরের উপকণ্ঠে একটি রমণীয় উদ্যানে সশিষ্য বুদ্ধের অবস্থানের জন্যে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে সেই উদ্যানখানি ঘোষিতারাম নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। বুদ্ধ ঘোষিতারাম আশ্রমে এসে উপস্থিত হলে কৌশাম্বী রাজ্যের গঙ্গা ও যমুনার উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ দলে দলে এসে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। বৎসরাজ উদয়নও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট ভক্ত বলে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত হয়েছিলেন। উদয়নের নাম সংস্কৃত সাহিত্যেও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমসাময়িক একাধিক সংস্কৃত্য নাট্য সাহিত্যে তাঁকে নায়ক হিসাবে রূপদান করা হয়েছে। বুদ্ধ নিজে মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তার মূর্তি তৈরী করে অনুগামী ভক্তগণকে পূজা করতেও তিনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু উদয়ন নাকি বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে তাঁর একখানি মূর্তি রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও নাকি ভারত পরিভ্রমণ কালে ঐ মূর্তিখানিকে দেখেছিলেন। এই ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে বুদ্ধের মূর্তি সর্বপ্রথমে তাঁর জীবদ্দশাতেই নির্মিত হয়েছিল।

বুদ্ধের ঘোষিতারাম আশ্রমে অবস্থান কালে একদিন একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। একদিন বুদ্ধ যখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা হস্তিনী ধীরে ধীরে বুদ্ধের সম্মুখে এগিয়ে এসে প্রথমে শুণ্ড উত্তোলন করে তাঁকে প্রণাম জানাল। তারপর সে একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শুণ্ড দ্বারা বুদ্ধের চরণ যুগল স্পর্শ করে পুনরায় শুণ্ড উত্তোলন করে তাঁকে প্রণাম জানাল। বুদ্ধ হস্তিনীকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে, সে রাজহস্তিনী ভদ্রাবতী। একদিন এই হস্তিনী রাজপরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল এবং তখন তার আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। এখন সে অতি বৃদ্ধা হয়েছে, তার পক্ষে এখন আর রাজপরিচর্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখন তার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। এখন তার প্রতি কোন আদর-আপ্যায়ন তো দূরের কথা, রাজার হস্তীশালাতে তার স্থানটুকুও হয়নি। সেখান থেকেও সে এখন বিতাড়িত। বনে-বাদাড়ে ঘুরে সে তার প্রয়োজন মতো আহার্য গ্রহণ করবে এমন সামর্থ্যটুকুও এখন আর তার দেহে নেই। এখন সে ইচ্ছামতো চলাফেরা করে নিজের আহার্য বস্তুও সংগ্রহ করে উঠতে পারছে না। দয়ার অবতার বুদ্ধ হস্তিনীর

দুর্দশা দেখে সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বুদ্ধ তখন হস্তিনীকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও, আমি তোমার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো। বুদ্ধের নিকট থেকে আশার বাণী পেয়ে হস্তিনী পুনরায় শুঁড় উত্তোলন করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। যখন সে বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল, তখন তার দুই চক্ষু প্লাবিত করে অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল।

হস্তিনীকে বিদায় দিয়ে বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজবাড়ীর সম্মুখে। বুদ্ধের আগমন সংবাদ শুনে রাজা উদয়ন ব্যস্তভাবে এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের সম্মুখে, এবং তাঁকে রাজপুরীতে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ রাজার সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। সেখানে দাঁড়িয়েই বুদ্ধ রাজাকে প্রশ্ন করলেন, ভদ্রাবতী কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা নিরুত্তর রইলেন। রাজাকে নিরুত্তর দেখে, বুদ্ধ তখন রাজাকে বলতে লাগলেন, যে হস্তিনী তোমাকে একদিন সেবা যত্ন করেছিল, আজ সে বৃদ্ধা এবং জরাগ্রস্থ হয়ে পড়াতে সে তোমাকে আর পূর্বের মতো সেবা করতে পারছে না বলে তাকে অবহেলা করা ঠিক নয়। পিতা-মাতা সন্তানকে আদর-যত্নে লালিত-পালিত করেন। পরে যখন তাঁরা বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, তখন আর তাঁদের সে সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু তাই বলে কি সন্তানের উচিত সেই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা করা? তাদের ভরণ-পোষণের দায়টুকু পর্যন্ত অস্বীকার করা? এর পরে তিনি রাজাকে উপদেশ দেবার জন্য পূর্বজন্মে সংঘটিত একটি কাহিনী বিবৃত করেন। সেই জাতক কাহিনী দৃঢ়ধর্ম জাতক কাহিনী (৪০৯) নামে পরিচিত হয়ে আছে। বুদ্ধের কথার পর রাজা হস্তিনীকে পুনরায় রাজকীয় হাতীশালে নিয়ে এসে তার উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থার জন্যে নির্দেশ দেন।

বুদ্ধের কৌশাম্বী থাকাকালে সেখানকার ভিক্ষুগণের মধ্যে বিনয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত-পার্থক্য দেখা দেয়। এর সূত্রপাত হয়েছিল অনেক পূর্বেই। ইতিপূর্বে বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়ে পথে আলবী নগরের নিকটবর্তী অগ্গালব চৈত্যে বাস করেছিলেন, তখন সেখানে তিনি বিনয় সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেন। যথা, বয়স্ক ভিক্ষুগণের পক্ষে, বিশবৎসরের নিম্নবয়স্কগণের সঙ্গে রাত্রিতে সকলে মিলে শয্যা গ্রহণ করা চলবে না। বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্তন করার পর বুদ্ধ পুত্র রাহুলকেও অন্যান্য ভিক্ষুগণ বললেন, এখন থেকে তোমার শয়ন ব্যবস্থা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। রাহুল তাতেই সানন্দে সম্মতি জানালেন। এমনিতেই রাহুল ছিলেন সকলেরই আজ্ঞাবহ। বুদ্ধের পুত্র বলে তিনি নিজের জন্যে কোন বিশেষ সুবিধা করে নিচ্ছেন এমন সন্দেহ যাতে কখনও কারুর মনে উদয় হতে না পারে, সেজন্য তিনি সর্বদাই অতিশয় সতর্ক থাকতেন। যখন রাত্রিতে তাঁর শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা তাঁকে নিজেকেই করতে হবে বলে জানান হল, তখন

রাহুল কি করতে হবে সে সম্বন্ধে আন্দাজ করে উঠতে না পারলেও তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। রাহুল তখনও বালক মাত্র ছিলেন। এতদিন পর্যন্ত বালক রাহুলের শয়ন স্থান অনান্য ভিক্ষুগণ স্থির করে দিতেন। কিন্তু যেদিন বুদ্ধ নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেন সেদিন আর তাঁরা রাহুলের জন্য শয়নের উপযুক্ত স্থান স্থির করে দিলেন না। এদিকে রাত্রিটুকু কাটাবার জন্যে শয়নের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে না পেরে অবশেষে বালক রাহুল বুদ্ধের বর্চকুটীরের (পায়খানায়) এসে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানেই সমস্ত রাত কাটালেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে বুদ্ধ বর্চকুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হলে, রাহুল সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধকে প্রণাম করলেন। তখন বুদ্ধ তাঁকে সেখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক রাহুল উত্তর দিলেন যে, শয়ন গ্রহণের উপযুক্ত স্থানের অভাবেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বুদ্ধ তখন দেখলেন যে, সংঘের মধ্যে যদি এমনি অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে কোন গৃহবাসী ভবিষ্যতে আর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করতে সাহস করবেন না। তিনি তখনি ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্তকে ডেকে সকলেই যাতে উপযুক্ত বাসস্থান পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে নির্দেশ দান করেন। কৌশাম্বীর বদরিকারামে অবস্থিতি কালে ধর্মসভায় একদিন সমবেত ভিক্ষুগণ বালক রাহুলের বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার কথা উল্লেখ করে যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, সে সময়ে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, রাহুল শুধু এজন্মেই নয় পূর্বেও সে বিনয়ের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিল। এই বলে তিনি বালক রাহুলের সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। রাহুলের সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত "ত্রিপর্যস্ত জাতক" নামে পরিচিত হয়ে আছে। কৌশাম্বী থাকাকালে বুদ্ধ ত্রিপিটকের বিনয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেন। সেই সকল বিনয় নিয়মের যথাযথ নিয়োগ ও তার পালন ব্যবস্থা নিয়ে ভিক্ষুগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ দেখা দেয়। ক্রমে সেই মতভেদ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে অন্তর্কলহে পরিণত হয়। বুদ্ধ কিছুতেই ভিক্ষুগণকে কলহ থেকে নিরস্ত করে শান্ত করতে পারলেন না। ভিক্ষুগণকে শান্ত করতে গিয়ে সেদিন তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু তো তাঁর মুখের উপরই বলে বসলেন, "আপনি চুপ করে থাকুন, যা ব্যবস্থা হয় আমরাই করবো"। শেষে অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, তাঁর পক্ষে আর সেখানে অবস্থান করা পর্যন্ত সম্ভব হল না। তিনি তখন একাকী আশ্রম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য মনস্থির করে নিলেন। যাবার পূর্বে বিবদমান ভিক্ষুগণকে শান্ত করবার জন্য তিনি আর একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি শান্ত করতে পারলেন না। তাঁদের ঔদ্ধত্য তখন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। বুদ্ধ তখন বিবদমান ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করে জানালেন, বিবাদের দ্বারা অথবা

শত্রুতার দ্বারা কখনও বিবাদের বা শত্রুতার নিষ্পত্তি হয় না। একমাত্র সহ্য গুণ এবং মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলে তবেই শত্রুতার পরাজয় ঘটে। প্রতি-মুহূর্তেই আমরা মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি। এই একটি মাত্র কথা স্মরণে রেখে যাঁরা কাজ করে চলেন, তাঁরা কখনই বিবাদে লিপ্ত হতে পারেন না। একমাত্র মূর্খ ব্যক্তিগণই জীবনের সেই চরম দিন ভুলে গিয়ে কলহে এবং বিবাদে লিপ্ত হয়। একাকী বনে বাস করবে, সেও বরং ভাল। কিন্তু নির্বোধ অথবা মূর্খ ব্যক্তিগণের সঙ্গে কখনই একসঙ্গে বসবাস করবে না। ভিক্ষুগণের প্রতি এই নির্দেশ রেখে বুদ্ধ আশ্রম ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন। বিবদমান ভিক্ষুগণ ঘোষিতারাম আশ্রমেই রয়ে গেল। তাদের মধ্যে সেদিন কেউই বুদ্ধের অনুগমন করেনি।

ঘোষিতারাম আশ্রম থেকে বহির্গত হয়ে বুদ্ধ গ্রামের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। লোনকার গ্রামের বিহারে তখন অবস্থিতি করছিলেন বুদ্ধ শিষ্য ভৃগু। ইনিও পূর্বে ছিলেন একজন শাক্যবংশীয় রাজকুমার। অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে অনুপিয় আম্রকাননে গিয়ে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন থেকেই ভৃগু লোনকার গ্রামের বিহারে এসে অবস্থিতি করছিলেন। ভৃগু দূর থেকেই বুদ্ধকে আশ্রমের দিকে আসতে দেখে, তাঁর জন্য আসন পেতে রেখে হাত-পা ধোবার জল পর্যন্ত এনে রেখেছিলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলে, ভৃগু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর হস্ত থেকে ভিক্ষাপাত্র চিবর প্রভৃতি গ্রহণ করেন। এর পর বুদ্ধ হাত-পা ধুয়ে আসন গ্রহণ করে তাঁকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর, সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে পুনরায় "প্রাচীনবংশ" নামে অপর একটি উদ্যান আশ্রমের দিকে যাত্রা করেন। এই রমণীয় বনভূমি ছিল কোশল রাজ্যের একটি সংরক্ষিত বনভূমি। সে প্রাচীন উদ্যানে আশ্রমে তখন শাক্যবংশীয় অন্যান্য রাজকুমারগণ যথা:— অনিরুদ্ধ, নন্দিয়, কিম্বিল প্রভৃতি অবস্থিতি করছিলেন। এরা সকলেই অনুপিয় আম্রকাননে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছিলেন। অনিরুদ্ধ ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পুত্র। রাজা শুদ্ধোদনের অপর আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে অমৃতোদন, ধৌতদন এবং সর্ব কনিষ্ঠ ঘাটিতোদন। পরবর্তীকালে বুদ্ধ অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বুদ্ধ যখন প্রাচীন বংশ উদ্যান আশ্রমের প্রবেশ পথের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সে সময় উদ্যানপাল তাঁকে উদ্যানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে জানালেন যে, সেখানে কয়েকজন শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী রয়েছেন। আপনার আগমনে তাঁদের কাজে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। উদ্যানপাল অনিরুদ্ধ প্রভৃতির নিকট থেকে তাঁদের গুরু বুদ্ধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক কথাই শুনেছেন, কিন্তু তাঁকে দেখার মতো সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তাই তিনি বুদ্ধকে চিনে নিতে সক্ষম হননি। উদ্যানে

প্রবেশ করতে নিষেধ করে উদ্যানপাল বুদ্ধকে যে সকল কথা বলেছিলেন, সেগুলো সবই শুনতে পেয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। তিনি তক্ষুণি ছুটে চলে এলেন সেখানে এবং সর্বপ্রথমে উদ্যানপালের নিকট বুদ্ধের পরিচয় প্রদান করে তারপর মহাসমাদরে তাঁকে নিয়ে এলেন তাদের কুটীরখানিতে। সেখানে ততক্ষণে নন্দিয় এবং কিম্বিলও এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সকলে মিলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বুদ্ধের আসন রচনা করে দিলেন। হাত-পা ধুয়ে বুদ্ধ সে আসনখানিতে উপবেশন করে সর্বপ্রথমে তঃাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তাদের প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তোমরা এখানে সকলে মিলে একতাবদ্ধ হয়ে আছ কি? বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে অনিরুদ্ধ জানালেন যে, তাঁরা সকলে মিলে-মিশে সেখানে একই সঙ্গে রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার কলহ অথবা বিবাদ নেই। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রত্যেকেই একে অপরকে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ এবং সমীহ করে চলেন। অনিরুদ্ধের কথা শুনে বুদ্ধ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ঘোষিতারাম আশ্রমের বিবদমান ভিক্ষুগণের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই তাঁদের নিকট উত্থাপন করলেন না। এর পর বুদ্ধ তাঁদের সঙ্গে ধর্ম সম্বধে আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করে পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করে নিকটবর্তী পারিলেয় নামক স্থানের দিকে পদযাত্রা আরম্ভ করেন। বেশ খানিকটা পথ অতিক্রান্ত হবার পর অবশেষে তিনি পারিলেয় গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

পারিলেয় গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতি মনোরম। কৌশাম্বী থেকে এই গ্রামখানির যথেষ্ট দূরত্ব ছিল। পারিলেয় গ্রামখানির নিকটেই রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল রক্ষিতারাম আশ্রমখানি। পারিলেয় গ্রামে বুদ্ধকে স্বাগত জানাবার জন্যে সেখানকার লোকেরা দলে দলে এসে সমবেত হলেন বুদ্ধের নিকটে। বুদ্ধ তাঁদের সেই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। প্রত্যহ বৈকালিক ধর্মসভায় তিনি সমবেত নরনারীকে ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দানে তাঁদের মুগ্ধ করতেন। সেই স্থানের এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহের অনেকেই যাঁরা ইতিপূর্বে বুদ্ধের নামই শুনেছেন, অথচ তাঁর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হননি, এবার তাঁরা সকলেই দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলেন বুদ্ধকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে, এবং তার নিকট থেকে ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্যে। বুদ্ধকে দর্শন করার পর এবং তাঁর মুখে ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধ যে কদিন পারিলেয় গ্রামে ছিলেন, সে কদিন প্রত্যহই অগণিত নরনারী এসে তাঁর ধর্মসভায় উপস্থিত হতেন এবং তাঁর মুখ থেকে ধর্মালাপ শুনতেন। তাঁরা বুদ্ধের জন্যে রাশি রাশি ফলমূলও এনে উপস্থিত করতেন। তাঁদের আনীত সেই সব ফলমূল বুদ্ধ গ্রহণ করতেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলো বুদ্ধের আসনের সন্নিকটে ক্রমেই স্তূপীকৃত হয়ে উঠতো। যে বৃক্ষমূলে উপবেশন

-করে বুদ্ধ সমবেত নরনারীকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন, সেই বৃক্ষে একটি বানর বাস করতো। ভক্তবৃন্দ প্রতিদিন যে সমস্ত ফলমূল এনে বুদ্ধকে অর্ঘ্য হিসেবে প্রদান করতেন, বানরটি বৃক্ষ শাখা থেকে প্রতিদিন মনোযোগসহকারে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতো। একদিন বুদ্ধ সভায় উপস্থিত নরনারীগণকে যখন ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করছিলেন, এবং সকলেই যখন গভীর আগ্রহ সহকারে একাগ্রচিত্তে সেই অমৃতোপম ধর্মকথা শ্রবণ ও গ্রহণ করেছিলেন, এমন সময়ে সেই বানরটি সেই ধর্মসভায় উপবিষ্ট শত সহস্র নরনারীর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে মধুপূর্ণ একটি বিশাল মৌচাক নিয়ে এসে উপস্থিত হল। তারপর সে মৌচাকটিকে মানুষের মত দুহস্তে ধারণ করে দু'পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সোজা চলে গেল একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে। তারপর সেই মধুপূর্ণ মৌচাকটিকে মানুষের মতই নিবেদন করার ভঙ্গিতে বুদ্ধের প্রতি প্রসারিত করে দিল। বুদ্ধ স্মিতমুখে দুহস্তে বানরটির নিকট থেকে সেই মৌচাকটিকে গ্রহণ করলেন। মৌচাকটিকে বুদ্ধের হস্তে সমর্পণ করে দিয়ে বানরটি যেভাবে সর্বসমক্ষে সভায় এসে উপস্থিত হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই আবার ধীরে ধীরে সভামণ্ডপ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বুদ্ধের জীবনের কোন অলৌকিক ঘটনা এটি মোটেই নয়। অবিশ্বাস্য হলেও এটি একটি সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা। বানর কর্তৃক মৌচাক প্রদানের এই ঘটনাটি বুদ্ধের জীবনের প্রধান আটটি ঘটনার অন্যতম বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। সুবিখ্যাত সাঁচী স্তুপের প্রধান প্রবেশ পথটির দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভগাত্রে এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে সুন্দর একখানি চিত্র (relief) খোদিত রয়েছে। বুদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীন বৌদ্ধরীতি অনুসারে চিত্র মধ্যে বুদ্ধকে প্রদর্শিত করা হয়নি। সেখানে পরিবেশিত হয়েছে বানরটি মানুষের মত দুপায়ে ভর করে দুই হস্তে মধুপূর্ণ মৌচাকটি বুদ্ধকে নিবেদন করতে উদ্যত হয়েছে।

পারিলেয় গ্রামে কয়েকদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ এবার সে স্থান ত্যাগ করে রক্ষিতারামের নিকটস্থ এক গভীর অরণ্যের মধ্যে একাকী প্রবেশ করেন। সেখানে একটি প্রাচীন ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে আসন পেতে সেই আসনে অবস্থিতি করতে থাকেন। সেখানে নিকবর্তী স্থানসমূহের কোথায়ও কোন মনুষ্যের বসতি ছিল না। সুতরাং বুদ্ধের পক্ষে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামাঞ্চলে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং সেই বনের মধ্যে বুদ্ধের পক্ষে আহার্য বস্তু সংগ্রহ করার কোন উপায়ই রইলো না। সেই গভীর অরণ্য থেকে একটি বিশালকায় হস্তী এসে উপস্থিত হল বুদ্ধের সম্মুখে। হস্তীটি বুদ্ধের সম্মুখে এসে শুণ্ড উত্তোলন করে প্রথমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলো। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় রইলো। তার ভাবখানা এই যে, প্রভুর আজ্ঞা পালনের নিমিত্তই যেন সে এভাবে দণ্ডায়মান থেকে অপেক্ষারত রয়েছে। বুদ্ধ হস্তীটিকে কোন নির্দেশ দান করলেন না।

তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় নিজের আসনটিতেই উপবিষ্ট অবস্থায় রইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই হস্তীটি সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় বনের মধ্যে চলে গেল। এবং তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার একটু পরে সে পুনরায় ফিরে এল। এবার সে শুধু শুধু ফিরে আসেনি। বনের মধ্য থেকে কয়েকটি সুমিষ্ট ফল সে বুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। এবার সে সেই ফলগুলোকে বুদ্ধের সম্মুখে নিবেদনের ভঙ্গীতে শুণ্ড দ্বারা এগিয়ে দিল। বুদ্ধ হস্তীটির প্রতি সস্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর তার নিকট থেকে সেই সুমিষ্ট ফলগুলো গ্রহণ করলেন। এর পর হস্তীটি পুনরায় বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে হস্তীটি পুনরায় এসে উপস্থিত হল বুদ্ধের নিকটে। এবারেও সে বন থেকে অনেকগুলো সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। বুদ্ধ সেই ফলগুলো গ্রহণ করলেন। ফলগুলো দান করার পর সে পুনরায় বনের মধ্যে চলে গেল। দ্বিপ্রহরের খানিক পূর্বে সে পুনরায় এসে উপস্থিত হল। এবারে কিন্তু সে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেনি। এবারে সে শুণ্ডে করে পার্বত্য ঝরণার স্বচ্ছ জল নিয়ে এসেছে। সেই জল বুদ্ধের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে সে বুদ্ধকে স্নান করিয়ে দিল। বুদ্ধ যতদিন সেই ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করছিলেন, ততদিন পর্যন্ত হস্তীটি একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল। সেই হস্তীটির সেবা-যত্নের ফলে মনুষ্যবর্জিত সেই নিবিড় অরণ্যের মাঝেও বুদ্ধের কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি।

এদিকে ঘোষিতারাম আশ্রমে বুদ্ধের অনুপস্থিতির সময়ে যখন সকলেই জানতে পারলেন যে, ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদের ফলে এবং বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের ফলেই তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করে অন্যত্র নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়েছে, তখন কৌশাম্বীর জনগণ ভিক্ষুগণের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। বুদ্ধের আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পরের দিনই যখন ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্যে নগরে গিয়ে উপস্থিত হল, তখন কৌশাম্বীর কোন নগর-বাসীই তাদের ভিক্ষান্ন পরিবেশন করলেন না। ভিক্ষুগণ দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোন গৃহ থেকেই একমুষ্টি আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়নি। এভাবে বৃথা ঘুরে ঘুরে দিনের শেষে তারা ফিরে এল ঘোষিতারাম আশ্রমে। সেই দিনটি তাদের সম্পূর্ণ উপবাসের মধ্যেই কেটে গেল। পরের দিনও তাদের ভাগ্যে ওই একই অবস্থা দেখা দিল। কৌশাম্বীর কোন গৃহস্থই তাদের এক-মুষ্টি আহার্য বস্তু দান করলেন না। পর পর কয়েকদিন এভাবে অনাহারে কাটাবার পর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এবারে সত্যি সত্যিই তাদের মনে সুবুদ্ধির উদয় হল। এবারে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলো যে, বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তারা কত বড় ভুল এবং অন্যায় করেছেন। তখন সকলেই অনুতপ্ত হৃদয়ে বুদ্ধের

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করবার জন্যে একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোথায় তিনি? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তাকে? তখন ভিক্ষুগণ সকলে মিলে ঠিক করলেন যে, এতদিন তিনি নিশ্চয়ই তার প্রিয় আশ্রম জেতবনে চলে গিয়েছেন। তখন ভিক্ষুগণ সকলে মিলে বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে জেতবনের আশ্রমের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন।

বুদ্ধ কয়েকদিন অরণ্যের মাঝেই সেই ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করার পর সেখান থেকে পুনরায় শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি যখন অরণ্য থেকে চলে আসেন তখন সেই হস্তীটি খানিকটা ব্যবধানে দণ্ডায়মান থেকে একদৃষ্টে তাঁর প্রতি তাকিয়েছিল। তার দুচক্ষু প্লাবিত করে তখন কেবল অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল। বুদ্ধ সস্মিত মুখে হস্তীটিকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানালেন। অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন; ততক্ষণ পর্যন্ত হস্তীটি একদৃষ্টে তাঁর প্রতি তাকিয়ে ছিল। অবশেষে তিনি শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলে, ঘোষিতারামের অনুতপ্ত ভিক্ষুগণও তাঁর অন্বেষণে সকলে মিলে সেখানে এসে উপস্থিত হন। অনুতপ্ত ভিক্ষুগণ এবার সকলে মিলে বুদ্ধের চরণপ্রান্তে পতিত হয়ে তাদের পূর্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ভিক্ষুগণ! তোমরা আমার উপদেশ শুনে এবং সেই অনুসারে চলে তোমরা সকলেই আমার পুত্র স্থানীয় হয়েছ। তোমরা সর্বদাই মনে রাখবে যে, পিতা যে উপদেশ প্রদান করেন, পুত্রের পক্ষে তা লঙ্ঘন করা কখনই উচিত নয়। তোমরা কিন্তু এখন আমার উপদেশ মেনে ঠিকমত পথে অগ্রসর হচ্ছ না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনও পিতামাতার উপদেশ লঙ্ঘন করতেন না। এই বলে তিনি প্রাচীনকালের দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনী তাদের নিকট ব্যক্ত করেন। সেই কাহিনী "দীর্ঘিতি কোশল" জাতক (৩৭১) কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। ইতিপূর্বে তিনি কৌশাম্বীর ঘোষিতারামের ভিক্ষুগণকে কলহ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে তাদের নিকট একখানি জাতক কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। সেই কাহিনীটি 'কৌশাম্বী জাতক' কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেই জাতক কাহিনী শুনেও সেদিন বিবদমান ভিক্ষুগণ আত্মকলহ থেকে নিজেদের মুক্ত করকে পারেননি। যার ফলে সেদিন তাঁকেই আশ্রম ত্যাগ করে সরে আসতে হয়েছিল।

বিবদমান ভিক্ষুগণকে শান্ত করার পর বুদ্ধ প্রায়ই জেতবন বিহার থেকে দূরে বনের মধ্যে একাকী প্রবেশ করে কোনো বৃক্ষমূলে উপবেশ করে ধ্যান গম্ভীর অবস্থার মধ্য দিয়ে সেখানেই দিবাভাগের অধিকাংশ সময়টুকু অতিবাহিত করতেন। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়লে ধীরে ধীরে এসে তিনি উপস্থিত হতেন আশ্রমে এবং প্রাত্যাহিক ধর্মসভায় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। এভাবেই বেশ কিছুদিন চলছিল। বুদ্ধের বনমধ্যে থাকাকালীন সময়ে সেখানেও কয়েকটি ছোটখাট ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। বুদ্ধ যে বনমধ্যে গিয়ে প্রবেশ

করতেন, সেই বনমধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের কয়েকটি গরু প্রবেশ করে সেগুলো নিখোঁজ হয়ে যায়। তিন চার দিন কেটে যাবার পরও গরুগুলো গোয়ালে ফিরে আসেনি। তখন ব্রাহ্মণীর তাড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করে গরুগুলোর খোঁজ করতে থাকেন। ক্রমে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের নিকটে। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন স্নিগ্ধ শান্ত মূর্তিখানি দেখে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাক্য বেরিয়ে পড়লো" আহা! এর সংসারের কোন ভাবনা নেই। নেই কোন চিন্তা। ইনি কত সুখী" ব্রাহ্মণের এই কথাগুলো গিয়ে বুদ্ধের কানে প্রবেশ করলো। বুদ্ধ তখন ব্রাহ্মণের কথা কয়টিরই প্রতিধ্বনি করে বলে উঠলেন, হে ব্রাহ্মণ! গরু হারানোর দুশ্চিন্তার জ্বালা আমার নেই। নেই সংসারের কোন ভাবনা। আমার ঘাড়ে কোন ঋণের বোঝাও নেই। তাই আমি সুখী। বুদ্ধের কথাগুলো ব্রাহ্মণের কানে নতুন করে বেজে উঠলো। সামান্য এই কটি কথা যেন তার সমস্ত প্রাণ-মন একেবারে উতলা করে দিল। ব্রাহ্মণ একেবারে চলৎ-শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। বুদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তিনি তাঁর আশ্রয় কামনা করলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করে ভিক্ষুত্বে বরণ করে নিলেন। ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণ কায়মনোবাক্যে বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হলেন বন্ধনমুক্ত পুরুষ। লাভ করলেন অর্হত্ত্ব।

গুরুর জন্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্য জনৈক আচার্যের কয়েকজন ছাত্র বনমধ্যে প্রবেশ করে উপযুক্ত বৃক্ষের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের সম্মুখে। বুদ্ধ তখন একটি বৃক্ষতলে ধ্যানগম্ভীরভাবে অবস্থান করছিলেন। সেই নির্জন বনের মধ্যে একাকী অমন শান্ত-সৌম্য সুপুরুষ মানুষটিকে ধ্যান-গম্ভীর অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেই কিশোর ছাত্রগণের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। খানিকক্ষণ ধরে তাঁরা অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ধ্যানগম্ভীর মানুষটির প্রতি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে ফিরে গেলেন তাঁদের আচার্যের নিকট। তাঁরা তাঁদের আচার্যকে জানালেন সেই অদ্ভুত মানুষটির কথা। ছাত্রগণের মুখে সব কথা শুনে তাঁদের আচার্য তখন তাঁদের সম্বোধন করে বলে উঠলেন, আমাকে তোমরা নিয়ে চল সেই ধ্যানগম্ভীর অদ্ভুত মানুষটির নিকটে। অবশেষে ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর মূর্তিখানির সম্মুখে। সেই নির্জন বনের মধ্যে বুদ্ধের সেই অনির্বচনীয় ধ্যানমগ্ন রূপ দেখে ব্রাহ্মণ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেই অদ্ভুত মানুষটির সাহচর্য লাভ করার জন্যে তিনি একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন। বুদ্ধকে সম্বোধন করে তিনি বলে উঠলেন, হে সন্ন্যাসী, এই শ্বাপদসঙ্কুল নির্জন বনের মধ্যে আপনি এমনিভাবে কি করে অচঞ্চলভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন? এখানে নিকটে কোথায়ও তো জনমানবের চিহ্নমাত্রও নেই। আপনি কি তাহলে সিদ্ধ-

লাভের আশায় এখানে তপশ্চর্যা করছেন ? ব্রাহ্মণের কথা শুনে বুদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন এবং অর্ধ নীমিলিত নয়নে ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, হে ব্রাহ্মণ ! আমি ইতিপূর্বেই তৃষ্ণা সঞ্জাত সর্বপ্রকার কামনার অতীত হয়ে সম্বোধি লাভ করেছি। তাই আমি এখন নির্জন বনে নির্ভয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকি। বুদ্ধের কথা শুনে আচার্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। বুদ্ধের কথার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন তিনি এবং তখনই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করলেন।

কোশল রাজ্যের কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এক ব্রাহ্মণ কাষ্ঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধকে একদিন দেখতে পেলেন। সেই নিবিড় বনের মধ্যে বুদ্ধকে একাকী নিশ্চিন্তভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সেই ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন যে, কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্যে তাকে কেবল বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়, আর এই সন্ন্যাসী মানুষটি কিসের আশায় এখানে এই নিবিড় বনের মধ্যে এভাবে একাকী বসে রয়েছেন ? কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এখানে এই অরণ্যের মধ্যে একাকী বসে থেকে কি কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন। ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ তাকে জানালেন, কর্মের প্রেরণাদায়িনী যে তৃষ্ণা, তাকে তিনি ইতিপূর্বেই হৃদয় থেকে সমূলে উৎপাটিত করে তুলে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং তার পক্ষে এমন করণীয় বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। জীবনের বাকী দিন কটিকে কাটিয়ে দেবার জন্যেই এখন তাকে এই নির্জন বনভূমিতে এসে মুক্ত মন নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। বুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং তখনই তিনি তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন।

মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা বুদ্ধের দর্শন লাভের জন্য এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা গ্রহণ করবার জন্যে প্রায়ই জেতবন বিহারে এসে উপস্থিত হতেন। একদিন বিশাখার পাঁচশত সখী তাঁকে তাদের সঙ্গে সুরাপানোৎসবে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালো। বিশাখা তাঁর সখীদের এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না। তিনি তাঁর সখীগণকে বিদায় জানিয়ে বুদ্ধের ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে বিশাখার সেই পাঁচশত সখী আকণ্ঠ সুরাপানে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে, একেবারে উন্মত্ত অবস্থায় তাদের সখী বিশাখার অনুসরণে বুদ্ধের ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হয়। প্রমত্ত অবস্থায় তারা বুদ্ধের সম্মুখেই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অশ্লীল আচরণ ও ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলে বুদ্ধ তাদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্য স্বীয় ঋদ্ধি বল প্রকাশ দ্বারা অদ্ভূত এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সেই রমনীগণের প্রাণে যুগপৎ বিস্ময় ও ত্রাসের উৎপাদন করে তাদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। মুহূর্তের

মধ্যে সেই রমনীগণের প্রমত্তাবস্থা দূর হয়ে গেল এবং তারা যখন বুদ্ধের শরণ কামনা করলেন, বুদ্ধ তখন তাদের ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং সেই সঙ্গে সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধেও উপদেশ দান করে তাদের সতর্ক করে দেন। বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করার ফলে সেই রমনীগণ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। এরপর বিশাখা বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, যে পানীয় দ্রব্য পান করলে লোকে এতদূরে হীন এবং নিলর্জ্জ হয়ে পড়ে, সে বস্তুর উৎপত্তি কবে থেকে হল এবং কেমন করে তা সম্ভব হল। বিশাখার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ তখন এক অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। সেই অতীত বৃত্তান্তের বিষয়বস্তু 'কুম্ভ জাতক' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

ইতিপূর্বে ঘোষিতারাম আশ্রমে অবস্থানকালে বুদ্ধ একদিন ধর্মসভায় সমবেত ভিক্ষু ও ভক্তগণের নিকট সুরাপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু স্থবির স্বাগতের লজ্জাহীন আচরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, কেউ যদি সুরাপান করে তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেই থেকে এটি বিনয়ের একটি সূত্র হয়ে আছে।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে একবার বর্ষাবাস শেষ করে ভিক্ষাচর্যা করতে করতে শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী ভদ্রবাটিকা নামক নগরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর নিকট থেকে ধর্মকথা শুনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এরপর বুদ্ধ সেখান থেকে আম্রতীর্থক নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলে, ভদ্রবাটিকার সকলেই তাঁকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে নিষেধ করে বলেন যে, সেখানে একটি অতি ভয়ঙ্কর সর্প বাস করে। সুতরাং সেখানে গেলে ভিক্ষুগণের পক্ষে সে মহাঅমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বুদ্ধ তাদের নিষেধ বাক্য গ্রহণ না করে ভিক্ষুগণসহ আম্রতীর্থের পথে অগ্রসর হন। সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ ভিক্ষুগণসহ একটি উদ্যানে অবস্থিতি করতে লাগলেন। ঋদ্ধিবলসম্পন্ন স্থবির স্বাগত জটাধারিগণের আশ্রমে যেখানে নাগরাজের বাস ছিল, সেখানে তৃণাসন বিস্তার করে সেই আসনে উপবেশন করে অবস্থান করতে থাকেন। নাগরাজ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার তেজ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে, স্থবির স্বাগতও তার তেজ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। স্থবির স্বাগতের তেজের নিকট নাগরাজ পরাভূত হয়ে পড়ে। অবশেষে স্থবির স্বাগতের নিকট নাগরাজ শীলব্রত গ্রহণ করেন।

স্থবির স্বাগত কর্তৃক অতি ভয়ঙ্কর নাগরাজকে দমনের বার্তা অল্প সময়ের মধ্যেই দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়লো। তখন সকলেই স্থবিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। জনপদবাসীরা স্থবিরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তার জন্যে উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করে এনে দেন। সেই সুরাপান করে স্থবির একেবারে জ্ঞানহীন হয়ে উন্মত্তের ন্যায় নির্লজ্জ আচরণ

করতে আরম্ভ করলে, অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাকে ধরে তুলে নিয়ে এসে বুদ্ধের পাদমূলে স্থাপন করেন। কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় স্থবির পুনঃ পুনঃ অশ্লীল আচরণ করতে থাকে। অনান্য ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বুদ্ধ তখন বলেন, "দেখ এই ভিক্ষু পূর্বে আমাকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করতো, এখন সে তা করছে কি? এ কথার উত্তরে সকল ভিক্ষুই জানালেন, 'না প্রভু'। বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে পুনরায় বলেন, 'নাগরাজকে দমন করেছিল কে'? উত্তরে ভিক্ষুগণ জানালেন "এই স্থবির"। এর পর বুদ্ধ পুনরায় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন স্থবিরের যা অবস্থা তাতে কি সে একটি ডুণ্ডুভ (ঢোড়া) সর্পকেও দমন করতে পারে? তখন আবার সকলেই বলে উঠলেন, 'না প্রভু'। এরপর বুদ্ধ বলেন, তবেই দেখ, স্বাগতের ন্যায় একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সুরাপানে কতদূর অধোগামী হয়ে পড়ে। একথা বলার পর সুরাপানের কুফল সম্বন্ধে তিনি একটি অতীত ঘটনার উল্লেখ করে সকলকে অবহিত করেন। সেই অতীত কাহিনী 'সুরাপান জাতক' কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

জেতবনের ধর্মসভায় বুদ্ধের আগমন না হওয়া পর্যন্ত সমবেত ভক্ত ও ভিক্ষুদের মধ্যে প্রায় প্রত্যহই দৈনন্দিন ঘটনাবলী নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতো। পরে বুদ্ধ সভায় এসে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে তখন সকলেই তার উপদেশের প্রতীক্ষায় নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার বাক্যালাপ বন্ধ করতেন। মাঝে মাঝে বুদ্ধ সভায় আসার পথেও ভক্তগণের আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক সময় নিজেই শুনতে পেতেন। পরে সভায় এসে উপস্থিত হয়ে ভক্তগণের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পূর্বে অনুষ্ঠিত অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ তুলে সেগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। সেই সব জাতক কাহিনীর মধ্য দিয়েও তিনি উপদেশ প্রদান করতেন।

শ্রাবস্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর একটি আদরের পোষা বানর ছিল। সেই বানরটি ছিল অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির। শ্রেষ্ঠীর হস্তীশালায় ঢুকে একটি শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে সে নানাভাবে দৌরাত্ম্য চালাতো। এমন কি সেই নিরীহ হস্তীটির পৃষ্ঠে সে মলমূত্র পর্যন্ত ত্যাগ করতো। সেই হস্তীটি কিন্তু এত উৎপীড়নের পরেও বানরটির কোন প্রকার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেনি, নির্বিবাদেই সে বানরটির সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করতো। প্রত্যহই বানরটি এভাবে সেই শান্ত স্বভাব হস্তীটিকে জ্বালাতন করতো। কোন কারণ বশতঃ শ্রেষ্ঠী একদিন সেই হস্তীটির জায়গায় অন্য একটি হস্তীকে এনে রাখলেন। সেই হস্তীটির কিন্তু পূর্বের হস্তীটির ন্যায় সহনশীলতা ছিল না। সেই হস্তীটি একটু কোপন স্বভাবসম্পন্নই ছিল। বানরটি তার নিত্যকার অভ্যাস মতো সেদিন সেই হস্তীটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাকে অনুরূপভাবে উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করলে, হস্তীটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বানরটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে

ধরে তাকে পৃষ্ঠদেশ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে পদতলে পিষ্ট করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। বানরটির সেই শোচনীয় পরিণতির ঘটনাটিকে নিয়ে জেতবনের সেদিনকার ধর্মসভায় উপস্থিত ভিক্ষু ও ভক্তগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকলে, বুদ্ধ সে সময়ে এসে উপস্থিত হয়ে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, বানরটি কেবল এজন্মেই নয়, পূর্ব জন্মেও সে তার নিজের দুষ্কৃতির জন্যে অনুরূপভাবেই মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্বেও সে বানর হয়েই জন্মেছিল এবং বর্তমান কালের ন্যায় অনুরূপ আচরণের ফলে মহিষ কর্তৃক নিহত হয়েছিল। এই বলে তিনি বানরটির পূর্ব-জন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। সে কাহিনী 'মহিষ জাতক' কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। অজন্তার গুহায় মহিষ জাতক কাহিনী অবলম্বনে সুন্দর একখানি চিত্র রচিত রয়েছে। চিত্রমধ্যে দুরন্ত মহিষটি ভূপাতিত বানরটিকে ভীষণ শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করবার জন্যে উদ্যত অবস্থায় পরিবেশন করা হয়েছে। চিত্রমধ্যে পরিবেশিত বানরটির অসহায় ও করুণ অবস্থা প্রত্যেক দর্শনার্থীর মনেই করুণার উদ্রেক করে থাকে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। হস্তী কর্তৃক নিহত হয়ে বানরটি এবার সেই বাক্যটিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত করে গেল। পরজন্মেও তার স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

নতুন জীবদেহ লাভ করার পরেও স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এ রকম বহু ঘটনার উল্লেখ করতে পারা যায়। বুদ্ধ শিষ্য এবং যশোধারার অগ্রজ দেবদত্ত স্বয়ং তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবদত্ত জন্মে জন্মে বোধিস্বত্বরূপী বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিল, এমন কি একবার তার প্রাণ পর্যন্ত সংহার করেছিল। বুদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রবজ্যা গ্রহণ করার পরেও পূর্বজন্মের স্বভাব দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে সমর্থ হননি। স্থবির তিষ্য তার পূর্বজন্মের লোভ ত্যাগ করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত পুনরায় গৃহী হয়েছিল। স্থবির তিষ্য ছিলেন রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পুত্র। বেণুকুঞ্জে বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে তিনি তার নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার জন্যে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হল। কিন্তু তার পিতামাতা কিছুতেই তাকে সন্ন্যাসী গ্রহণের জন্যে অনুমতি দান করলেন না। পিতামাতার সম্মতি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি তখন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে তৈরী হলেন। পুত্রের অনমনীয় মনোভাব দেখে শ্রেষ্ঠী দম্পতি শেষ পর্যন্ত তাদের একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দান করতে বাধ্য হলেন। তিষ্য এরপর বেণুকুঞ্জে এসে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা এবং সেই সঙ্গে প্রবজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করেন এবং বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে চলতে থাকেন। বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে জেতবন বিহারে এলে তিনিও তার সঙ্গে জেতবন বিহারে চলে আসেন এবং ভিক্ষুধর্ম পালন করে ভিক্ষাশ্চর্যা দ্বারা দিনাতিপাত করতে থাকেন। এদিকে তিষ্যের অবর্তমানে তার পিতা-মাতা নিদারুণ মানসিক

যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। তাদের একমাত্র পুত্রের সংসার-ত্যাগ তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। পুত্রকে সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করিয়ে পুনরায় গৃহী করবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের একাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাদেরই একজন সুন্দরী দাসীকন্যা। সেই সুন্দরী দাসীকন্যাটি তিষ্যের পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব জানালো যে, যদি তার হাতে সব কিছু ব্যবস্থা অর্পণ করা হয় এবং কার্যসিদ্ধ হলে তাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে বরণ করে নেওয়া হয়, তবে সে একাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করে দিতে সমর্থ। শ্রেষ্ঠী দম্পতি আনন্দিত মনে তার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। সেই সুন্দরী দাসীকন্যা তখন নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হয়। তিষ্য যে পথে সাধারণতঃ ভিক্ষার জন্য বের হতেন, সেই পথের ধারে একটি গৃহে সাময়িকভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। তিষ্য ভিক্ষার জন্য সে গৃহের দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে, সেই দাসীকন্যা সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে তিষ্যের সম্মুখে এসে তাকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য এবং সুস্বাদু পানীয় প্রভৃতি প্রদান করতো। সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য এবং সুস্বাদু পানীয় গ্রহণ করে তিষ্যের অন্তঃকরণে দারুণ লোভ জন্মে। ভিক্ষার উদ্দেশ্যে সে তখন প্রায়ই সে পথে আসতে থাকে এবং দাসীকন্যার নিকট থেকে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে লোভের বশে সে দাসীকন্যার একান্ত বশীভূত হয়ে পড়ল। দাসীকন্যা তখন একদিন উপযুক্ত সুযোগ বুঝে তিষ্যকে নিয়ে শ্রাবস্তী ত্যাগ করে রাজগৃহে ফিরে এলো। তার উদ্দেশ্য সফল হল। যেদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে তিষ্য আশ্রমে আর ফিরে এলো না, সেদিন আশ্রমে অন্যান্য ভিক্ষুগণ তিষ্যের খোঁজ করতে গিয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হয়ে আশ্রমে ফিরে এসে সে সব তথ্য জানালেন বুদ্ধকে। ভিক্ষুগণ তিষ্যের সংঘ ত্যাগে বিস্ময় প্রকাশ করলে, বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তিষ্য কেবল এজন্মেই নয়, পূর্ব জন্মেও সে একবার নিদারুণ লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেকে ধরা দিয়েছিল। এই বলে তিনি তিষ্যের সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত তাদের নিকট উদ্ঘাটন করেন। তিষ্যের সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত "বাত মৃগ" জাতক কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দান করেছিলেন। ভিক্ষুণী পরে সংঘের অনুশাসিকার (Monitress) পদ প্রাপ্ত হন। যথাসময়ে তিনি উপসম্পদাও লাভ করেন। কিন্তু উপসম্পদা লাভের পর তিনি আর পূর্বের মত বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলতেন না। কোথায় গেলে উত্তম আহার্য বস্তু সংগ্রহ সম্ভব হবে কেবল সে চেষ্টাই করতেন। ক্রমে তিনি শ্রাবস্তী নগরীর এমন একটি লোকালয় আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন, যেখানে গেলে উত্তম আহার্য বস্তু এবং সুস্বাদু পানীয় গৃহস্থগণের নিকট থেকে সহজেই লাভ করা যায়। তিনি প্রায় প্রত্যহই

ভিক্ষাশ্চর্যায় বের হয়ে সেই অঞ্চলটিতে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং লোকেদের নিকট থেকে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করে নিজ উদরপূর্তি করতেন। পাছে অপর কেউ সেই অঞ্চলটির সন্ধান পায় এবং সেখানে গিয়ে তার প্রাপ্য বস্তুর উপর ভাগ বসায়, সে জন্য তিনি সর্বদাই সে পথের সম্বন্ধে নানা প্রকার বিপদের আশংকার অবতারণা করে অপর সকলকে সে পথে যেতে নিষেধ করতেন। অন্যান্য ভিক্ষুণীরা অনুশাসিকার নিষেধ বাক্য মেনে নিয়ে নিজেরা কখনও সে পথে ভিক্ষাশ্চর্যায় যেতেন না। কথায় বলে লোভীর শাস্তি বিধান স্বয়ং ভগবান করেন। সেই ভিক্ষুণী একদিন উত্তম আহার্য বস্তুর লোভে একটি নির্দিষ্ট বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালে একটি বিশালকায় ভেড়া তার পিছন দিক থেকে এসে প্রচণ্ড রকমের একটি ঢুঁ মেরে তাকে একেবারে ভূপাতিত করে ফেলে দেয়। ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায় এরপর সকলে মিলে তাকে আশ্রমে নিয়ে এলে তখন সকলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে, তিনি অপর সকলকেই বিপদের আশংকা আছে বলে যেখানে যেতে এতদিন ধরে নিষেধ করে এসেছেন, তবে আজ তিনি নিজে বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও সেখানে গেলেন কেন? তখন প্রকৃত তথ্য আর গোপন রইলো না। তখন ভিক্ষুণীরা সকলে মিলে সেই ভিক্ষুণীর ব্যবহার নিয়ে পরিহাস করতে আরম্ভ করেন। কথাটি ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। ক্রমে সেটি রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং ভিক্ষু সংঘেরও সকলেই সেই ভিক্ষুণীর লোভের পরিণাম সম্বন্ধে অবগত হলেন। সেদিন বৈকালিক ধর্ম-সভায় উপস্থিত ভক্ত ও ভিক্ষুগণ যখন এই ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কৌতুকমিশ্রিত আলাপ আলোচনা করছিলেন এবং শেষে ভিক্ষুণীর পরিণামের জন্যে দুঃখও প্রকাশ করছিলেন, সে সময় বুদ্ধ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য করে জানালেন যে, এই ভিক্ষুণী কেবল এ জন্মেই নয় পূর্বেও সে একবার অনুরূপ লোভের বশবর্তিনী হয়ে তার নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই বলে তিনি সেই ভিক্ষুণীর পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন। সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত "অনুশাসিক জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

দশম বর্ষাকাল রাজগৃহে উদ্‌যাপনের জন্যে বুদ্ধ শ্রাবস্তী থেকে সদলবলে সেখানে চলে আসেন। রাজগৃহে আসার পর একদিন তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দক্ষিণগিরির অন্তর্গত একখানা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ভরদ্বাজবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য দ্বারা নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের জীবিকা অর্জন করতেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে অমন সুন্দর সুস্থ সবল মানুষটিকে দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, আপনি কেন ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করেন? তারপর আবার বললেন, আমি যেমন ভূমি কর্ষণ করে শস্যোৎপাদন করি এবং তদ্বারা নিজের এবং পরিবার-

বর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করি, আপনিও তো সেরূপ কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করতে পারেন। তবে কেন ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে চলেছেন? ব্রাহ্মণের প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমিও ভূমি কর্ষণ করি, ধ্যান আমার বৃষ্টি। বিনয় আমার লাঙ্গল। মন আমার যুগ। ধারণা আমার ফলক। সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র। বীর্য আমার বলীবর্দ। এ দ্বারা আমি নির্বাণরূপ শস্য উৎপাদন করে থাকি। এই কটি কথার মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে সবকিছু অবহিত করলেন। বুদ্ধের কথায় ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শরণ কামনা করলেন।

বুদ্ধ এরপর রাজগৃহের আরও একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ত্রিরত্নের শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। ইনি হলেন কূটদন্ত। ইনি ছিলেন মগধ রাজ্যের একজন শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। এর শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। সমগ্র মগধ রাজ্য জুড়েই ছিল এঁর খ্যাতি। মগধ রাজ্যের অনেক বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও এঁর শিষ্য ছিলেন। স্বয়ং নৃপতি বিম্বিসার পর্যন্ত এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। রাজগৃহেই ইনি বাস করতেন। বুদ্ধ যখন জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে কিছুদিনের জন্যে অবস্থিতি করছিলেন, সে সময়ে ইনি একটি বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। যজ্ঞে উৎসর্গ করবার জন্যে বহু প্রাণী সংগৃহীত হয়েছিল। বুদ্ধ তাঁর বাসস্থানের নিকটে অবস্থান করছেন জেনে, সেই ব্রাহ্মণ একদিন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কূটদন্ত তাঁর আশ্রমে এসেছেন শুনে বুদ্ধ নিজে গিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে গন্ধকুঠীতে নিয়ে আসেন। সেখানে উভয়ে আসন গ্রহণ করে, পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে কথা শুনে ব্রাহ্মণ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এদিকে তাঁর যজ্ঞের দিন সমাগত। সুতরাং যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন যে, যথাবিহিত শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞ সম্পাদন করতে হলে কোন্ কোন্ বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে কত পশুবলি দেবার প্রয়োজন? ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে বুদ্ধ জানালেন যে "প্রকৃত যজ্ঞ বলতে পশু বধ নয়। দানই হল প্রকৃত যজ্ঞ এবং প্রকৃত যজ্ঞ বলতে গেলে একমাত্র দানকেই বুঝায়"। যিনি দানের সাহায্যে পরের অভাব মোচন করতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পশু বধ দ্বারা সেকাজ সম্পন্ন হয় না। বুদ্ধের কথায় জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণ পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। সেখানে সেই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই তিনি ত্রিরত্নের শরণ উচ্চারণ করে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্রোতাপত্তি ফলও লাভ করতে সমর্থ হলেন।

এরপর ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যবর্গকেও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবার জন্যে তাদের নির্দেশ দান করেন।

এর পরের বর্ষাকালটাও বুদ্ধ রাজগৃহেই অতিবাহিত করেন। পরে দ্বাদশ বর্ষাকালটা বৈরন্তী নগরে অতিবাহিত করবেন বলে তিনি রাজগৃহ থেকে সদলবলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৈরন্তী নগরে দ্বাদশ বর্ষা উদ্‌যাপন করে তিনি একদল ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে এবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হলেন। দেশ ভ্রমণ বলতে আজকালকার যুগে সাধারণতঃ যা বোঝায়, বুদ্ধের যুগে দেশভ্রমণ ঠিক সেই রকমটি ছিল না। কোন সংঘারামে বর্ষার সময়টা অতিবাহিত করে অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি থেকে আরম্ভ করে আশ্বিনী পূর্ণিমার তিথি পর্যন্ত সময়টা কাটিয়ে পরে শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলিতে তিনি সদলবলে এক লোকালয় থেকে নিকটবর্তী অপর লোকালয়ে ক্রমাগত পদযাত্রা করে বেড়াতেন এবং সেই সব লোকালয়ের নরনারীগণের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে তাদের ধর্ম পিপাসা মেটাতেন এবং সেই সঙ্গে তাদের অধিকাংশকেই দীক্ষা দান করতেন। তাঁর ধর্মচক্রও ছিল একটিই। ভিক্ষুগণকেও তিনি এভাবেই ধর্মপ্রচার করতে নির্দেশ দিয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। সারনাথেই তিনি সর্বপ্রথম এই প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর শিষ্যগণের নিকট। তবে এবার বৈরন্তী নগর থেকে তিনি যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়েছিলেন, তা ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক আকারের। এভাবে পদযাত্রা করতে আরম্ভ করে তিনি তার সুবিশাল ভিক্ষু সংঘ পরিবৃত্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন সাকেত নগরের নিকটবর্তী অঞ্জন বনে। সেখানে তিনি সশিষ্য কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন তিনি সদলে সাকেত নগরে প্রবেশ করেছিলেন, সে সময়ে এক নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। সাকেত নগরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক ব্রাহ্মণ সে সময়ে নগরের বাইরে কোথাও কোন কার্যোপলক্ষে যাচ্ছিলেন। সে সময়ে তিনি বুদ্ধকে দেখতে পেলেন। বুদ্ধকে দেখামাত্রই সেই ব্রাহ্মণ একেবারে দিশেহারার মত অবস্থায় ছুটে এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের সম্মুখে। বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়েই সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের ন্যায় অনুযোগের সুরে বুদ্ধকে বলেন, তুমি এতদিন পর্যন্ত আমাদের দর্শন দাওনি কেন বলতো? বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাযত্ন করা কি পুত্রের কর্তব্য নয়? আগন্তুক ব্রাহ্মণের এধরনের অদ্ভুত কথাবার্তা ও আচরণ প্রত্যক্ষ করে ভিক্ষুগণ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। এর পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে বলেন "চল তোমার মাতাকে একবার দর্শন দেবে এস"। এই বলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বুদ্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁরা ব্রাহ্মণের গৃহের নিকটে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণী দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাঁর নিকটে দাঁড়ালেন। তারপর আনন্দের আবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বলতে

লাগলেন, এতকাল কোথায় ছিলিরে বাবা ? বৃদ্ধ বাপ-মায়ের কথা কি একবারও মনে পড়ে না ? একবারও কি তাদের দেখতে ইচ্ছা করে না ? এরপর ব্রাহ্মণী বুদ্ধকে বসার জন্য আসন দান করে, তাঁর পুত্র-কন্যাদের উদ্দেশ্য করে বলেন "তোরা আয়, তোদের দাদাকে প্রণাম কর" এই বলে ব্রাহ্মণী তাঁর পুত্র-কন্যাদের এনে বুদ্ধের পাদমূলে স্থাপন করলেন। পুত্র-কন্যাগণ মায়ের আদেশ পালন করে সবিস্ময়ে বুদ্ধকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তারা এর মর্মার্থ কিছুই অবগত হতে সক্ষম হয়নি। উপস্থিত ভিক্ষুগণ উপস্থিত ভিক্ষুগণও তেমনি নির্বাক বিস্ময়ের সঙ্গে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই বুদ্ধকে পুত্রবৎ স্নেহ-যত্ন করে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। তাদের প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে সশিষ্য বুদ্ধও সন্তুষ্ট হলেন। এরপর বুদ্ধ সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর নিকট জরাসূত্র (সূত্র নিপাতের সূত্র বিশেষ) ব্যাখ্যা করেন। তা শ্রবণ করে উভয়েই অনাগামি ফল লাভ করেন। এরপর তাঁদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে বুদ্ধ পুনরায় সশিষ্য অঞ্জনবনের আশ্রমে চলে আসেন। সেদিন বৈকালিক ধর্ম-সভায় উপস্থিত ভিক্ষু ও ভক্তগণ এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, বিস্মিত হন এই ভেবে যে, 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, বুদ্ধ তাঁদের পুত্র নয়, তাঁর পিতা-মাতা রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়া' তা সত্ত্বেও কি করে তাঁরা উভয়েই বুদ্ধকে তাঁদের নিজেদের পুত্র বলে দাবী করলেন এবং বুদ্ধই বা কেন তা নীরবে মেনে নিলেন। এ সময়ে বুদ্ধ সভায় উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুগণের আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে তাদের সম্বোধন করে জানালেন যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই তাঁদের পুত্রকেই সমাদর করেছেন। এই বলে তিনি তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী "সাকেত জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেই জাতক কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন যে, অতীত জীবনে তিনি বহুবার এই ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্বজন্মের স্মৃতি তাঁরা বিস্মৃত হননি বলেই তাঁরা পুনরায় তাদের পুত্রকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। অঞ্জন-বন ত্যাগ করে তিনি তাঁর সুবিশাল ভিক্ষু সংঘ নিয়ে পুনরায় গ্রামের পর গ্রাম এবং নগরের পর নগর পর্যটন করতে থাকেন। তিনি যেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতেন, সেখানকার আবাল বৃদ্ধ নরনারী এসে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতো। সেই সব স্থানে সামান্য কয়েকদিন অবস্থান করে, ধর্ম সম্বন্ধে তাদের অবহিত করে এবং অগণিত নরনারীকে দীক্ষা দান করে তিনি পুনরায় নিকটবর্তী অন্য লোকালয়ের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়তেন। এভাবে তখনকার দিনের উত্তর ভারতের বহু গ্রাম, জনপদ এবং নগর অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন সেকালের জ্ঞানার্জনের পীঠস্থান তক্ষশীলা নগরে। তক্ষশীলার ন্যায় এতবড় বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র সে যুগে ভারতবর্ষে আর ছিল না। বহু জাতক কাহিনীতেও তক্ষশীলার নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীর

আগমন হ'ত সেখানে। সেখানে সর্ববিষয়েই বিদ্যালাভের সুযোগ ছিল। তক্ষশীলায় পৌঁছে বুদ্ধ সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ধর্মপ্রচার করে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকেই, বিশেষ করে তক্ষশীলার পণ্ডিত সমাজের প্রায় সকলকেই দীক্ষা দান করেছিলেন। তক্ষশীলার নৃপতিও বুদ্ধের উপদেশ শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় জেতবন আশ্রমের উদ্দেশ্যে সশিষ্য প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরবার পথে তিনি তখনকার দিনের ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরে ও জনপদে উপস্থিত হয়ে, সে সকল স্থানে অগণিত নরনারীকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে তাদের মুগ্ধ করেন। এভাবে তিনি সাঙ্কাশ্যা, কান্যকুব্জ, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করে, অবশেষে পুনরায় মৃগদারে এসে উপস্থিত হন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে সেখান থেকে বৈশালীর কুঠাগার মহাবিহারে চলে আসেন। এরপর চালিকা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখানে ত্রয়োদশ বর্ষাকালটা অতিবাহিত করেন।

চালিকায় এয়োদশ বর্ষাকালটা অতিবাহিত করে শরতের সময়ে তিনি জেতবন আশ্রমে চলে আসেন এবং সেখানে তিনি চতুর্দশ বর্ষা উদযাপন করেন। এসময়ে রাহুলের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর হয়েছিল। সুতরাং এবারে সে উপসম্পদা লাভের উপযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধ রাহুলকে উপসম্পদা দান করবার জন্যে সারীপুত্তকে নির্দেশ দেন। সারীপুত্ত বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে রাহুলকে উপসম্পদা দান করেন। রাহুলের উপসম্পদা পর্ব নিষ্পন্ন হবার পর বুদ্ধ কপিলাবস্তু গমন করেন এবং ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে অবস্থিত করেন। বুদ্ধ যখন কপিলাবস্তু গমন করেছিলেন, সে সময়ে তার মাতুল এবং শ্বশুর কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধও রাজকার্য উপলক্ষে কপিলাবস্তু গমন করেছিলেন। সুপ্রবুদ্ধ তার নিজের জামাতা বুদ্ধকে কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারে নি। বুদ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। বুদ্ধের সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদবাণী তার অজানা ছিল না। সেজন্যই বুদ্ধকে জামাতা হিসাবে গ্রহণ করতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। যখন তাঁর নিজেরই কন্যা যশোধারা কুমার গৌতমকে ভিন্ন অপর কাউকেই পতিত্বে বরণ করবেন না বলে দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তখন আর তার পক্ষে করার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জামাতার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের কোন পরিবর্তন পরবর্তীকালেও দেখা দেয়নি। বরং তা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিই পেয়েছিল। এর মূলে ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র দেবদত্ত অন্যান্য শাক্যবংশীয় রাজকুমারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনুপিয় আম্রকাননে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা এবং প্রবজ্যা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন বলে।

কন্যা যশোধারার বিবাহের পর থেকে জামাতার সঙ্গে সুপ্রবুদ্ধের বড় একটা সুসম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। জামাতার সঙ্গে সুপ্রবুদ্ধের দেখা-সাক্ষাৎও বড় একটা

ঘটে নি। বিবাহের পর কুমার গৌতমও কখনও শ্বশুরালয়ে গমন করেছিলেন বলে কোথাও কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। শাক্য ও কৌলিয়গণের মধ্যে রোহিণী নদীর জল বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে একবার বিবাদ দেখা দিলে, তা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে কেবল একবার তিনি রোহিণী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরালয়ে গমন করেন নি। কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধ ছিলেন অতিমাত্রায় সুরাপায়ী। কপিলাবস্তুতে এসেও তিনি তাঁর সেই অভ্যাসটিকে ত্যাগ করতে পারেন নি। একদিন বুদ্ধ তাঁর সঙ্গী আনন্দের সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যখন পথে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ে পথে তাঁর সঙ্গে অকস্মাৎ সুপ্রবুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। অতিমাত্রায় সুরাপান করে একেবারে প্রমত্ত অবস্থায় রথারোহণে সুপ্রবুদ্ধ চলেছিলেন কপিল রাজপুরী অভিমুখে। এমন সময়ে জামাতার সঙ্গে তাঁর পথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। জামাতাকে দেখতে পেয়ে তিনি সারথিকে রথ থামাতে নির্দেশ দিলেন। তার পর রথ থেকে ভূমিতে অবতরণ করে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় কর্কশ ও অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করে তাঁকে গাল-মন্দ জানিয়ে পুনরায় রথারোহণে রাজপুরী অভিমুখে রওনা হয়ে যান। বুদ্ধ কিন্তু সুপ্রবুদ্ধের গাল-মন্দের প্রত্যুত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। কেবল আনন্দকে উদ্দেশ করে জানিয়েছিলেন যে তিনি (সুপ্রবুদ্ধ) জানেন না যে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তার পায়ের নিচের ভূমি বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সেই ভূমি তাঁকে গ্রাস করবে। এ কথা কটি কিন্তু সুপ্রবুদ্ধ শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়ে জামাতার প্রলাপ বাক্যকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জামাতার বাক্য তাঁর অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল। সাতদিন পর্যন্ত তিনি রাজপুরীর বাইরে কোথায়ও যান নি, এবার তিনি বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন মনে করে যেমন রাজপুরীর বাইরে চলে এলেন, সে সময়ে ভীষণ শব্দ করে তাঁর পায়ের নিচেকার ভূমি বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং সেই বিদীর্ণ ভূমি তাঁকে গ্রাস করে নিল।

সুপ্রবুদ্ধের দণ্ডলাভের পর বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ন্যগ্রোধারামের আশ্রম থেকে পুনরায় জেতবনের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি রাজগৃহের কলণ্ডক নিবাপের আশ্রমে (বেণুকুঞ্জর আশ্রমে) সপ্তদশ বর্ষা উদযাপন করবার জন্যে জেতবনের আশ্রম ছেড়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং রাজগৃহের পথে আলবী (অটবী) নামক স্থানে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আলবী ছিল শ্রাবস্তী এবং রাজগৃহের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী একটি সুসমৃদ্ধ জনপদ। আলবী নগরের উপকণ্ঠে এক নরমাংসভোজী যক্ষ বাস করতো। সুযোগ পেলেই সে অসতর্ক পথিকের প্রাণান্ত করে, সেই পথিকের মাংসে নিজের উদর পূর্তি করতো। বুদ্ধ আলবীতে এসে উপস্থিত হলে, আলবীর জনগণ বুদ্ধের নিকট যক্ষের উপদ্রবের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। যক্ষের উপদ্রবের কথা শুনে বুদ্ধ সেই যক্ষকে

দমন করতে মনস্থ করেন। নগরের উপকণ্ঠে যেখানে যক্ষের বাস ছিল, নির্জন সন্ধ্যায় একদিন তিনি একাকী সেই পথ ধরে চলতে আরম্ভ করেন, দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে যক্ষ তাঁকে নিধন করবার আশায় দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধেয়ে এল। কিন্তু কিছুতেই সে বুদ্ধকে তার নাগালের মধ্যে পেল না। বুদ্ধ হেঁটে হেঁটে চলেছেন অথচ যক্ষ প্রাণপণ ছুটেও তাঁর নিকট আসতে সক্ষম হল না। বুদ্ধের সঙ্গে তার দূরত্ব পূর্বের মতোই রয়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করে দৌড়াবার ফলে অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত যক্ষ ভূমিতে পতিত হল। বুদ্ধ তখন ধীরে ধীরে তার নিকট এগিয়ে গেলেন। অমন সুন্দর মানুষটিকে দেখতে পেয়ে যক্ষ একেবারে মোহিত হয়ে গেল। তার মন থেকে হিংসার ভাবও তখন দূর হয়ে গিয়েছিল। সে অবস্থায় যক্ষ বুদ্ধের চরণ আশ্রয় করে তাঁর শরণ কামনা করলো। এরপর বুদ্ধ তাকে নানাবিধ উপদেশ দান করে তাকে শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আলবী নগরবাসিগণ দুর্দান্ত যক্ষের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন। বুদ্ধের চরণ আশ্রয় করে নরমাংসভোজীরও পরিবর্তন ঘটে গেল। পালি সাহিত্যে এই যক্ষকে আলাবক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ এবার আলবী ত্যাগ করে সদলবলে রাজগৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বেণুকুঞ্জের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। বেণুকুঞ্জের আশ্রমে সপ্তদশ বর্ষা উদযাপন করে, পরের বর্ষা কালটা অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষা তিনি চালিকা নামক স্থানের আশ্রমে উদযাপন করেন। ঊনবিংশ বর্ষা উদযাপন করেন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে। পর পর এই তিন বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ঘটনা ঘটে নি। এরপর তিনি বিংশ বর্ষা উদযাপন করবার জন্যে পুনরায় চলে আসেন জেতবন বিহারে।

তাঁর এবারকার জেতবন বিহারে অবস্থানকাল নানাদিক থেকেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুসংঘের কর্মকাণ্ডের সব কিছুই নির্ভর করতো বুদ্ধের উপর। একমাত্র তাঁর নির্দেশেই এতদিন ধরে ভিক্ষুগণের সবকিছু পরিচালিত হয়ে আসছিল। আর সারীপুত্ত ছিলেন কেবল ধর্ম

বৌদ্ধ সাহিত্যে যক্ষগণের প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়। জাতকের অন্তর্গত বহু কাহিনীতে যক্ষগণের কথা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরা সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আদিম মানব গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় বিশেষ। যারা অবলীলাক্রমে নরমাংস ভোজন করতো। ইতিপূর্বে হারিতীর বেলায় একবার এদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বুদ্ধের সময় ভারতের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের অনেক স্থানেই এই ধরনের নরমাংসখাদক আদিম মানবগোষ্ঠীর বাস ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এদের উল্লেখ যথেষ্টই দেখা যায়। কালক্রমে এরা সভ্যজগতের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রাচীন অভ্যাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

সেনাপতি। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তদারক করবার মতো আর কেউ ছিলেন না। এবারে জেতবন বিহারে চলে আসার পর সংঘের আয়তন অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে, সংঘের তদারকির কাজকর্ম পরিচালনা করবার জন্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। বুদ্ধ সকল দিক বিবেচনা করে আনন্দকে সে ভার দেন। সেই থেকে আনন্দ সংঘের উপস্থায়ক (secretary) হিসাবে নিযুক্ত হলেন। আনন্দকে সংঘের উপস্থায়ক হিসাবে নিযুক্ত করাতে সংঘের ভিক্ষুগণ সকলেই তাতে সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপার নিয়ে কেউ কোন রকম আপত্তি উত্থাপন করে নি। আপত্তি জানিয়েছিলেন কেবল একমাত্র আনন্দ নিজে। কেন না তিনি তখনও অর্হত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন নি। বুদ্ধ আনন্দের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাঁকে জানালেন যে, যথাসময়ে তিনি অর্হত্ব লাভ করবেন, তখন আনন্দ নতুন পদ গ্রহণে আর কোন আপত্তি করেন নি।

এ সময়ে শ্রাবস্তীতে এক নতুন উপদ্রব দেখা দিল। শ্রাবস্তীর অদূরে এক অরণ্যের মধ্যে এক ভীষণ দস্যু এসে উপস্থিত হল। সে সাধারণ দস্যু ছিল না। পথিক জনকে হত্যা করে সে তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ না করে পথিক জনের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কেবল কেটে নিত এবং তা দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় পরতো। সেইজন্যে তার নাম দাঁড়িয়েছিল অঙ্গুলিমাল। তার প্রকৃত নাম ছিল অহিংসক। কোশল রাজের পুরোহিত ভার্গবের পুত্র সে। প্রবাদ আছে, যে মুহূর্তে অহিংসক ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে সময়ে কোশল রাজের অস্ত্রাগারে রক্ষিত রাশি রাশি অস্ত্র-শস্ত্রের সুতীক্ষ্ন ফলা থেকে অগ্নি উত্থিত হতে থাকে। তা দেখে অস্ত্রাগারের রাজকর্মচারিগণ রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েন এবং রাজাকে সেই অদ্ভুত সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। কর্মচারিগণের নিকট থেকে এই অত্যন্ত অশুভ এবং অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করে রাজা তক্ষুণি দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করে এর কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানান। রাজার অনুরোধে দৈবজ্ঞগণ এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গণনা করে তার ফলাফল রাজাকে জানিয়ে বলেন যে, পুরোহিত ভার্গবের সদ্যোজাত পুত্র ভবিষ্যতে এক মহা ভয়ঙ্কর নরহত্যাকারী দস্যু হবে এবং কোশল রাজ্যের বহু লোকের প্রাণহানি করবে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার তারই ইঙ্গিত বহন করছে। পুত্র ভবিষ্যতে এক মহা ভয়ঙ্কর দস্যু হবে এবং অগণিত লোকের প্রাণহানি ঘটাবে জানতে পেরে রাজপুরোহিত ভার্গব তখনই তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে বিনষ্ট করবার জন্য সঙ্কল্প করেন। স্বয়ং কোশল রাজের অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই নৃশংস সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ছেলেবেলা থেকে অহিংসক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ভার্গব তাঁর মেধাবী পুত্রকে অধিকতর বিদ্যালাভের সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে তাকে তক্ষশীলা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে অহিংসক উপযুক্ত

গুরুর সাহচর্যও লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার গুরু তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদর করতেন। অন্যান্য ছাত্রগণের তুলনায় অহিংসক অতি অল্প সময়েই বিভিন্ন শাস্ত্রে অদ্ভুত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন দেখে তার সহপাঠী ছাত্রগণ তার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা সকলে মিলে গোপনে চেষ্টা চালাতে থাকে কি করে অহিংসককে গুরুগৃহ থেকে বিতাড়িত করতে পারা যায়। অহিংসককে তাঁর গুরু অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন বলে গুরুপত্নীও তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করতেন। ঈর্ষাপরায়ণ সহপাঠিগণ অনন্যোপায় হয়ে শেষে গুরুপত্নীর প্রতি অহিংসকের আসক্তির কথা গুরুর কানে তুলে দেয়। গুরু অতগুলো ছাত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে অহিংসকের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি অহিংসকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে, তাকে আর তিনি বিদ্যা দান করবেন না। গুরুর কথা শুনে অহিংসক একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়ে। তারপর গুরুকে সে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল, যে কোন কার্য সমাধা করে দিলে তিনি তাকে পুনরায় বিদ্যাদান করবেন। অহিংসকের এ কথার উত্তরে তার গুরু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যঙ্গ করেই জানালেন, যে সহস্র লোককে হত্যা করে, সেই সমস্ত লোকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি মালা তৈরি করে এনে দিতে পারলে, তবেই তিনি তাকে পুনরায় বিদ্যা দান করবেন, নচেৎ নয়। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে, গুরুকে প্রণাম জানিয়ে অহিংসক তখনই গুরুগৃহ ত্যাগ করে স্বীয় জন্মভূমি কোশল রাজধানীর অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

নিজ জন্মভূমির প্রত্যন্ত সীমায় উপস্থিত হয়ে অহিংসক আর রাজধানীতে প্রবেশ করে নি, এমন কি নিজ গৃহে এসেও উপস্থিত হয় নি। নিকটবর্তী এক নিবিড় বনের মধ্যে নিজের জন্যে একটি আস্তানা ঠিক করে নিল। সেই বনের মধ্যে যেখানে রাজ্যের আটটি রাজপথ এসে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে পথিক জনের আনা-গোনা সব সময়ই প্রায় লেগে থাকতো, সেইখানে সে ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে দিল। অহিংসক সেখানে অসতর্ক পথিক জনের প্রাণসংহার করে তাদের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কেটে নিয়ে তাই দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরতো। এর ফলে লোকমুখে তার নাম দাঁড়িয়েছিল অঙ্গুলিমাল। অঙ্গুলি-মাল বড় ভয়ানক দস্যু। তার ভয়ে লোকেরা শেষে দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করতে লাগলো। তাতেও তাদের রক্ষে ছিল না। দলবদ্ধভাবে যাতায়াতকারী লোকদের মধ্যেও সে অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে অনেককে সংহার করতো, অঙ্গুলিমালের উপদ্রবের কথা ক্রমে কোশল রাজের কানে গিয়ে উঠলো। রাজা প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালের কাহিনী শুনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরই রাজধানীর প্রত্যন্ত সীমায় একজন দস্যু এইভাবে দিনের পর দিন সমানভাবে নরহত্যা করে চলেছে, এর একটা প্রতিবিধান তাকে অবশ্যই করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বুঝে নিলেন যে, অঙ্গুলিমাল একজন সাধারণ দস্যু নয়।

তাকে দমন করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশেষে তিনি সেনাপতিকে আহ্বান জানিয়ে, তাকেই অঙ্গুলিমালকে দমন করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাজাজ্ঞা গ্রহণ করে সেনাপতি অঙ্গুলিমালকে দমন করবার জন্যে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে সেই অরণ্যের পথে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এদিকে অঙ্গুলিমালকে দমন করবার জন্য রাজাজ্ঞার কথা সর্বত্র প্রচারিত হতে বেশী বিলম্ব হয় নি। অঙ্গুলিমালের বৃদ্ধা জননী শুনলেন রাজাজ্ঞার কথা। শুনে তার অন্তর কেঁপে উঠলো। পুত্র যতই অপরাধ করুক, তবুও সে জননীর স্নেহ বন্ধন থেকে কখনই বিচ্যুত হয় না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্রকে রক্ষা করবার জন্যে তাকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে নিজে একাকী চললেন সেই বন পথে। এদিকে অঙ্গুলি-মালের সহস্র অঙ্গুলি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে আর মাত্র একটি বাকী। আর একটি মাত্র নরহত্যা করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল এবং তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। তারপরেই সে সহস্র অঙ্গুলির মালা গেঁথে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করতে পারবে তার গুরুকে। তাই সে সকাল থেকে একান্ত উদগ্রীব চিত্তে পথিকের অপেক্ষায় নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে থাকে। কিন্তু তার অপেক্ষাই কেবল সার হল। কোন পথিকই সে পথ দিয়ে এল না। এমন সময়ে তার বৃদ্ধা জননী যষ্ঠীতে ভর করে অতিকষ্টে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। অঙ্গুলিমাল দূর থেকে দেখতে পেল সেই বৃদ্ধাকে। তার পর নিকটে এসে দেখতে পেল, সেই বৃদ্ধা অপর কেউ নন, স্বয়ং তারই জননী। এতদিন পরে জননীকে হঠাৎ সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার অন্তঃকরণ মুহূর্তের জন্যে একবার স্নেহার্দ্র হয়ে উঠলো। তার হস্তের উদ্যত খড়্গ ধীরে ধীরে নেমে এল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়লো গুরুর নির্দেশ, "সহস্র অঙ্গুলির মালা চাই।" গুরুর নির্দেশ মনে করতেই তেমনি মুহূর্তের মধ্যেই আবার অঙ্গুলিমালের মন থেকে জননীর প্রতি স্নেহ-মমতা সবকিছুই ধুয়ে মুছে গেল। গুরুর নির্দেশ তাকে রক্ষা করতেই হবে। জননীকে হত্যা করেই তাকে গুরুর নির্দেশ পূরণ করতে হবে। এর আর কোন অন্যথা নেই। অগত্যা জননীকে হত্যা করবার জন্যে খড়্গ উদ্যত করে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল অঙ্গুলিমাল।

বুদ্ধও শুনেছিলেন অঙ্গুলিমালের অত্যাচারের কথা। বুদ্ধ দেখতে পেলেন এই দুর্ধর্ষ দস্যু যত নরহত্যাই করুক না কেন, তার পূর্বজন্মার্জিত এমন সুকৃতি রয়েছে, যার ফলে সে অনায়াসেই অর্হত্ব পর্যন্ত অর্জন করতে সমর্থ। আর স্ব-ইচ্ছায় সে এই হত্যা যজ্ঞে লিপ্ত হয় নি। যেদিন অঙ্গুলিমালের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধানের জন্যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হল, সেদিন বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের উদ্ধারের জন্যে নিজে একাকী সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অঙ্গুলিমাল ততক্ষণে তার হস্তস্থিত খড়্গখানিকে উদ্যত করে একেবারে তার জননীর নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তার জননী বিগতপ্রাণা হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বেন, এমন সময়ে অঙ্গুলিমাল দেখতে পেল বুদ্ধকে।

সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে অঙ্গুলিমালের আনন্দের আর সীমা নেই। যাক এবার তাহলে আর নিজের জননীকে হত্যা করতে হবে না। এবারে সত্যি-সত্যিই তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হতে চলেছে। অঙ্গুলিমাল তখন জননীকে ত্যাগ করে সেই উদ্যত খড়্গ হাতে নিয়ে ধেয়ে যেতে থাকে সন্ন্যাসীর প্রতি। কিন্তু কি আশ্চর্য! অঙ্গুলিমাল কিছুতেই সন্ন্যাসীর নাগাল পেল না। প্রথমে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর প্রতি। তারপর দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলো। তারপর অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই সে সন্ন্যাসীকে তার নাগালের মধ্যে আনতে সমর্থ হল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দূরত্বের ব্যবধান প্রথম থেকে শেষ অবধি একই প্রকার রয়ে গেল দেখে, সে নিজেই বিস্মিত হল। যে অঙ্গুলিমালের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় বনের জীব-জন্তুরাও হার মেনে যেত, আজ সে দৌড়ে গিয়ে একটি সন্ন্যাসীকে ধরতে সমর্থ হল না। অথচ সন্ন্যাসী কিন্তু ধীরে ধীরেই হেঁটে চলেছেন। একি আশ্চর্য ব্যাপার! ইতিপূর্বে আলবীতে আলাবক যক্ষের যে অবস্থা হয়েছিল, এবারে অঙ্গুলিমালের বেলায়ও সেই একই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি হল। সন্ন্যাসীর নাগাল না পেয়ে, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে অঙ্গুলিমাল সেই বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানালো। সন্ন্যাসীও অঙ্গুলিমালের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে সাড়া দিয়ে তাকে জানালেন, "যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।" অঙ্গুলিমালের প্রতি এই নির্দেশ রেখে, বুদ্ধ তার দিকে তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকেন। বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের নিকটে এসে তার মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এ-কি করছ তুমি?' শুধু এই একটি মাত্র বাক্য কানে যেতেই অঙ্গুলিমাল একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বুদ্ধ তাকে ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনে অঙ্গুলিমাল একেবারে মোহিত হয়ে গেল। তার অন্তর থেকে সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সেখানে, সেই অরণ্যের মধ্যেই সে তখন বুদ্ধের পদতলে পতিত হয়ে তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করলো। বুদ্ধ তখন তাকে আদেশ দিলেন নিকটস্থ সরোবরে গিয়ে স্নান করে আসবার জন্যে। অঙ্গুলিমাল তখন নিজের গলদেশ থেকে অঙ্গুলির মালা দূরে জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করে সরোবরে অবগাহন করে তার পর বুদ্ধের নিকটে এসে উপস্থিত হলো। বুদ্ধ এবার তাকে দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা দান করে ভিক্ষু সংঘে স্থান করে দিলেন। নরহত্যাকারী ভয়ঙ্কর দস্যু অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের কৃপায় নবজন্ম লাভ করে হলেন ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল। তার প্রকৃত নামটি অবশ্য উহ্যই থেকে গেল। তার পিতৃদত্ত নামে কেউ কোনদিন তাকে সম্বোধন করে নি।

দস্যু অঙ্গুলিমালকে দমন এবং তার যথাযোগ্য দণ্ডবিধানের জন্য সেনাপতিকে নির্দেশ দান করে রাজা প্রসেনজিৎ দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে এসে উপস্থিত হলেন জেতবনে, বুদ্ধের আশ্রমে। বুদ্ধ তখন সবেমাত্র অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে

নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। রাজার চিন্তিত মুখ দেখে বুদ্ধ রাজাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, আজ আপনাকে এত চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে কেন? আপনার রাজ্যে কি কোন নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে? অথবা শাক্যকুলের সঙ্গে আপনার কি কোন বিবাদ দেখা দিয়েছে? বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে রাজা প্রসেনজিৎ জানালেন—না, সেরকম ধরনের কিছুই হয়নি। তবে রাজধানীর উপকণ্ঠে বনের মধ্যে এক অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির দস্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। লোকমুখে তার প্রচারিত নাম অঙ্গুলিমাল। প্রতিদিনই সে কোন না কোন পথিকের প্রাণ হরণ করে চলেছে। সেই দুর্দান্ত প্রকৃতিব দস্যুকে যথোপযুক্ত দণ্ড-বিধানের জন্যে সেনাপতিকে অদ্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণে সে হয়তো দস্যুর সন্ধানে সেদিকে চলেও গিয়েছে। রাজার কথা শুনে বুদ্ধ তখন রাজাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, যদি বলা হয় অঙ্গুলিমাল এখন আর দস্যু নয়, সে এখন একজন সামান্য ভিক্ষুমাত্র এবং সেই বেশেই যদি তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হয়, তাহলে আপনি তার প্রতি কিরূপ দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে রাজা প্রসেনজিৎ জানালেন যে, যদি অমন দুর্দান্ত প্রকৃতির দস্যুকে আপনি পরিবর্তিত করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করাতে পেরে থাকেন এবং সে যদি সত্যিই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে থাকে, তবে তার প্রতি দণ্ডাদেশের পরিবর্তে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদাই দেওয়া হবে। এবার বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। গুরুর নির্দেশে অঙ্গুলিমাল ধীরে ধীরে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মৌনভাবে দণ্ডায়মান হলেন। নর-হত্যাকারী দুর্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমালের মুণ্ডিত মস্তক এবং সন্ন্যাসীর বেশ দর্শনে রাজার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। আনন্দের আতিশয্যে রাজা তার রত্ন-খচিত বহুমূল্য তরবারিখানি অঙ্গুলিমালকে উপহার দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। রাজা তখন বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। নরহত্যাকারী দস্যুকে রূপান্তরিত করে তাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়েছেন। রাজা হিসাবে আমি একজন দস্যুকে সাজা দিতে পারি, তার প্রাণদণ্ড বিধান করতে পারি, তার অস্থিসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তার বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আপনি পারেন দস্যুকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত করতে। আপনার লীলা সত্যিই অদ্ভুত এবং তা বোঝা অসম্ভব।

নরহত্যাকারী দুর্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমাল রূপান্তরিত হয়ে একজন সামান্য ভিক্ষুতে পরিণত হল। এখন তাকে লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই ভিক্ষান্ন দ্বারাই এখন তাকে জীবন ধারণ করতে হবে। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে অঙ্গুলিমালের সম্বন্ধে ধারণা পূর্বের মতই রয়ে গিয়েছে। সে ভিক্ষু হওয়া সত্ত্বেও লোকে তার নামে একেবারে আঁৎকে ওঠে। তাই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

অঙ্গুলিমালের আগমন বার্তা শোনামাত্র পল্লীবাসী নরনারীগণ ভয়ে পলায়ন করতেন। তাকে ভিক্ষান্ন দেবার জন্যে কেউই উপস্থিত থাকতেন না। সুতরাং তার ভাগ্যে ভিক্ষান্ন বড় একটা জুটতো না। একদিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অঙ্গুলিমাল ভিক্ষাপাত্র হস্তে এক গৃহস্থের কুটীরের পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলেন। সেখান থেকে তিনি কুটীরের মধ্যে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর এক রমণীর আর্তনাদ শুনতে পেলেন। যে মানুষ নির্বিচারে শত শত লোকের প্রাণ সংহার করেছে, সেই মানুষ আজ প্রসব যন্ত্রণায় কাতর এক আর্ত রমণীর দুঃখে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার পক্ষে তো করণীয় কিছুই নেই। ক্ষুৎপিপাসা ততক্ষণে তার দেহ মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। অঙ্গুলিমাল দ্রুতপদে চলে এলেন আশ্রমে। নিবেদন করলেন বুদ্ধের নিকট সেই রমণীর অসহায় অবস্থার কথা। অঙ্গুলিমালের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বুদ্ধ তাকে আদেশ দিলেন, তুমি এক্ষুনি যাও, সেই কুটীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রমণীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ কর, যে জন্মাবধি আমি ইচ্ছাপূর্বক কোন জীবকে হত্যা করি নি এবং এখন ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পর যদি আমার সামান্য সুকৃতিও হয়ে থাকে, তবে সেই পুণ্যবলে আপনার প্রসব যন্ত্রণার উপশম হোক। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের নির্দেশ মেনে তক্ষুণি পুনরায় চলে গেলেন সেই গৃহস্থ বাড়ীর আঙ্গিনায়, এবং সেই কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর রমণীকে উদ্দেশ করে বুদ্ধের বচনগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর বলা শেষ হওয়া মাত্র সেই রমণী নির্বিঘ্নে পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। এই ঘটনার পর সমগ্র গ্রামবাসী গৃহস্থগণ সকলেই তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন, এবং তখন থেকে তাঁর ভিক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে আর কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নি। মাঝে মাঝে পূর্বকৃত অপরাধ স্মরণ করে তাঁর মনে বড় অনুতাপের সঞ্চার হত। অনুরূপ অবস্থায়, নিতান্ত কাতর হয়ে একদিন তিনি বুদ্ধের নিকটে এসে উপস্থিত হলে, বুদ্ধ তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন, গত জন্মের কথা স্মরণ করে দুঃখ পাওয়া তোমার পক্ষে উচিত নয়। এখন তোমার নবজন্ম লাভ হয়েছে। যে পথের সন্ধান পেয়েছ, এখন কেবল সেই পথেই এগিয়ে চল। নিজের ঐকান্তিক সাধনার বলে এবং বুদ্ধের কৃপাবলে অঙ্গুলিমাল অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরি-নির্বাণ লাভের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশনে একজন সদস্যরূপে তিনি যোগদান করেছিলেন।

অঙ্গুলিমালের মতো একজন দুর্দান্ত দস্যুকে বশ করে তাঁকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করানোর ফলে বুদ্ধের এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিষ্যগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি একদিকে যেমন বেড়ে যেতে লাগল, অপরদিকে তীর্থিকগণের প্রতিপত্তিও সেই পরিমাণে লোপ পেতে লাগল। এর ফলে স্বভাবতঃই তীর্থিকগণ বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যবর্গের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং রুষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁদের তখন একমাত্র চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল, কি করে বুদ্ধ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি খর্ব

করতে পারা যায়। রাজা প্রসেনজিতও মগধরাজ বিম্বিসারের ন্যায় বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত বলে পরিগণিত হয়েছেন। সুতরাং বুদ্ধ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে গেলে রাজ সমর্থন লাভ করা কখনই সম্ভব হবে না। ইতিপূর্বেও একবার তাঁর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কোশল রাজকে উৎকোচদানে বশীভূত করার পরেও জেতবনের সম্মুখে তীর্থিকগণের জন্যে আশ্রম নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। এখন অঙ্গুলিমালের রূপান্তরের পর থেকে রাজার নিকট বুদ্ধ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ই আর উত্থাপিত করা সম্ভব হবে না। আর এভাবে যদি দিন দিন বুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলতে থাকে, তবে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খদ্যোতের যে দশা দেখা দেয়, বুদ্ধের খ্যাতি বিস্তারের ফলে তাদের ভাগ্যেও হয়ত সেই দশাই অপেক্ষা করে বসে আছে। তখন তাঁরা একপ্রকার মরীয়া হয়েই বুদ্ধের চরিত্রে প্রকাশ্যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে, তাঁকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে নতুন করে চক্রান্ত জাল রচনায় মেতে উঠলেন। এবারে তীর্থিকগণের দুষ্কার্যে, সাহায্যের জন্যে নায়িকারূপে এগিয়ে এলো শ্রাবস্তীর অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী ধনাঢ্য বারাঙ্গনা 'সুন্দরী'। নাম দৃষ্টে মনে হয় সুন্দরী তার প্রকৃত নাম নয়। তার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে অবশ্য এর বেশী আর কিছু অবগত হতে পারা যায় না। কারণ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সর্বত্রই তাকে সুন্দরী নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এই বারাঙ্গনা ছিল তীর্থিকগণের ভক্ত এবং তাদের নিতান্ত বশংবদ।

তীর্থিকগণ একদিন সুন্দরীর সঙ্গে এমন কপট আচরণের অভিনয় করে বসলো, যার ফলে সুন্দরীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, ইচ্ছে করলে সে অনায়াসেই শ্রমণ গৌতমকে প্রলুব্ধ করে তার শ্রদ্ধার আসন থেকে তাঁকে টেনে একেবারে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে, এবং সর্বজনসমক্ষে নিতান্ত হেয় বলে প্রতিপন্ন করে তীর্থিকগণকে পুনরায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে। শুধু তার চেষ্টার অভাবের ফলেই তা এতদিন সম্ভব হচ্ছে না। তীর্থিকগণের এই কপট অভিনয় শেষ পর্যন্ত সুন্দরীকে বিচলিত করে তুললো। সে তক্ষুণি তীর্থিকগণের প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানিয়ে বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার জন্যে উৎসাহে একেবারে মেতে উঠলো। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের ফলে সে সেদিন জানতে পারে নি যে, তীর্থিকদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের জালে নিজেকে জড়িত করে পরিণামে সে তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছিলো।

নিজের দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতি সুন্দরীর ধারণা ছিল অপরিসীম। সে মনে করতো যে, তার মতো অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী নারী সে যুগে অপর কেউ ছিল না, এবং ইচ্ছে করলেই সে যে কোন পুরুষকে, এমন কি শ্রমণ গৌতমের মত পুরুষকেও অনায়াসেই তার একান্ত আজ্ঞাবহরূপে পরিণত করতে পারে। এই ভেবে সে পূর্বের নায়িকা চিঞ্চা মানবিকার ন্যায় জেতবনের আশ্রমের ধর্মসভায় নিয়মিত উপস্থিত হতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে এমন সব ভাব-ভঙ্গীমা প্রদর্শন

করতে আরম্ভ করে দিল, যাতে সাধারণের মনে স্বভাবতঃই একটা সন্দেহ জাগতে পারে। তার পূর্বের নায়িকা চিঞ্চার ন্যায় সে একেবারে সরাসরি বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়ে কোন প্রশ্ন কোনদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল বলে কোথায়ও কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। সুন্দরীর কু-কাজে সাহায্য করবার জন্যে অসাধু ও দুষ্ট প্রকৃতির একদল তীর্থিক যুবক সব সময়ের জন্যেই নিযুক্ত ছিল। সুন্দরী ধর্মসভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতো। তারপর অধিক রাত্রিতে একাকী সে জেতবন বিহার থেকে এমনভাবে নিষ্ক্রান্ত হ'ত, যাতে দর্শক মাত্রেরই মনে একটা সাধারণ কুৎসিত ধারণা জন্মে। সুন্দরীর এই নিতান্ত অসদৃশ আচরণ অনেক ভিক্ষুই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু মুখে তারা কোনদিনই এ ব্যাপার নিয়ে সুন্দরীকে কোন প্রশ্ন করেন নি। অথবা অপর কাউকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। এভাবে বেশ কিছুদিন ধরেই ধর্মসভায় সুন্দরীর আনাগোনা চলতে থাকে। এদিকে তীর্থিকগণের নিযুক্ত সাহায্যকারী অতি দুষ্ট প্রকৃতির যুবকগণের সংস্পর্শে আসার পর তাদের সাহচর্যে সুন্দরী ক্রমে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাবার পর কুচক্রী তীর্থিকগণ এবার পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের কার্যসিদ্ধির আশা নিয়ে আসরে নেমে পড়লো। তীর্থিকগণ তখন সেই দুষ্ট প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল যুবগণকেই সুন্দরীকে হত্যা করবার জন্যে নির্দেশ দিলো। দুষ্টের দল সেই নির্দেশমত কাজ শেষ করে। তারা সুন্দরীকে গলা টিপে হত্যা করে জেতবনের আশ্রমের পশ্চিম দিকের আবর্জনার স্তূপের উপর তার মৃত দেহটিকে এনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যায়। পরের দিন কুচক্রী তীর্থিকগণ তাদের নিরুদ্দিষ্টা প্রব্রাজিকার সন্ধানে জেতবন বিহারে এসে উপস্থিত হয়ে সর্বত্র তার খোঁজ করতে আরম্ভ করে দেয়। শেষে তারা রাজা প্রসেনজিতের নিকট উপস্থিত হয়ে রাজাকে জানালো যে, তাদের শিষ্যা, সুন্দরী জেতবন বিহার থেকে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে এবং তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা প্রসেনজিতের এক প্রশ্নের উত্তরে ধূর্তগণ রাজাকে জানায়, যে জেতবন বিহারে সে নিয়মিত বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতে যেত। কিন্তু গতকাল থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা প্রসেনজিৎ তখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধানগণকে আদেশ দিলেন সুন্দরীকে খুঁজে বের করবার জন্যে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধানগণ তখন সুন্দরীর খোঁজ করতে গিয়ে জেতবনের সেই আবর্জনার স্তূপের উপর থেকে তার মৃতদেহটিকে আবিষ্কার করলেন। এবার তীর্থিকগণ তাদের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃত্রিম ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লো। তারা তক্ষুণি একে শ্রমণ গোতমের কুকীর্তি বলে ঘোষণা করে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, যে শ্রমণ গোতম তার শিষ্যদের দিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করিয়ে এভাবে নিজের কুকীর্তি চাপা দেবার জন্যে অপচেষ্টা করেছেন। রাজা প্রসেনজিৎ কিন্তু সুন্দরীর প্রকৃত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করবার জন্যে এক অতি অভিনব পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি সুন্দরীর

মৃতদেহটিকে শ্মশানের একস্থানে একটি মঞ্চের উপর স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন এবং সেটিকে রক্ষা করবার জন্যে উপযুক্ত প্রহরার বন্দোবস্ত করলেন। এরপর তিনি তীর্থিকদের আদেশ দিয়ে বললেন তোমরা যাও, নগরের সর্বত্র প্রচার করতে থাক শ্রমণ গৌতমের কুকীর্তির কথা। রাজার আদেশে তীর্থিকের দল মহা উৎসাহে নগরের সর্বত্র সুন্দরীর হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচার করে শ্রমণ গৌতমের নামে কলঙ্ক কালিমা লেপন করতে আরম্ভ করে দেয়। শ্রাবস্তীবাসী সকলেই জানতে পারলেন সেই কলঙ্কের কাহিনী। এমন কি দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীদের কানেও গিয়ে পৌঁছাল সে কাহিনী। সকলেই তখন একবাক্যে শ্রমণ গৌতমের ও তাঁর শিষ্যদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এদিকে রাজা প্রসেনজিতের নিযুক্ত গুপ্তচর বিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ সজাগ দৃষ্টি নিয়ে শহরের সর্বত্র আনাগোনা করতে থাকেন। তীর্থিকগণের নিযুক্ত সেই দুষ্টচক্র যারা সুন্দরীকে হত্যা করেছিল তারা ততক্ষণে তাদের অপকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করেছিল, তাদের কর্তাব্যক্তিগণের নিকট থেকে। সেই অর্থ দ্বারা তারা প্রচুর পরিমাণে সুরা পান করে একেবারে প্রমত্ত অবস্থায় পৌঁছে, শেষে একে অপরের প্রতি সুন্দরীকে হত্যার দরুণ দোষারোপ করতে থাকে। ফলে রাজার নিযুক্ত গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারিগণ অতি সহজেই সুন্দরীর হত্যাকারী দলকে ধৃত করতে সমর্থ হন। গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারিগণ দুষ্টচক্রকে ধৃত করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই অবস্থায় এনে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করেন। দুষ্ট যুবকগণ রাজার নিকট আনীত হলে, রাজা তখন তাদের প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, "সুন্দরীকে হত্যা করবার জন্য তোমরা কাদের নিকট থেকে নির্দেশ পেয়েছিলে?" রাজার প্রশ্নের উত্তরে তখন সেই যুবকগণের মধ্য থেকে একজন সুন্দরীর হত্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য রাজাকে জানিয়ে বলে যে, শ্রমণ গৌতমের নামে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ সৃষ্টি করে তাকে জনসমক্ষে নিতান্ত হেয়প্রতিপন্ন ও অপদস্থ করার জন্যে তারা তীর্থিক গুরুদের নিকট থেকে সুন্দরীকে হত্যা করবার নির্দেশ লাভ করেছিল। এবারে রাজা প্রসেনজিৎ তীর্থিক গুরুদের তাঁর নিকট এনে উপস্থিত করার জন্যে কর্মচারীবৃন্দকে আদেশ দেন। রাজার আদেশ মত তীর্থিক গুরুদের রাজসভায় এনে উপস্থিত করা হলে, রাজা তাদের প্রশ্ন করেন, সুন্দরীকে এভাবে হত্যা করার জন্যে কেন তারা দুষ্ট যুবকগণকে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজদণ্ডের ভয়ে তখন তারা আর কোন কিছুই গোপন রাখতে সাহস করে নি। তারা তখন অকপটে নিজেদের চক্রান্তের সব কিছুই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল এবং রাজাকে জানালো যে, শ্রমণ গৌতমের নামে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা করে জনমানসের উপর তাঁর এবং সংঘের ভিক্ষুগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমূলে বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই সুন্দরীকে এভাবে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে তার মৃতদেহটিকে জেতবনের পশ্চিম-দিকের আবর্জনার স্তূপের উপর নিক্ষেপ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

রাজা প্রসেনজিৎ এবার তাদের উপযুক্ত দণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে তাদের আদেশ দিলেন, "যাও এবার তোমরা সকলে মিলে সুন্দরীর মৃতদেহটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে নগরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের কুকীর্তির কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে থাক।" রাজার আদেশে শেষ পর্যন্ত তাদের তাই করতে হয়েছিল। আর যারা সুন্দরীকে হত্যা করার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাদের প্রতি রাজা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দান করেছিলেন।

সুন্দরীর নিধনজনিত অঙ্কের পরিসমাপ্তির একদিকে তীর্থিকগণের যেমন দুর্নাম এবং অপযশ দিকে দিকে রটে গেল, অপরদিকে আবার তেমনি শ্রমণ গৌতমের ও তাঁর শিষ্যবর্গের গৌরব ও খ্যাতি শতগুণে বৃদ্ধি পেল। বলা বাহুল্য, সুন্দরীকে হত্যা করিয়ে তীর্থিকগণ নিজেদের চরিত্রে নিজেরাই দুরপণেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছিলেন। ইতিপূর্বে যারা বৌদ্ধ শাসনে প্রবেশ করেন নি এবার তারাও দলে দলে এসে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। শ্রাবস্তী নগরে তীর্থিকগণের যে কটি গণ্যমান্য শিষ্য ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এবার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তীর্থিকগণ পর পর দুবার বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই ভীষণভাবে সর্বজনসমক্ষে নিজেদের অপদস্থ করলেন। জেতবনের ভিক্ষুগণ একদিন ধর্মসভায় সমবেত হয়ে সুন্দরীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী নিয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধ ধর্মসভায় এসে তাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে, তাদের উদ্দেশে বলেন, "ভিক্ষুগণ! বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করা অসম্ভব। জাতিমণিকে (বৈদুর্যমণি) কলঙ্কিত করার চেষ্টা যেমন বিফল, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করার চেষ্টাও তেমনি বিফল। পূর্বে কেউ কেউ জাতিমণিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে তার ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।" এই বলে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত ভক্তজনের নিকট উদ্‌ঘাটন করেন। সেই অতীত বৃত্তান্ত "মণিশূকর জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

বুদ্ধের এবং তাঁর শিষ্যগণের ধর্মীয় আচরণের দিক থেকে কোন বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে কোথায়ও যাগযজ্ঞ, পশুবলি অথবা কৃচ্ছ্রসাধনের কোন নির্দেশ নেই। বুদ্ধের মতবাদের সারকথা হল সৎভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকে পঞ্চশীল ব্রত পালন কর এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করে নিজের পথে অগ্রসর হও। নিতান্ত সহজ সরল নির্দেশ ও ব্যবস্থা অনায়াসে সকলেরই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কোন বিষয় এতে স্থান পায় নি। বুদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যে যারা সন্ন্যাস নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছেন, তাদের ধর্মাচরণের পন্থাও সহজ এবং অত্যন্ত সরল। সেখানেও ধর্মীয় কোন আড়ম্বরের বালাই নেই। অপরদিকে তীর্থিকগণ ছিলেন কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী। তীর্থিক সন্ন্যাসিগণের অধিকাংশই পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত

ব্যবহার করতেন না। বিশাখার শ্বশুর মৃগার শ্রেষ্ঠী প্রথমে তীর্থিক নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্রের শিষ্য ছিলেন। নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র কখনও পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। বিবাহের পরে বিশাখা যখন শ্বশুরের গৃহে আগমন করেন, তখন সর্বপ্রথমে তাঁর শ্বশুর মৃগার শ্রেষ্ঠী তার পুত্রবধূকে গুরুর নিকট উপস্থিত করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিশাখা সেই বস্ত্রহীন গুরুকে দেখে, তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন বলে তাঁকে সেদিন যথেষ্ট অপদস্ত ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নি। বরং পরে বিশাখার চেষ্টায় তাঁর শ্বশুর নিজেরই ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে, পুত্রবধূর নিকট ক্ষমা চেয়ে পরে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মাচরণের নাম করে তীর্থিকগণ মাঝে মাঝে এমন সব উপায় অবলম্বন করে চলতেন, যার ফলে সাধারণ লোকের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। কোর ক্ষত্রিয় নামে একজন তীর্থিক সন্ন্যাসী সর্বদাই ভস্মদ্বারা নিজের দেহটিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখতেন, যার ফলে তাঁর মুখশ্রী সম্বন্ধে আন্দাজ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কোন ভোজ্যবস্তু ও পানীয় তিনি হস্তদ্বারা গ্রহণ করতেন না। চতুষ্পদ জন্তুগণ যেভাবে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে, ইনিও সেইভাবে কেবল মুখদ্বারা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতেন। শুধু সাধারণ মানুষ কেন, বুদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যেও কেউ কেউ এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিষয় দর্শনে নিজেরাও মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়তেন। সুনক্ষত্র নামে লিচ্ছবী বংশীয় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আড়ম্বরবিহীন শুদ্ধ সরল ভিক্ষু জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়েন এবং কোর ক্ষত্রিয়ের অস্বাভাবিক ধর্মাচরণের পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হয়ে শেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। বুদ্ধ সুনক্ষত্রের অভিলাষ অবগত হয়ে, একদিন তাঁকে জানালেন যে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই কোর ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ঘটবে এবং মৃত্যুর পর তার সদ্গতি হবে না। বুদ্ধের এই ভবিষ্যদবাণী ভিক্ষু সুনক্ষত্র তক্ষুণি কোর ক্ষত্রিয়কে জানিয়ে দিয়ে তাকে খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। বুদ্ধের ভবিষ্যদবাণী বিফল করার আশায় কোর ক্ষত্রিয় ক্রমাগত ছয়দিন পর্যন্ত অনাহারে থেকে অবশেষে সপ্তমদিনে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বরাহ মাংস ভক্ষণ করেন। ছয়দিন ক্রমাগত অনাহারে থাকার পর অবশেষে বরাহ মাংস ভক্ষণ করার ফলে তাঁর শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাধারণ লোকের স্বভাবজাত দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেও তীর্থিকগণ নানাভাবে চেষ্টা করতেন। তারা সর্বদাই এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকতেন যে, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যগণের চেয়ে তাঁরাই হলেন সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা যে ধর্মমত পালন করে চলেন, সেই ধর্মমতই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। বুদ্ধ নির্দেশিত সহজ সরল পথ যাতে সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে না পারে সেজন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এজন্য তাঁরা নানাপ্রকার কায়িক

পরিশ্রমের আশ্রয় নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে তা কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত বলে প্রচার করবার জন্যে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে কণ্টকময় শয্যা রচনা করে তার উপরে শয়ন করে কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা প্রদর্শন করতেন। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার অভ্যন্তরে অবস্থান করে পঞ্চাগ্নি সাধনায় নিযুক্ত হতেন। কেউ আবার উর্ধ্ববাহু হয়ে, নয়ত একপায়ে ভর করে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থান করতেন। ধর্মীয় আচরণের নামে এরকম ধরনের অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁরা জনসাধারণের নিকট নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যে সর্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন। একদিন কয়েকজন ভিক্ষু ভিক্ষাচর্যার পর জেতবনের আশ্রমে ফেরবার পথে, এ ধরতের কয়েকজন তীর্থিকের সাক্ষাৎ পান। আশ্রমে ফিরে এসে তারা তীর্থিকগণের এ ধরনের ধর্মাচরণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রথমে আলোচনা করতে থাকেন এবং এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে কোন প্রকার সুফল লাভ করতে পারা যায় কিনা সে সম্বন্ধে অবগত হবার জন্যে তাঁরা বুদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলে, বুদ্ধ তাঁদের পরিষ্কার ভাষায় সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে বলেন যে, তীর্থিকগণের এ সমস্ত কঠোর ব্রতের মধ্যে কোন বিশিষ্ট গুণ নেই, সুতরাং এ ধরনের ব্রত আচরণের দ্বারা কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। এর পর তিনি এ ধরনের আচরণের সম্বন্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে একেবারে মলস্তূপের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেন "এইরূপ তপশ্চারণ মলস্তূপের উপরিস্থ বর্ত্ম সদৃশ, কিংবা শশক শ্রুত ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ সদৃশ।" ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ সদৃশ শুনে ভিক্ষুগণ তখন নিতান্ত কৌতুহলের বশে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে, বুদ্ধ তখন তাঁদের নিকট এক শশকের কাহিনী তুলে ধরেন। সেই কাহিনী "দদ্দভ জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

অঙ্গদেশের এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে অনাথপিণ্ডদের এক কন্যার বিবাহ হয়। শ্বশুরালয়ে গমন করবার পর অনাথপিণ্ডদ কন্যা দেখতে পেলেন যে, তার শ্বশুরকুলের সকলেই আজীবকগণের শিষ্য। শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হবার পর থেকেই তিনি চেষ্টা করতে থাকেন কি করে শ্বশুরকুলের সকলকে বৌদ্ধ শাসন গ্রহণ করাবেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে শ্বশুরকুলের সকলেই তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁদের নিকট বুদ্ধের বাণী সকল নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এর ফলে তাঁর শ্বশুরকুলের সকলেই বুদ্ধের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনাথপিণ্ডদের কন্যার মনোবাসনা উপলব্ধি করে বুদ্ধ একদিন পঞ্চশত শিষ্য সঙ্গে নিয়ে ঋদ্ধিবলে আকাশ পথে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেই শিষ্যবর্গের সম্মুখে অনাথপিণ্ডদের কন্যার শ্বশুর-কুলের প্রায় সকলকেই দীক্ষা দান করেন। বুদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র অনিরুদ্ধও বুদ্ধের সঙ্গে অঙ্গদেশে অনাথপিণ্ডদের কন্যার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। শেষে অনাথপিণ্ডদের কন্যার অনুরোধে, অঙ্গদেশে বুদ্ধের বাণী

প্রচার করবার জন্যে অনিরুদ্ধকে অনুরোধ করা হলে তিনি তাতে সানন্দে নিজের সম্মতি জানিয়েছিলেন। শেষে অনিরুদ্ধকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশে রেখে বুদ্ধ অপর শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় আকাশ পথে শ্রাবস্তীতে ফিরে এলেন। বুদ্ধের বয়স তখন উনপঞ্চাশ।

বুদ্ধের উনপঞ্চাশ বছর বয়স থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ তেইশ বৎসর কালের ধারাবাহিক দৈনন্দিন অথবা অন্যান্য কোন ঘটনাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনের এই এতবড় দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন ঘটনাবলী তাঁর শিষ্যগণের মধ্যেও কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেন নি। অন্ততঃ সে ধরনের কোন কিছু পাওয়া সম্ভব হয় নি। পালি গ্রন্থাদিতে এখানে ওখানে দু'-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ ব্যতীত এত বড় দীর্ঘ সময়ের বুদ্ধ জীবনের ধারাবাহিক কোন বিবরণ পাবার উপায় নেই। যে কটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ পালি গ্রন্থাদিতে দেখতে পাওয়া যায়, সে ক'টিকেও সময় দ্বারা নির্দেশ করে একত্রে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। সে যাই হোক না কেন, এটা তো বাস্তব সত্য, যে বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচার করবার জন্যে জীবনব্যাপী নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন এবং সেজন্য একস্থানে দীর্ঘদিন ধরে একটানা অবস্থিতি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বর্ষার সময় ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য দিনগুলিতে তিনি সর্বদাই একস্থান থেকে অন্য স্থানে ক্রমাগত পদযাত্রা করে বেড়াতেন এবং অগণিত নরনারীর নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। যতদূর জানা সম্ভব হয় তাতে দেখা যায়, বুদ্ধ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানসমূহেই কেবল পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। তখনকার জম্বুদ্বীপের দক্ষিণে তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখনকার দিনে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত, দুর্গম বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তখনকার দিনে বিন্ধ্যপর্বত ছিল উত্তর ও দক্ষিণে যোগাযোগের পক্ষে মস্ত বাধার স্বরূপ। তবে বুদ্ধ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত কিছু কিছু অংশে গমন করেছিলেন

---

* আজীবক *

মস্করি গোশালিপুত্র নামে একজন তীর্থিক সন্ন্যাসী ছিলেন। দাসীগর্ভে এর জন্ম হয়। গোশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এর নামের সঙ্গে গোশাল কথাটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। জনশ্রুতি অনুসারে ইনি এক ধনী শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হন। একদিন ঘৃতপূর্ণ এক কলসী বহন করে নিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ ইনি ভূমিতে পতিত হন এবং ঘৃতপূর্ণ কলসীটি বিনষ্ট হয়। প্রভুর তিরস্কারের এবং লাঞ্ছনার ভয়ে ইনি প্রভুর গৃহ ত্যাগ করে চলে যান এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এর শিষ্য সম্প্রদায় আজীবক অথবা আজীবিক নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে এর কোন প্রকার সুখ্যাতি দেখতে পাওয়া যায় না।

বলে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতমালার কিছু কিছু অংশেও তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে মনে হয়। কেননা উৎকলখণ্ডের অসংখ্য নরনারী সে যুগেই তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন।

সম্প্রতি ১৯৮২ সালের ১লা জুন তারিখে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীজয়াবর্ধন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করে বলেন যে, বুদ্ধ নিজে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীলঙ্কার কয়েকটি প্রাচীন পালি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। তার মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম "মহাবংশ"। বুদ্ধ শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হয়ে যে সকল স্থানে অবস্থিতি করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে সেখানে উল্লেখ রয়েছে, এরকম তিনটি স্থানের উল্লেখও তিনি তাঁর ভাষণে করেছেন। সেই তিনটি স্থানের নাম যথাক্রমে শ্রীপদ, কেলানিয়া এবং মহিঅঙ্গনা। প্রচলিত মত অনুসারে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খৃঃ পূঃ তিন শত অব্দে শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সর্ব প্রথমে সেখানে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন এবং সেখানে বোধিবৃক্ষের একখানি শাখা রোপণ করেন। রাষ্ট্র প্রধান জয়াবর্ধনের মতে তারও দুশ বছর আগে স্বয়ং বুদ্ধই সর্বপ্রথমে শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ করেন এবং সেখানে উপস্থিত থেকে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন।

দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত অজন্তা শৈলশ্রেণীতে বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলোর সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছিল ভারতে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষের কাল থেকেই। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় দুশ বছর পরে অজন্তায় সর্বপ্রথম দুখানি গুহা তৈরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। অজন্তার গুহাগুলোর সৃষ্টির মূলে ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যোগাযোগকারী এবং যাতায়াতকারী বৌদ্ধশ্রমণ ও যাত্রিগণের বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত স্থানের সঙ্কুলান করা। বিশেষ করে বর্ষার সময়টির জন্যে। খৃষ্টের জন্মের দুশ বছর পূর্ব থেকে, খৃষ্ট পরবর্তী অষ্টম শতাব্দী কাল পর্যন্ত এই এক হাজার বছর সময়ের মধ্যে অজন্তায় বহু গুহা মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে চৌত্রিশটি বর্তমান রয়েছে। এগুলোর কোনটিই প্রাকৃতিক গুহা নয়। হাতুড়ী ও বাটালীর সাহায্যে শক্ত গ্রানাইট পাহাড়ের গা কেটে কেটে এই গুহামন্দিরগুলোর সৃষ্টি করা হয়েছিল। তখনকার দিনে আমাদের দেশের নাম না জানা শত সহস্র অতি কুশলী ও কর্মদক্ষ শিল্পীবৃন্দ সামান্য হাতুড়ী ও বাটালীর সাহায্যে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একান্ত নিষ্ঠা সহকারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শক্ত গ্রানাইট পাহাড়ের গা কেটে কেটে সুড়ঙ্গের মতো করে এই সকল অতি বিস্ময়কর গুহাগুলির সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের সৃষ্ট এই অজন্তার গুহা-গুলো শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশের এবং সর্বকালের বিস্ময়ের বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পর্বত শ্রেণীর গা কেটে এগুলোর

সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে সাধারণ অর্থে এগুলোকে গুহা নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এই গুহাগুলোর মূল বিষয়বস্তু বুদ্ধ এবং তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ। এ ছাড়া সেখানে অপর কিছুই স্থান লাভ করেনি। অজন্তার ভাস্কর্য ও অজন্তার চিত্রাবলী সবকিছুই বুদ্ধের জীবনাদর্শ অথবা তাঁর প্রবর্তিত মতবাদকে আশ্রয় করে নির্মিত বা রচিত হয়েছে। অজন্তায় বুদ্ধই প্রথম এবং একমাত্র বুদ্ধই সেখানে শেষ কথা।

অজন্তায় এমন অনেক চিত্র সম্ভার রচিত হয়েছে যেগুলো বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে রচিত হলেও সেগুলোর বিষয়বস্তু অথবা চিত্রে পরিবেশিত ব্যক্তিবর্গদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ও পরিচয় লাভ করা আজও সম্ভব হয়নি। সে সকল চিত্রের নেপথ্য পটভূমি অথবা স্থান-কাল সম্বন্ধেও সঠিকভাবে অবগত হওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং কোনদিন তা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। কেননা কোন পালি সাহিত্যে অথবা বৌদ্ধ গ্রন্থে সে সকল বিষয়বস্তুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই চিত্রগুলোকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন, তাদের সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে করণীয় বলতেও আর কিছুই নেই। এ রকম ধরনের বহু চিত্রই সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। সেই চিত্র সম্ভারসমূহের সকলের পরিচয় এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এক নম্বর গুহার দেয়ালে রচিত কয়েকটি চিত্র, যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে দাবী রাখে তাদের কয়েকটিকেই কেবল এখানে তুলে ধরা হল।

যে চিত্র সম্ভারখানি সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই চিত্র সম্ভারখানি একটি রাজকন্যার চিত্র। ইনি রাজকন্যা হলেও অন্ত্যজ বংশীয়া রাজকন্যা। চিত্র মধ্যস্থ রাজকন্যার বেশভূষা এবং দৈহিক অবয়ব প্রত্যক্ষ করে দর্শক মাত্রেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে ইনি শবর অধ্যুষিত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকন্যা। অজন্তার প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায়, এই চিত্র সম্ভারখানিকে "কৃষ্ণবর্ণা রাজকন্যা" (Black Princes) এই নামে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এই চিত্রখানিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে, এই চিত্রখানির বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করে গবেষক পণ্ডিতবর্গ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল ইনি একজন শবর রাজ্যের অধিপতির কন্যা। রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও সমাজের উচ্চবংশীয়-গণের সংস্পর্শে অথবা নিকটবর্তী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বুদ্ধ এসেছেন তাঁদেরই রাজ্যে, সেখানে এসে তিনি দিচ্ছেন ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ। দলে দলে অগণিত গ্রামবাসী এসে সমবেত হয়েছেন বুদ্ধের চরণ তলে। তাঁর মুখ থেকে ধর্ম কথা শুনবার জন্যে এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে। এই শবর রাজকন্যাটির মনেও বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। একখানি শ্বেত কমল সযত্নে দুই হস্তে ধারণ করে তিনি এসেছেন বুদ্ধকে দর্শন করতে। এবং সেই শ্বেত কমলখানিকে অর্ঘ্য হিসেবে

বুদ্ধের পায়ে নিবেদন করতে। কিন্তু প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছেন না। তাঁর জন্মগত সংস্কার তাঁকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছে। বুদ্ধ নিজে যখন তাকে তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্যে সস্নেহ আহ্বান জানালেন, তখনও তিনি মন থেকে সংকোচ এবং দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছেন না। বুদ্ধের আহ্বান শুনেও 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব নিয়ে নিবেদন করার জন্য আনীত শ্বেত কমলটিকে হস্তে ধারণ করে নীরবে নতমুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় রইলেন। ততক্ষণে তাঁর নয়ন যুগলের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়েছে। এই চিত্রখানি অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার ক'খানির অন্যতম। কে এই শবর রাজকন্যা এবং কোথায় তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত হবার উপায় নেই। তবে এটি যে একটি বাস্তব এবং সত্যি ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পরের আলোচ্য চিত্র সম্ভারখানিতে এক গ্রাম্য মহিলাকে পরিবেশন করা হয়েছে। অতি সাদাসিধে ধরনে রচিত হলেও এটি একটি ত্রিমাত্রিক (three dimensional) চিত্র। অজন্তায় যে কখানি ত্রিমাত্রিক চিত্রসম্ভার এখনও পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পেরেছে এই চিত্রখানি তার অন্যতম। এই চিত্র সম্ভারখানিও দেশ-বিদেশের চিত্রশিল্পিগণের দ্বারা অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। অজন্তার প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই চিত্রখানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে শুধু "জনৈক মহিলা (A woman) নামে। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এই চিত্রখানিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে এটির নেপথ্য পটভূমি নিয়ে গবেষণা করে চিত্রখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে মতৈক্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন, সেটি হল এই মহিলাটি স্নানের উদ্দেশ্যে তাঁদের গাঁয়ের পুষ্করিণীতে এসে সবেমাত্র স্নান পর্ব আরম্ভ করেছেন, এমন সময়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বুদ্ধ তাঁদের গাঁয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উৎসুক গ্রামবাসিগণ ইতিমধ্যেই গিয়ে জড় হয়েছেন বুদ্ধের নিকটে, তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে এবং তাঁর মুখ থেকে ধর্মকথা শোনবার জন্যে। এই মহিলাটিরও অনেক দিনের সাধ বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে এতদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারেনি। এদিকে তিনি স্নানের জন্যে সবেমাত্র জলে অবতরণ করেছেন। স্নান পর্ব সমাধার অনেক কিছুই তখনও বাকী। এতদিন পর্যন্ত মহিলাটির নিকট যে সুযোগ এসে উপস্থিত হয়নি আজ নিতান্ত আকস্মিকভাবে সে সুযোগ আপনা থেকেই এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর নিকট আজ এক নতুন সমস্যা নিয়ে এল। এখন তিনি বুদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হবেন কি করে? সবেমাত্র জলে অবতরণ করেছেন তিনি। তাঁর স্নান পর্ব সমাধা করে নিতে এখনও যে অনেক সময়ের প্রয়োজন। ততক্ষণে বুদ্ধ সেখান থেকে অন্যত্র চলেও যেতে পারেন। তাহলে বুদ্ধের দেখা পাবার সম্ভাবনা

এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়তো আর কোন দিনই হয়ে উঠবে না। এদিকে এমন অবস্থায়, এতগুলো লোকের দৃষ্টির সম্মুখে তিনি নিজেকে সেখানে উপস্থিত করবেনই বা কি করে? মহিলাটি পড়লেন মহা সমস্যায়। সে সমস্যা সমাধানের কোন পথও দেখতে পেলেন না তিনি। মহিলাটি পড়লেন দোটানার মধ্যে—একদিকে তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে নারীসুলভ লজ্জা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বহুদিনের আকাংক্ষা পূরণের জন্যে অর্থাৎ বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে, অবশেষে তিনি নারীসুলভ লজ্জা বস্তুটিকে পরিত্যাগ করলেন। সেই অবস্থায়, আর্দ্র বস্ত্রেই তিনি চলে এলেন বুদ্ধের সম্মুখে। এতগুলো নরনারীর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হবার পর, নারীসুলভ লজ্জা পুনরায় প্রবল হয়ে দেখা দিল তাঁর মনে। তিনি তখন নিজের দেহখানিকে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা কোনমতে আবৃত করে নিতান্ত জড়সড় অবস্থায় সেই সভার এক প্রান্তে উপবেশন করে রইলেন। সুদক্ষ শিল্পীর সুনিপুণ তুলিকার স্পর্শে অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠেছে এই অপূর্ব চিত্র সম্ভারখানি। ত্রিমাত্রিক ছন্দে অতি সাধারণভাবে রচিত এই আশ্চর্য চিত্র সম্ভারখানি এতই বাস্তবধর্মী হয়ে দেখা দিয়েছে, যার ফলে দর্শক মাত্রেই প্রথমটায় এই চিত্র সম্ভারখানির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে মনে মনে সংকোচ বোধ করবেন। এখন কথা হল, এই ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল সে সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানবার উপায় নেই, তেমনি এই রমণীটির পরিচয় সম্বন্ধেও কিছুই জানবার উপায় নেই। অথচ বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছিল এই দুর্লভ ও অমূল্য চিত্র সম্ভারখানি অজন্তার এক নম্বর গুহার দেয়াল গাত্রে।

আমাদের আলোচ্য তৃতীয় চিত্র সম্ভারখানি অজন্তার দেওয়াল গাত্রে পরিবেশিত অন্যান্য সমস্ত চিত্রগুলির মধ্যে এককভাবে এক বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ রকম ধরনের চিত্র, অথবা এ রকম ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অজন্তায় অপর কোন চিত্রসম্ভার রচিত হয়েছিল বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতবাসীগণ চিরকালই শান্তির পূজারী। শান্তির পতাকা হাতে নিয়েই ভারতের জয়যাত্রা। অশোকের সময়ে ভারতের শ্রমণগণ শান্তির বাণী ও পতাকা বহন করেই তখনকার দিনের পরিচিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সে সব স্থানে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন। তরবারি হস্তে ভারত কখনও অপরের দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়নি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভারত একনিষ্ঠভাবে শান্তির পূজারী হলেও সে কোনদিনই দুর্বল নয়। আত্মিক শক্তিতে ভারত চিরদিনই শক্তিশালী। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে। ভারতের ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেবে। ভারত কখনই অন্যায় ও অসত্যের নিকট মস্তক অবনত করেনি। তার অন্যতম প্রমাণ এই চিত্র সম্ভারখানি। এখানে এই চিত্র সম্ভারখানির মধ্যে পরিবেশন করা হয়েছে একজন সৈনিক পুরুষকে। এটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল

বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। আজ দেড় হাজার বছর পরেও চিত্রখানির ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। চিত্রে পরিবেশিত সৈনিক পুরুষটির পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অবয়ব প্রভৃতি পর্যালোচনা করার পর দর্শক মাত্রেই এটি পরিষ্কারভাবে ধারণা করে নেবেন যে, ইনি কোন সাধারণ সৈনিক নন। খুব সম্ভবতঃ ইনি কোন নৃপতির সৈন্যাধ্যক্ষ হবেন। এই চিত্র সম্ভারখানিকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে এবং এটির সম্ভাব্য নেপথ্য পটভূমি নিয়ে আলোচনা করার পর প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতবর্গ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন, তা হল, ইনি কোন নৃপতির সৈন্যাধ্যক্ষ। যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে কৃতজ্ঞ চিত্তে একটি থালায় পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে বুদ্ধের পায়ে অর্ঘ্য হিসাবে প্রদান করবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছেন খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধেরই সম্মুখে। নাম না জানা সুনিপুণ শিল্পীর আশ্চর্য তুলিকার স্পর্শে সৈনিক পুরুষটির মুখমণ্ডলে সৈনিকসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নসমূহ। চিত্রখানিতে পরিবেশিত এই সৈন্যাধ্যক্ষটির নাম অথবা পরিচয় কিছুই জানার উপায় আজ নেই। তিনি কোন্ রাজার সেনাপতি ছিলেন এবং সেই রাজার রাজ্যই বা কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধেও কিছুই জানার আজ আর উপায় নেই। তিনি কোথায় এবং কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন, সে সমস্ত কিছুই আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে সে সমস্ত তথ্য আর কোনদিন উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যে সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল অমূল্য চিত্রসম্ভারসমূহ রচিত হয়েছিল, সে সমস্ত বুদ্ধের জীবদ্দশাই ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। সমসাময়িক কোন কাব্যে অথবা পালি গ্রন্থাদিতে এই সকল ঘটনার কোন ছায়াপাত ঘটেনি, এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা। বুদ্ধের জীবনের তেইশ বছরের ঘটনাবলীর কোন সঠিক পরিচয় আমরা জানবার সুযোগ পাই না। উনপঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ত্বের শেষ কোঠা অতিক্রম করার পর আমরা বুদ্ধকে দেখতে পাই একেবারে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধরূপে রাজগৃহে। উনত্রিশ বছর বয়সে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন। ছয় বৎসরকাল কঠোর তপশ্চর্যার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যেদিন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ঠিক সেই দিনটিতেই তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। তখন থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ একটানা চৌদ্দ বছরের ঘটনাসমূহের মোটামুটি একটা পরিচয় পাবার পর আমাদের চলে যেতে হচ্ছে একেবারে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ বুদ্ধের নিকটে। তাঁর বাকী জীবনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচয় লাভ করার জন্যে।

যশোধরার ভ্রাতা, বুদ্ধের শ্যালক, কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র যুবরাজ দেবদত্ত পিতৃ সিংহাসন এবং রাজপদের লোভ ও মোহ সবকিছুই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, অনিরুদ্ধ, কিম্বিল, ভদ্রিক প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণের সঙ্গে কপিলাবস্তু থেকে অনূপিয় আম্রকাননে গিয়ে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নেবার পর ভিক্ষুব্রত

গ্রহণ করেন। বুদ্ধ নির্দিষ্ট সাধন-ব্রত অবলম্বন করে দেবদত্ত কিছু ঋদ্ধিবল লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও বুদ্ধের প্রতি একটা ঈর্ষার ভাব দেবদত্তের অন্তরে বরাবরই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। এই ঈর্ষার ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল অনেক পূর্বেই। যশোধরার সঙ্গে কুমার গৌতমের বিবাহের পর যখন শাক্য রাজকুমারগণের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, তখন অন্যান্য সমস্ত শাক্য রাজকুমারগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেবদত্ত নিজেও অংশগ্রহণ করেছিল এবং অন্যান্য সকল রাজকুমার-গণের সঙ্গে সে নিজেও কুমার গৌতমের শস্ত্রবিদ্যার নিকট পরাভব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কুমার গৌতমের প্রতি, তার আপন সহোদরার পতির প্রতি তখন থেকেই তার মনে একটা প্রবল ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পরেও, তার মন থেকে বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষার ভাব বিন্দুমাত্রও অপসারিত হয়নি, বরং সেই ঈর্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হয়ে চলছিল। ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পরেও দেবদত্তের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কি করে বুদ্ধের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারা যায়। বুদ্ধের সমকক্ষতা অর্জন করার বাসনা দেবদত্তের বহুদিনের। বৃদ্ধ বয়সে তার এই বাসনা তীব্র আকার ধারণ করে। কিছুটা ঋদ্ধিবল অর্জন করার পরই তার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, সে কোনমতেই বুদ্ধ অপেক্ষা ন্যূন নয়। দেবদত্ত বয়সে বুদ্ধের চেয়ে অন্ততঃ দু বছরের বড়। সেও তখন রীতিমত বৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বুদ্ধের নিকট থেকে সংঘের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে নিজেকে বুদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন ধরেই সে এর জন্যে প্রস্তুতি পর্ব চালিয়ে এসেছিল। বুদ্ধের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গিমা, ইত্যাদি সব কিছুই সে হুবহু নকল করে ভিক্ষু সংঘে এসে নিজেকে বুদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে। যখন এতসব কাণ্ডকারখানা করেও সে ভিক্ষুসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হল না, তখন সে একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে বসল। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ বুদ্ধ যখন একদিন রাজগৃহের বেণুকুঞ্জের আশ্রমে উপস্থিত ভক্ত ও ভিক্ষুগণের নিকট ধর্মসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে উপদেশ প্রদান করছিলেন, এমন সময় দেবদত্ত নিতান্ত আকস্মিকভাবে সেই সভায় উপস্থিত হয়ে একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে আসনে উপবেশন করে। সেই সভায় শত সহস্র কৌতূহলী জনতার সম্মুখে দেবদত্ত একেবারে বুদ্ধের বিপরীত দিকে মুখোমুখি আসনে উপবেশন করে তাঁকে প্রশ্ন করে বসলো, আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, সংঘের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা আপনার পক্ষে এখন সাধ্যাতীত। সুতরাং এখন থেকে সংঘের দায়িত্বভার এবং ধর্মপ্রচারের ভার আপনি আমার উপর ন্যস্ত করে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। দেবদত্তের উক্তি শুনে, বুদ্ধ তখন সভাস্থ সকলের সম্মুখেই দেবদত্তকে উদ্দেশ করে বলেন, ভিক্ষুসংঘের এবং ধর্মপ্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত পাত্র তুমি আদৌ নও। আমার

দৈহিক বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্যি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘের এবং ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবার মত সামর্থ্য আমার এখনও রয়েছে এবং তা বরাবরই বজায় থাকবে। সুতরাং এখন তুমি যেতে পার।

বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে, দেবদত্ত প্রথম জীবনে বুদ্ধের কৃপায় যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং যার ফলে সে কিছুটা ঋদ্ধিবলও লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, সে সবকিছুই তার বিনষ্ট হয়ে যায়। ভিক্ষু সমাজও তখন তাকে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখেই দেখতে থাকে। এই অসহ্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এবং তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায়, বুদ্ধের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গে পরামর্শ করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে তার নিজস্ব মতবাদ যদি কিছুটাও অন্ততঃ প্রবিষ্ট করাতে সমর্থ হয় তবেই তার মুখ রক্ষা হতে পারে। নচেৎ কিছুতেই নয়। যে সকল বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভিক্ষু দেবদত্তকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল, তারা হল যথাক্রমে কোকালিক, কত মোরগতিষ্য, খণ্ডদেব পুত্র এবং সাগর দত্ত। এদের মধ্যে কোকালিক ছিল বুদ্ধেরই জ্ঞাতি, শাক্যবংশীয় রাজপুত্র। এই সমস্ত বিরুদ্ধাচারী ভিক্ষুগণ সকলেই ছিল দেবদত্তের একান্ত অনুগত।

বুদ্ধের সমকক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে সেই সভার মধ্যেই প্রবল ধাক্কা খেল দেবদত্ত। এ ব্যাপার নিয়ে ভিক্ষু সমাজেও দেবদত্তের সম্মান ও প্রতিপত্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। ফলে বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের ঈর্ষার ভাব আরও প্রবল হয়ে দেখা দিল। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সে তার পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই চারজন বিরুদ্ধবাদী ভিক্ষুগণের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে ধর্ম ও বিনয়ের জন্যে কয়েকটি নতুন নিয়মের উদ্ভাবন করে নিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভিক্ষু সংঘে তার নষ্ট প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার করা। ভিক্ষু সংঘের উন্নতি বিধান তার উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই। তার পর আর একদিন সে পূর্বের ন্যায় বেণুকুঞ্জের আশ্রমের ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখোমুখী বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করে ধর্মসভায় উপস্থিত সকলের সমক্ষে তার নিজের উদ্ভাবিত নতুন পাঁচখানি নিয়ম ভিক্ষুসংঘে প্রবর্তনের জন্যে বুদ্ধকে অনুরোধ জানায়। দেবদত্ত উদ্ভাবিত সেই নতুন পাঁচখানি নিয়ম যথাক্রমে ঃ—

১. ভিক্ষুগণ চিরজীবন বনে কাটাবেন।
২. ভিক্ষুগণ বৃক্ষতল ব্যতীত অপর কোথায়ও বাস করতে পারবেন না।
৩. ভিক্ষুগণ কোন উপাসকের নিকট থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারবেন না এবং কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করবেন।
৪. ভিক্ষুগণ শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্র ব্যতীত অপর কোন বস্ত্র নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন না।

৫. ভিক্ষুগণ শুদ্ধ নিরামিশাষী হবেন এবং কখনও মৎস্য অথবা মাংস ভক্ষণ করতে পারবেন না।

দেবদত্ত প্রস্তাবিত প্রথম নিয়মের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, ভিক্ষুগণের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্যে দেশে দেশে উপস্থিত হওয়া এবং বিভিন্ন লোকালয় ও স্থানসমূহ পরিক্রমণ করা। সেজন্য তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়া এবং সেই সকল স্থানে অবস্থিতিরও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং ভিক্ষুগণ যদি কেবলমাত্র বনে বনেই বিচরণ করতে থাকেন, তবে তাঁদের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতে বাধ্য। অতএব তা কখনও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্তরে বুদ্ধ জানালেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের পক্ষে একমাত্র বৃক্ষতল আশ্রয় করে জীবনের দিনগুলিকে অতিবাহিত করা সম্ভব হতে পারে না। আর কেবলমাত্র বৃক্ষতল আশ্রয়ের দ্বারাও কোন মহৎ কার্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং এই নিয়মও কখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

দেবদত্তের প্রস্তাবিত তৃতীয় নিয়মটি সম্বন্ধে বুদ্ধ জানান, ভিক্ষুগণ সাধারণভাবে ভিক্ষালব্ধ অন্নেই জীবন ধারণ করবেন। কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অন্ন ব্যতীত অপর কোন আহার্য বস্তু গ্রহণ করতে পারবেন না, এ ধরনের কোন নিয়ম প্রবর্তন করা চলতে পারে না। কোন ভক্ত অথবা উপাসক যদি অযাচিত-ভাবে কোন ভিক্ষুকে ফলমূল অথবা বস্ত্র প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন, তবে সেই ভিক্ষুর পক্ষে সে সকল বস্তু গ্রহণ না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অতএব এ নিয়মও প্রবর্তন করা যেতে পারে না।

চতুর্থ প্রস্তাবের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, ভিক্ষুসংঘে সাধারণ গৃহী থেকে আরম্ভ করে সম্রাট পর্যন্ত মানবজীবনের সর্বস্তরের লোকই সেখানে বর্তমান রয়েছেন। সুতরাং তাদের পক্ষে শ্মশানে পরিত্যজ্য বস্ত্র গ্রহণ এবং তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া দেশভেদে কালভেদে মানুষের শরীর রক্ষার জন্যে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র ও গাত্রাবরণেরও প্রয়োজন। সুতরাং একমাত্র ছিন্ন ও পরিত্যজ্য বস্ত্র কখনই সে প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ নয়। অতএব এ নিয়মও গ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এরপর দেবদত্তের উত্থাপিত পঞ্চম ও শেষ নিয়মটি সম্বন্ধে তিনি জানান, ভিক্ষুগণের পক্ষে জীবহিংসা বারণ। সেজন্য সাধারণভাবে দেখতে গেলে তাদের পক্ষে নিরামিষভোজী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভিক্ষুগণকে সাধারণতঃ নির্ভর করে চলতে হয় ভিক্ষান্নের উপর এবং দেশভেদে কালভেদে লোকের খাদ্যাখাদ্য বিভিন্ন প্রকার হতে বাধ্য। ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে, যা লভ্য তাই তারা গ্রহণ করবেন। সেখানে তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী

কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভিক্ষুগণকে যিনি যেরূপ খাদ্য-বস্তু ভিক্ষাদান করবেন, ভিক্ষুগণ শুদ্ধচিত্তে তাই গ্রহণ করবেন, এর জন্য যদি কেউ দায়ী হন, তবে তিনি দাতা। গ্রহীতা মোটেই নন। সুতরাং ভিক্ষুগণের খাদ্যাখাদ্যের বিষয়ে কোন প্রকার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা চলতে পারে না।

দেবদত্ত যখন দেখতে পেলো যে, বুদ্ধ তার কোন প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে মেনে নিলেন না, এবং তার কোন কথায়ই কান দিলেন না, তখন তার মনের ঈর্ষামিশ্রিত ক্ষোভ হিংসার আকারে দারুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে বসলো। এই ঘটনার পর দেবদত্ত বুদ্ধের প্রতি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে সে তখন প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো, এর পর সে নিজেকেই বুদ্ধ বলে প্রচার করে ভিক্ষুসংঘকে ভাঙ্গবার জন্য প্রবৃত্ত হল। প্রথমটায় সে তাতে সফলতাও অর্জন করতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। দেবদত্তের প্ররোচনায় নবাগত পাঁচশত ভিক্ষু দেবদত্তের পক্ষাবলম্বন করে তাকেই বুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিল। দেবদত্ত তখন আর বিলম্ব না করে সেই পাঁচশত নবাগত ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে জেতবনের আশ্রম পরিত্যাগ করে গয়াশির পর্বতে গিয়ে, নতুন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই অবস্থান করতে আরম্ভ করে দেয়। দেবদত্তের অপচেষ্টার ফলে ভিক্ষু সংঘ তখনকার মতো দু'ভাগে বিভক্ত হয় পড়ে। দেবদত্তের প্রধান সহায় এবং পরামর্শদাতা হল কোকালিক এবং অপর তিনজন ভিক্ষু। তাদের পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। দেবদত্ত এভাবে গয়াশির অথবা ব্রহ্মযোনী পর্বতে স্বতন্ত্র এক বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে বুদ্ধ বলে প্রচার করতে আরম্ভ করে দিল। কিছুদিন বাদে বুদ্ধ দেখতে পেলেন সেই পাঁচশত তরুণ বয়স্ক নবাগত ভিক্ষুগণ, যারা দেবদত্তের প্ররোচনায় গয়াশিরে রয়েছে, তাদের ধর্ম এবং বিনয় সম্বন্ধে "জ্ঞান পরিপাক" কাল উপস্থিত হয়েছে এবং এখন তাদের মধ্যে সুমতিরও সঞ্চার হয়েছে। তিনি তখন তার অগ্রশ্রাবকদ্বয় সারীপুত্ত ও মৌগ্যল্যায়নকে গয়াশিরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণের নিকট ধর্মচতুষ্টয় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যাখ্যা করে পুনরায় তাদের বুদ্ধ শাসনে ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্যে নির্দেশ দান করেন।

বুদ্ধের নির্দেশমত সারীপুত্ত ও মৌগ্যল্যায়ন গয়াশিরে গিয়ে দেবদত্তের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। দেবদত্ত পর্বতশীর্ষ থেকে ওদের দুজনকে তার আশ্রমের দিকে আসতে দেখে, আনন্দে একেবারে উল্লসিত হয়ে ওঠে। সে তক্ষুণি নব্য ভিক্ষুগণের সম্মুখে বুদ্ধের অভিনয় করে, বুদ্ধের ভাষায় বলে উঠলো, ওই যে দুজন সন্ন্যাসী এদিকে এগিয়ে আসছেন, এরাই হবেন আমার সংঘের অগ্রশ্রাবকদ্বয়। কোকালিকও দূরে থেকে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে দেবদত্তকে তক্ষুণি সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, সারীপুত্ত যেন অন্ততঃ

ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে কোন কথা বলার সুযোগ না পায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন। দেবদত্ত কোকালিকের কোন কথা গ্রাহ্য না করে সারীপুত্ত ও মৌগ্যাল্যায়নকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের উপস্থিতিতে নবাগত ভিক্ষুগণের সম্মুখে বুদ্ধের অনুকরণে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করে দিল। এভাবে গভীর রাত্রি পর্যন্ত একটানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেবদত্ত অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধের অনুকরণে সিংহ শয্যা আশ্রয় করে। তার ঋদ্ধিবল বলতে যা কিছু ছিল, তার সমস্তই ততদিনে অপসৃত হয়ে গিয়েছে। শয্যা আশ্রয় করার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে সারীপুত্ত তখন উপস্থিত নব্য ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সারীপুত্তের মুখে ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে নব্য ভিক্ষুগণ ধর্মের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করে এক নতুন জগতের সন্ধান লাভ করলেন। তারা তক্ষুণি সারীপুত্ত ও মৌগ্যাল্যায়নের সঙ্গে গয়াশির আশ্রম পরিত্যাগ করে, তাদের সেই পুরাতন আশ্রম জেতবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। কোকালিক এবং অপর তিনজন ভিক্ষু কেবল তাদের সঙ্গে ফিরে এলো না। এদিকে রাত্রি প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর বুদ্ধের অনুকরণে দেবদত্ত যখন কোকালিককে তার নবাগত অগ্রশাবকদ্বয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো, তখন কোকালিক কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করে নিজেকে সামলে রাখতে সমর্থ হয়নি। প্রচণ্ড ক্রোধের বশে উত্তেজিত হয়ে কোকালিক শয্যাশ্রয়ী দেবদত্তের বক্ষে প্রচণ্ডভাবে পদাঘাত করে বসে, সেই আঘাতের ফলে দেবদত্ত রক্তবমন করতে থাকে এবং তার ধাক্কা সামলাতে দেবদত্তের অনেক দিন সময় লেগেছিল।

এদিকে পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রশাবকদ্বয় যখন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে ফিরে এলেন, তখন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। ভিক্ষুগণের সম্মুখে ছিলেন সারীপুত্ত নিজে। আশ্রমস্থ সকলে ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত অগ্রশাবকদ্বয়কে দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের জয়গান করতে করতে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। ভিক্ষুগণের মুখে সারীপুত্তের সময়োচিত কর্তব্যের প্রশংসা শুনে বুদ্ধ তখন ভিক্ষুদের সম্মুখে এগিয়ে এসে, তাদের সম্বোধন করে জানালেন, যে সারীপুত্ত এ জন্মেই তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি, পূর্বজন্মেও সে এই রকম অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল। এই বলে তিনি সারীপুত্তের পূর্বজন্মের সেই অদ্ভুত ক্ষমতার কাহিনী সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করেন। সারীপুত্তের সেই পূর্বজন্মবৃত্তান্ত "লক্ষণজাতক" কাহিনী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এরপর বুদ্ধ সারীপুত্তকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, তখন দেবদত্ত তোমাদের প্রতি কিরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল? উত্তরে সারীপুত্ত জানাল যে, দেবদত্ত বুদ্ধের অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং তার ফল তাকে উত্তমরূপেই পেতে হয়েছে। সারীপুত্তের উত্তর শুনে

বুদ্ধ তখন ধীরে ধীরে বলেন, পূর্বে সে একবার এরকম আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শেষে তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছিল। তখন ভিক্ষুগণের অনুরোধে বুদ্ধ দেবদত্তের সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত তাদের নিকট বর্ণনা করেন। দেবত্তের সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত "বিরোচন জাতক" (১৪৩) কাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

অগ্রশাবকদ্বয়ের নেতৃত্বে নব্য ভিক্ষুগণের জেতবনের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর, দেবদত্তের সহায় বলতে আর কেউ রইল না। কোকালিকের অস্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে দেবদত্তের পীড়া তখনও সম্পূর্ণ আরাম হয়নি। সে অবস্থায় গয়াশির আশ্রমে বাস করা তার পক্ষে তখন নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে। একবার যখন সে বৌদ্ধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছে, তখন আর তার পক্ষে বৌদ্ধ শাসনে পুনঃ প্রবেশ সম্ভব নয় বুঝে, সে তখন নতুন করে দল গঠনে প্রবৃত্ত হল। তীর্থিকগণের ন্যায় তার পক্ষেও রাজানুগ্রহ লাভ ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কেননা মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উভয়েই ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত ও উপাসক শ্রেণীভুক্ত। অপর কোন ধনবান গোষ্ঠীর সাহায্য লাভও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মগধ রাজ্যের এবং কোশল রাজ্যের ধনবান শ্রেষ্ঠীগণের প্রায় সকলেই ছিলেন বুদ্ধের শিষ্য। আর বাদবাকী ছিলেন তীর্থিক সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং কোন ধনবান শ্রেষ্ঠীর সাহায্য লাভ তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এদিকে কোন উপায়ান্তর না দেখতে পেয়ে, দেবদত্ত তখন বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকেই তার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গণ্য করে, এবং তার দ্বারাই নিজের কার্যোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। অজাতশত্রুই গয়াশিরে দেবদত্তের জন্যে বহু অর্থব্যয় করে এক আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এবার দেবদত্তের অনুরোধে সে রাজগৃহের একাংশে দেবদত্তের জন্যে পৃথক আর একখানা আশ্রম নির্মাণ করে দেয়। সেই আশ্রমে থেকে দেবদত্ত নিজেকে বুদ্ধ বলে প্রচার করতে থাকে। দেখতে দেখতে বেশ কিছু সংখ্যক শিষ্যও তার জুটে গেল। দেবদত্তের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে তাঁরাও ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষুণীদের জন্যও দেবদত্ত পৃথক একটি উপাশ্রয় (ভিক্ষুণী সংঘ) স্থাপন করেছিল। সেখানেও বেশ কিছু ভিক্ষুণী যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও ছিলেন। এঁদের সকলেরই ধারণা জন্মেছিল যে, দেবদত্তই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধ। ভিক্ষুণী সংঘে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মধ্যে কুমার কাশ্যপের জননীও ছিলেন।

কুমার কাশ্যপের জননী ছিলেন রাজগৃহের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। এই অপরূপ লাবণ্যবতী মহিলা শিশু বয়স থেকেই ধর্মপরায়ণা বলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুই তাঁর উদাসীন মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কি করে জন্ম-মৃত্যুর এই

নরক যন্ত্রণা থেকে চিরকালের মত অব্যাহতি লাভ করতে-পারা যায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রবজ্যা গ্রহণ করবার জন্যে পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার পিতামাতা তাঁদের অপর কোন সন্তানাদি না থাকার দরুন তাদের একমাত্র কন্যার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করতে সমর্থ হননি।

এরপর তার পিতামাতা এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবারের পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বিবাহের পর কন্যা পতিগৃহে গেলেন বটে কিন্তু সেখানেও তাঁর মন সংসারে আকৃষ্ট হোল না। এদিকে তাঁর অমায়িক ব্যবহারে তাঁর পতিকুলের সকলেই তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর স্বামী তাঁর ব্যবহারে এতই প্রীত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি স্ত্রীর কথায় বিরক্তি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। প্রবজ্যা গ্রহণ করার পর কোথায় এবং কোন্ আশ্রমে বাস করলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হতে পারে সেই চিন্তা করে তাঁর স্বামী নিকটস্থ দেবদত্তের আশ্রমটিকেই উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করলেন। তারপর একদিন স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেবদত্তের নিকট থেকে তাঁকে প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়ে সেখানকার ভিক্ষুণী সংঘে তাঁকে রেখে এলেন। কুমার কাশ্যপের জননীর ইচ্ছা ছিল বুদ্ধের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে প্রবজ্যা গ্রহণ করা। কিন্তু কাজ হল অন্যরূপ। যাই হোক, প্রবজ্যা গ্রহণ করার পর কঠোর সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করে চলছিলেন তিনি। এর মধ্যে তার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পেল। প্রবজ্যা গ্রহণ করার পূর্বেই যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন, এটা তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি। গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাবার পর তিনি পড়লেন মহাবিপদে। এদিকে দেবদত্তের কানেও সে কথা উঠেছে। সেই অবস্থায় শ্রেষ্ঠী কন্যাকে উপাশ্রয়ে স্থান দিলে লোকে অযথা কলঙ্ক রটাতে পারে, সেই আশঙ্কায় দেবদত্ত কোনরূপ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করে। কয়েকজন ভিক্ষুণীও দেবদত্তকে জানায় যে, শ্রেষ্ঠী কন্য আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং তা তিনি নিজেও আন্দাজ করতে সমর্থ হননি। কিন্তু দেবদত্ত তাদের কারুর কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করেনি। শ্রেষ্ঠী কন্যা তখন নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে আশ্রমের ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ করে বলেন, আপনারা দয়া করে আমাকে ভগবান বুদ্ধের আশ্রমে নিয়ে চলুন। তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি আমার কথা বুঝবেন। বুদ্ধ তখন রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে এসে সেখানে অবস্থিতি করছিলেন। শ্রেষ্ঠী কন্যার কাতর অনুরোধে সেই ভিক্ষুণীগণ তখন তাঁকে নিয়ে অগত্যা ভগবান বুদ্ধের আশ্রমের উদ্দেশ্যে শ্রাবস্তীর পথে পা বাড়ালেন। রাজগৃহ থেকে সেই অবস্থায় দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করে শ্রাবস্তী নগরে এসে উপস্থিত হতে শ্রেষ্ঠী কন্যাকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে জেতবনের আশ্রমে

উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীগণ শ্রেষ্ঠী কন্যা সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানালেন বুদ্ধকে।

ভিক্ষুণীদের নিকট থেকে শ্রেষ্ঠী কন্যা সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হবার পর বুদ্ধ স্থির করলেন, যে কারণে দেবদত্ত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই ভিক্ষুণীকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে, এখন যদি আবার কোনরূপ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাকে পুনরায় এখানকার আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দান করা হয়, তাহলে সেই উল্টো ফলই দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ লোকে অযথা নিন্দে রটাবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। সুতরাং একে সর্বসমক্ষে পরীক্ষা করার পর, সকলের অনুমতি নিয়ে তারপরই একে উপাশ্রয়ে গ্রহণ করা চলতে পারে। এ ব্যাপারে বিচারের ভার একমাত্র রাজার উপরই ন্যস্ত করা চলতে পারে। সবদিক থেকে বিবেচনা করে তিনি পরের দিন রাজা প্রসেনজিৎকে জেতবনের বৈকালিক ধর্মসভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে একজন ভিক্ষুকে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। এদিকে তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যবর্গকেও সে দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দান করলেন। তাঁর সেই নির্দেশ মতো উপালি, অনাথপিণ্ডদ, মহোপাসিকা বিশাখা প্রভৃতি বুদ্ধের অগ্রগণ্য শিষ্য ও শিষ্যাগণ সেদিনের ধর্মসভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য উপস্থিত হলেন, রাজা প্রসেনজিৎও বুদ্ধের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জেতবনের ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। সেই মহতী সভায় সর্বসমক্ষে বুদ্ধ প্রথমে উপালিকে উদ্দেশ করে বলেন, তুমি সমবেত ভক্তগণের নিকট শ্রেষ্ঠী কন্যা সম্বন্ধে যা জান, বিস্তারিতভাবে সব কিছু উল্লেখ করে এখন তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলতে পারে, সকলের নিকট থেকে সেই অনুমতি প্রার্থনা কর। উপালি তখন বুদ্ধের আজ্ঞা শিরোধার্য করে, রাজা প্রসেনজিতের উপস্থিতিতে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট, শ্রেষ্ঠী দুহিতা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় উদঘাটন করে বলেন, যদি এমত অবস্থায় উপস্থিত ভক্তমন্ডলী শ্রেষ্ঠী দুহিতাকে উপাশ্রয়ে আশ্রয় দান করাটা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেন, তবেই তাকে উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এদিকে মহোপাসিকা বিশাখা শ্রেষ্ঠী দুহিতাকে যবনিকার অন্তরালে নিয়ে গিয়ে তাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর সর্বসমক্ষে এসে জানিয়ে দিলেন যে, শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রবজ্যা গ্রহণ করার পূর্বেই অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছিলেন। এরপর সকলে মিলে শ্রেষ্ঠী দুহিতাকে নিষ্পাপ বলে মত প্রকাশ করলে, বুদ্ধ তখন তাঁকে উপাশ্রয়ে গ্রহণ করেন।

উপাশ্রয়ে থেকে শ্রেষ্ঠী-দুহিতা যথাসময়ে এক পুত্র প্রসব করেন। উপাশ্রয়ে শিশুটিকে লালন-পালনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে সেজন্য রাজা প্রসেনজিৎ শিশুটিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে তাকে রাণীদের হাতে তুলে দেন। রাজপ্রাসাদে শিশুটি রাজপুত্রের ন্যায় আদর-যত্নে প্রতিপালিত হতে

থাকে। শিশুটির নামকরণ করা হয়েছিল কাশ্যপ। রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হয়েছিল বলে তার নামের সঙ্গে কুমার কাশ্যপ কথাটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তাকে বলা হত কুমার কাশ্যপ। কুমার মাত্র সাত বছর বয়সে বুদ্ধের নির্দেশমত প্রবজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাক্‌পটু। ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল অতি সুন্দরভাবে নিপুণতার সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারতেন। স্বয়ং বুদ্ধ একবার তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ভিক্ষুগণের মধ্যে কুমার কাশ্যপই হচ্ছেন সবচেয়ে বাক্‌পটু। পরবর্তীকালে কুমার কাশ্যপ "বল্মীকসূত্র শুনে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

দেবদত্তের অহেতুক বুদ্ধের বিরোধিতার কথা নিয়ে এবং কুমার কাশ্যপ এবং তার জননীর প্রতি তার অমানুষিক হৃদয়হীন আচরণের উল্লেখ করে জেতবনের ভিক্ষুগণ একদিন ধর্মসভায় সমবেত হয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধ গন্ধকুঠি থেকে সভায় এসে উপস্থিত হন। ভক্তজনের আলোচ্য বিষয়-বস্তু অবগত হয়ে বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, দেবদত্ত কেবল এজন্মেই কুমার কাশ্যপ এবং তার জননীর প্রতি নিষ্ঠুরের মত আচরণে প্রবৃত্ত হয়নি। পূর্বেও একবার সে কুমার কাশ্যপ এবং তার জননীর সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছিল। এই বলে তিনি সেই অতীত জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী "ন্যগ্রোধমৃগ জাতক" কাহিনী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যে কটি জাতক কাহিনী সর্বসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত ও প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল, এই জাতক কাহিনীটি তার অন্যতম।

বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পর কিছুদিনের মধ্যেই দেবদত্ত ঐশী শক্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ঋদ্ধিবলের প্রভাব তার মধ্যে এতটা দেখা দিয়েছিল, যার ফলে সে আকাশ মার্গে বিচরণ করতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু দেবদত্ত ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। যার ফলে সে তার অর্জিত ঐশী শক্তিকে কোন প্রকার সৎকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়নি। বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমে তার এতদূর অধঃপতন ঘটেছিল, যার ফলে তার ঋদ্ধিবল প্রভৃতি সব-কিছুই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। দেবদত্ত নিজেই তা বেশ ভাল করে আন্দাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি তার ঈর্ষার ভাব এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা এতখানি অস্থিমজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে, কিছুতেই সে তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়নি। ঋদ্ধিবল হারিয়েও সে সব সময়েই নিজেকে বুদ্ধের সমকক্ষ বলে মনে করতো।

নতুন করে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেও সে কোন সুবিধা করে নিতে সমর্থ হল না। এভাবে তার আর কোন সুবিধা হবে না বুঝে, এবং হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরে পাবার লালসায়, সে তখন পুনরায় বুদ্ধ শাসনে ফিরে যাবার

জন্যে সমুৎসুক হয়ে উঠলো। একবার সে বৌদ্ধ সংঘ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলবলসহ বেরিয়ে এসেছে। এখন যদি সে একজন সাধারণ ভিক্ষুর মত পুনরায় গিয়ে সংঘে যোগদান করে তবে তার পক্ষে অবমাননাকর আর কিছুই হতে পারে না। সংঘে যদি সে কর্ণধাররূপে অন্ততঃ উপস্থিত হতে পারে তাহলে তার পক্ষে মুখ রক্ষা করা কিছু পরিমাণে হয়ত সম্ভব। সব দিক বিবেচনা করে সে তখন বুদ্ধ শাসনে পুনরায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে এক অভিনব প্রস্তাব উত্থাপন করে বসে। সে বৌদ্ধ শাসনে পুনরায় ফিরে আসবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর সে বুদ্ধের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করে জানাল যে, তাকে বৌদ্ধ সংঘের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। ইতিপূর্বে সংঘে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশায় নূতন নিয়মের প্রবর্তন করতে গিয়ে তাকে যেমন অকৃতকার্য এবং অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল, এবারেও তার ভাগ্যে সেই একই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। বুদ্ধ তার সেই প্রস্তাব আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করলেন না। এমনকি দেবদত্তকে তার অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সমকক্ষ বলেও স্বীকার করে নিলেন না। এবারে বুদ্ধের নিকট এভাবে অপদস্থ হবার পর দেবদত্ত একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। দেবদত্তের হিতাহিত জ্ঞানটুকুও এবার সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেল। এখন তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল, কি করে বুদ্ধের সর্বনাশ সাধন করতে পারা যায়। কলঙ্ক, অপবাদ প্রভৃতি রটনা দ্বারা বুদ্ধের ক্ষতি সাধন করার মত কোন পথ খুঁজে না পেয়ে, সে তখন বুদ্ধের চরম ক্ষতি সাধন করবার জন্যে, অর্থাৎ তাকে সংহার করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল।

বুদ্ধকে হত্যার ষড়যন্ত্রে দেবদত্তের প্রধান সহায় হিসাবে দেখা দিল নৃপতি বিম্বিসারের তনয় অজাতশত্রু। অজাতশত্রুর মাতা ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী। পরবর্তীকালে মাতুল প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর বেশ কয়েকবার যুদ্ধও হয়েছিল। পালি গ্রন্থাদিতে কয়েকস্থানে অজাতশত্রুকে "বৈদেহীপুত্র" এই নামেও অভিহিত দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকে মনে করেন অজাতশত্রুর জননী ছিলেন বিদেহ রাজকন্যা। কিন্তু প্রচলিত মত, অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয়। কয়েকটি জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকেও স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হবে যে, অজাতশত্রু কোশলরাজ-কন্যারই গর্ভজাত সন্তান।

অজাতশত্রুর জন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ এই, যখন সে মাতৃগর্ভে, তখন তার জননীর অন্তরে এক অতি বিচিত্র সাধ জেগেছিল। রাজা বিম্বিসার তাঁর পত্নীর সেই অদ্ভুত সাধের কথা জানতে পেরে শেষে তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। রাজদৈবজ্ঞগণ সেই ঘটনাটির বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ গণনা করে তার ফল অত্যন্ত অশুভ বলে মত প্রকাশ করলেন। রাজদৈবজ্ঞগণ তখনই রাজাকে সাবধান করে

দিয়ে বলেছিলেন যে, রাজমহিষীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান রয়েছে, ভবিষ্যতে সে পিতৃহন্তা হবে। রাজদৈবজ্ঞগণের গণনায় বৃত্তান্ত রাজমহিষী অবগত হয়ে নিজের গর্ভনাশ করবার জন্যে উদ্যত হন। কিন্তু রাজার একান্ত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি একাজ থেকে বিরত হন।

অজাতশত্রু যখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করে, তখন সে সময়েই তার পিতা নৃপতি বিম্বিসার তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সে সময়েই দেবদত্তের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। দেবদত্তের সঙ্গে পরিচয় হবার অল্পদিনের মধ্যেই অজাতশত্রু দেবদত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেবদত্ত যখন পাঁচশত তরুণ ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের আশ্রম ত্যাগ করে গয়াশির পর্বতে চলে যায় এবং সেখানে নতুন সংঘ গঠন করে, তখন অজাতশত্রুই বহু অর্থ ব্যয় করে দেবদত্তের জন্যে সেখানে একটি নূতন আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সারীপুত্ত ও মৌগ্যাল্ল্যায়নের চেষ্টার ফলে গয়াশির আশ্রম থেকে সেই পাঁচশত তরুণ ভিক্ষুগণ পুনরায় বুদ্ধ শাসনে ফিরে গেলে, গয়াশির আশ্রম পরিত্যক্ত হয়ে যায়। দেবদত্ত তখন তার অনুগত চারজন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে চলে যায় এবং সেখানে নূতন করে সংঘ স্থাপন করে পুনরায় বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়। অজাতশত্রু রাজগৃহের একাংশে বেণুকুঞ্জের আশ্রম থেকে সামান্য দূরে দেবদত্তের জন্য গয়াশির আশ্রমের অনুরূপ আর একখানি আশ্রম প্রচুর অর্থব্যয় করে নির্মাণ করে দেয়, এবং সেই আশ্রমস্থ ভিক্ষুগণের জন্যে প্রতিদিন রাজকীয় আহার্যবস্তু সকল প্রেরণ করতে থাকে। দেবদত্ত অতি সহজেই অজাতশত্রুকেই একান্তভাবে নিজের বশে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। এবার সে বুদ্ধের প্রাণ বিনাশের জন্যে অজাতশত্রুর সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হল। কিন্তু যত গোল বাধলো নৃপতি বিম্বিসারকে নিয়ে। বুদ্ধের একান্ত অনুগত নৃপতি বিম্বিসারের জীবিতাবস্থায় বুদ্ধের প্রাণনাশ করা অসম্ভব ব্যাপার বুঝে, দেবদত্ত সর্বপ্রথমে অজাতশত্রুকে পিতৃহত্যায় প্ররোচিত করতে থাকে। দেবদত্তের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে অজাতশত্রু একদিন তার পিতাকে হত্যা করবার জন্যে দীর্ঘ বর্শা হস্তে রাজসভায় প্রবেশ করে একেবারে পিতার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়। পিতা বিম্বিসার পুত্রের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে ডেকে প্রশ্ন করেন, "তুমি আমার প্রাণসংহারের জন্যে চেষ্টা করছো কেন?" অজাতশত্রু তেমনি নির্ভিকভাবেই পিতার প্রশ্নের উত্তরে জানাল যে, সে রাজপদপ্রার্থী। পুত্রের কথা শুনে বিম্বিসার তখনই সিংহাসন ত্যাগ করে পুত্রের হস্তে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বভার সমর্পণ করে দেন।

অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলো বটে, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তার কেবলই মনে হতে থাকে যে, মগধের জনসাধারণ তার চেয়ে তার পিতাকেই সম্মান করে বেশী। সুতরাং যে কোন মুহূর্তে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে পুনরায় তাদের প্রিয় নৃপতি

বিম্বিসারকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে। অজাতশত্রুর মাতুল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কোশলরাজ প্রসেনজিৎও ভাগিনেয়ের এই অসদৃশ আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময়ে দেবদত্ত অজাতশত্রুকে ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো যে, বিম্বিসার জীবিত থাকা পর্যন্ত তার রাজপদ মোটেই নিরাপদ নয়। অজাতশত্রু কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল পিতাকে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন দেবদত্ত অজাতশত্রুকে পুনরায় কুপরামর্শ দিয়ে জানাল যে, বিম্বিসারকে কারাগারে অনাহারে রেখে তার প্রাণ সংহার করার জন্যে।

অজাতশত্রু দেবদত্তের এই কুমন্ত্রণা গ্রহণ করে পিতাকে কারারুদ্ধ করে রেখে দিল। অজাতশত্রুর আদেশে বিম্বিসারের নিকট কোন প্রকার ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হল। একমাত্র রাজমহিষী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল। রাজমহিষী প্রথম প্রথম লুকিয়ে রাজার জন্য ভোজ্যবস্তু কারাগারের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতেন। ক্রমে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাওয়াতে অজাতশত্রু সে পথটি বন্ধ করে দেয়। রাজমহিষীকে, অর্থাৎ নিজেরই জননীকে কারাগৃহের অভ্যন্তরে আর যেতে দেওয়া হল না। কারাগৃহে অনাহারে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত, ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক নৃপতি বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ ঘটে। যে সময়ে বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, সে সময়ে বুদ্ধ কিছুদিনের জন্যে রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতের উপরিভাগে সশিষ্য অবস্থিতি করছিলেন। আর বিম্বিসারের কারাগৃহটি ছিল পর্বতটির একেবারে পাদদেশে। কারাগৃহের গবাক্ষ পথে বিম্বিসার প্রায়ই পর্বতের উপরিভাগে দণ্ডায়মান বুদ্ধের দর্শন লাভ করতে পারতেন। বিম্বিসারকে তার শেষ দিন কাটিতে দর্শনদান করবার জন্যে বুদ্ধও পর্বতের উপরিভাগে উপযুক্ত স্থানটিতে উপস্থিত থেকে তাঁকে দর্শন দান করতেন। বিম্বিসারের অন্তিম মুহূর্তেও বুদ্ধ এইভাবেই তাঁকে দর্শন দান করেছিলেন। বিম্বিসারের হত্যা বুদ্ধের বিরুদ্ধে দেবদত্তের চক্রান্তের প্রথম পদক্ষেপ।

যেদিন কারাগারে অনাহারে থেকে বিম্বিসারের মৃত্যু হয়, সেদিন অজাতশত্রুর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অজাতশত্রু এবার সন্তানের পিতা হয়ে সর্বপ্রথমে অপত্যস্নেহের আস্বাদ পেল। তখন তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় দেখা দিল যে, তার জন্মের পরে তার পিতার মনেও অনুরূপ অপত্যস্নেহ নিশ্চয়ই সেদিন দেখা দিয়েছিল। একথা মনে করতেই তার অন্তরে পিতার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব স্বাভাবিকভাবেই এসে দেখা দিল। সে তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্যে নিজেই সেখানে ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে। পিতার মৃত্যুতে অজাতশত্রু প্রথমটায় দারুণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়লেও, পরে দেবদত্তের কুহকে পড়ে সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। দেবদত্ত তার নিজের

ইচ্ছামত অজাতশত্রুকে একের পর এক ক্রমাগত ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।



এবার বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্যে দেবদত্ত একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেল। প্রাতঃভ্রমণ ছিল বুদ্ধের নিত্যকার অভ্যাস। রাত্রির তৃতীয় যামে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে, তার পরে তিনি ভ্রমণে বের হতেন, সে সময়ে অপর কেউ বড় একটা শয্যাত্যাগ করতেন না। বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্যে দেবদত্ত এই সময়টিকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে বেছে নিল। অজাতশত্রুর নিকট দেবদত্ত পনের জন তীরন্দাজ চেয়ে পাঠাল। অজাতশত্রু দেবদত্তর প্রার্থনামত গগনবিহারী পাখীকে নিমেষের মধ্যে ভূতলশায়ী করতে পারে, এরকম ধরনের অতি সুদক্ষ পনের জন তীরন্দাজকে দেবদত্তের নিকট প্রেরণ করে। দেবদত্ত সেই পনের জন তীরন্দাজগণের মধ্য থেকে পাঁচজন তীরন্দাজকে পৃথকভাবে গ্রহণ করে বুদ্ধ যে পথে প্রাতঃভ্রমণে যান, সেই পথের ধারে সুবিধামত একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাদের লুকিয়ে থেকে, সেই পথের ধারে একজন প্রাতঃভ্রমণকারীকে দেখামাত্র তীরবিদ্ধ করে তার প্রাণনাশ করবার জন্যে নির্দেশ দেয়। কাজ শেষ হলে তারা কোন পথ ধরে ফিরে আসবে, সেই পথেরও নির্দেশ দেওয়া হল। সেই পাঁচজন তীরন্দাজ কাজ শেষ করার পর যে পথ ধরে ফিরে আসবে, সেই পথের ধারে সুবিধামত একটি স্থানে জঙ্গলের মধ্যে অপর দশজন তীরন্দাজকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। সেই দশজন তীরন্দাজের প্রতি এই নির্দেশ রাখা হল যে, এই পথ দিয়ে পাঁচজন তীরন্দাজ যখন এগিয়ে আসতে থাকবে, তখন তাদের দেখামাত্রই যেন তীরবিদ্ধ করে তাদের সকলকেই বিনাশ করা হয়। দেবদত্ত এমন সুন্দরভাবে সমস্ত পরিকল্পনা এঁটে তার চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল, যাতে বুদ্ধের প্রকৃত হত্যাকারী সম্বন্ধে কোন তথ্যই অবগত হওয়া কখনই সম্ভব হতে না পারা যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই পাঁচজন তীরন্দাজ বুদ্ধের প্রাতঃভ্রমণের পথের ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁর প্রতীক্ষায় তীরধনুক হস্তে নিয়ে তৈরী হয়ে আত্মগোপন করে রইলো। যথাসময়ে বুদ্ধ একাকী সেই পথে দেখা দিলেন। সেই পাঁচজন তীরন্দাজ দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে ধনুতে তীর যোজনা করে তাঁকে হত্যা করবার জন্যে একেবারে তৈরী হয়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে এগিয়ে গেল। অবশেষে তীরনিক্ষেপ করার মত উপযুক্ত একটি স্থানে এসে তারা সকলে মিলে দাঁড়িয়ে পড়লো। ততক্ষণে বুদ্ধ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছেন। সে সময়ে তাদের সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে আগন্তুকের প্রতি। তাঁর প্রতি তাকিয়ে সেই পাঁচজন তীরন্দাজ মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল। তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার কথা তীরন্দাজগণ ততক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে

গিয়েছে। ধনুতে তীর যোজনা করে সেই অবস্থায়ই তারা নিশ্চলভাবে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আগন্তুকের প্রতি। এমন শান্ত সৌম্য পুরুষ ইতিপূর্বে তারা কখনও স্বচক্ষে দেখতে পারেন নি। বুদ্ধ তখন ধীরে ধীরে একেবারে তাদের নিকটে এসে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। তখন তারা তীর ধনু সব কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ করে একসঙ্গে সবাই বুদ্ধের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। এর পর বুদ্ধ তাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন। এর ফলে তারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারা বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ তখন নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জন্যে দেবদত্ত নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর না হয়ে ভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকেন।

এদিকে সেই দশজন তীরন্দাজ শিকারের আশায় উদগ্রীব হয়ে এতক্ষণ ধরে সেই জঙ্গলের মধ্যে অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থেকে, শেষে একেবারে অধৈর্য হয়ে তাদের গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে থাকে। এমন সময়ে তারা দেখতে পেল পাঁচজন নয়, ছয়জন মানুষকে। দেবদত্তের নির্দেশ ছিল পাঁচজন তীরন্দাজ সেই পথ ধরে যখন অগ্রসর হয়ে আসতে থাকবে, তখন যেন গোপন স্থান থেকে তীর ছুঁড়ে তাদের হত্যা করা হয়। সে জায়গায় এখন দেখতে পাওয়া গেল ছয়জনকে এবং তাদের কারুরই হাতে তীর-ধনুক নেই। ক্রমে তারা নিকটবর্তী হতে, সেই দশজন তীরন্দাজ দেখতে পেল যে, ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন তাদের নিজেদেরই লোক। কিন্তু অপর ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কোন পরিচয় তাদের জানা না থাকলেও, তাঁর প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ামাত্র আপনা থেকেই তারা শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবার জন্যে সকলে মিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বুদ্ধ তখন সেই দশজন তীরন্দাজকেও দীক্ষা দান করে তাদের সকলকেই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করালেন। দেবদত্তের ঘৃণ্য চক্রান্তের সব কিছুই তারা তখন পরিস্কারভাবে জানতে পারলেন।

এদিকে অত্যধিক কালবিলম্ব দেখে শেষে একরূপ অধৈর্য হয়েই দেবদত্ত তার নিজের চক্রান্তের ফলাফল জানবার আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে তার গোপন স্থান থেকে পথে বেরিয়ে আসে। এমন সময়ে সেই পনের জন তীরন্দাজদের সঙ্গে বুদ্ধকে আচমকা পথে দেখতে পেয়ে, গা ঢাকা দেবার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে সে বিফল মনোরথ হয়। বুদ্ধ নিজে দেবদত্তকে কিছুই বলেননি, কিন্তু তীরন্দাজগণ দেবদত্তকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন যে, এখন তাদের উচিত তীর ছুঁড়ে দেবদত্তেরই প্রাণনাশ করা। কিন্তু এখন তারা পরশমণির সংস্পর্শ লাভ করতে পেরেছেন। সুতরাং এখন তারা রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সব কিছুই বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং তাদের নিকট থেকে অন্তত দেবদত্তের ভয়ের কোন কারণ নেই। দেবদত্ত এখন নির্ভয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারে। তীরন্দাজগণের মুখে একথা শোনার পর বেত্রাহত কুকুরের ন্যায়

দেবদত্ত সেখান থেকে সরে পড়ে। দেবদত্তের প্রথম চক্রান্ত সম্পূর্ণ বিফল হল। দেবদত্ত যে বুদ্ধের প্রাণ সংহারের চেষ্টায় ছিল বুদ্ধ নিজে তা ভালভাবেই জানতেন। তবু তিনি কখনও কারুর নিকটই দেবদত্তের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ করেননি। এই ঘটনার পর বেণুবনের ভিক্ষুগণ একদিন সায়ংকালীন ধর্মসভায় দেবদত্তের ষড়যন্ত্রের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন হলে, বুদ্ধ সে সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশ করে জানান যে, দেবদত্ত কেবল এ জন্মেই তার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়নি। পূর্বেও সে অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই বলে তিনি দেবদত্তের সেই পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত তাদের নিকট বলতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী "মণিচোর জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

তার প্রথম চক্রান্ত বিফল হবার পর, দেবদত্ত এটা বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হল যে, বুদ্ধের এমন ক্ষমতা রয়েছে, যাতে সে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুকে মিত্র করে নিতে সক্ষম। সুতরাং কোন মনুষ্য দ্বারা বুদ্ধের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা সম্ভবপর হবে না। তাই এবার সে বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্যে ভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। এবার বুদ্ধকে হত্যা করার জন্যে সে বৈজ্ঞানিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করলো। বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূট পর্বত সংলগ্ন সংকীর্ণ পথ ধরে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হবেন সে সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে পর্বতের উপরিভাগ থেকে বৃহৎ একটি শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করে তাঁকে নিষ্পেষিত করে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং সেটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা। এতে সন্দেহ করার মত কিছুই নেই। প্রাকৃতিক কারণেই পর্বতের উপর থেকে শিলাচ্যুত হয়ে বুদ্ধের উপর পতিত হয়ে তাঁর অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়েছে। সাধারণ লোকে অন্ততঃ এটাই বিশ্বাস করবে। দেবদত্তের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অজাতশত্রুর সহায়তায় সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডকে কাষ্ঠ এবং রজ্জুর সাহায্যে এমনভাবে বেঁধে রাখা হল যাতে সামান্য নাড়া দিলেই সেটি স্থানচ্যুত হয়ে প্রবল বেগে নিচের দিকে গড়িয়ে যাবে এবং একেবারে সেই সংকীর্ণ পথটির উপরে গিয়ে পতিত হবে। সে সময়ে সেই পথ দিয়ে যদি কোন পথচারী অগ্রসর হতে থাকে তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

এদিকে বুদ্ধ তাঁর অভ্যাস মত সেদিনও যথাসময়ে গৃধ্রকূট পর্বতের আশ্রম থেকে প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন সেই পথে। উপযুক্ত স্থানের নিকটবর্তী অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্তের নির্দেশ মত সেই সুবিশাল শিলাখণ্ডটির রজ্জু বন্ধন ছিন্ন করে সেটিকে নিচের দিকে গড়িয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল শিলাখণ্ডটি ভীমনাদে প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে বুদ্ধ যেখানে ছিলেন ঠিক সেই স্থানটি থেকে সামান্য একটু ব্যবধানে পথের উপরে গিয়ে সজোরে আছড়ে পড়লো। ঈষৎ ব্যবধানের জন্যে বুদ্ধ সে যাত্রা রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু শিলাখণ্ডটি থেকে সামান্য একটু অংশ ছিটকে গিয়ে বুদ্ধের দক্ষিণ

পায়ে আঘাত করে একটু ক্ষতের সৃষ্টি করে। তখনকার দিনের রাজগৃহের তথা সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বুদ্ধশিষ্য জীবকের অত্যাশ্চর্য চিকিৎসার গুণে তিনি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করেন। দেবদত্তের এই ঘৃণ্য এবং অমানুষিক আচরণের বিষয় নিয়ে বেণুবনের ভিক্ষুগণ একদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলে, বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের বলেন যে, দেবদত্ত কেবল এজন্মেই তাঁকে শিলা নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করেনি। পূর্বেও সে অনুরূপভাবে একবার শিলা নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। সমবেত ভিক্ষুগণের অনুরোধে বুদ্ধ তখন তার সেই অতীত জন্মের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী "মহাকপি জাতক" কাহিনী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

বুদ্ধের প্রাণনাশ করবার জন্যে দ্বিতীয় বারের চেষ্টা বিফল হবার পরও দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশের সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। বুদ্ধকে হত্যার জন্যে দেবদত্ত পুনরায় নতুন করে উপায় উদ্ভাবন করতে আরম্ভ করে দেয়। এজন্য অজাতশত্রুর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তার বেশ কয়েকবার ঘন ঘন গোপন বৈঠকও বসে। বুদ্ধকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অজাতশত্রুও পুরোদমে কাজে নেমেছিল। অজাতশত্রুর নালাগিরি নামে একটি বিশালকায় হস্তী ছিল। সেটি ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির। কেউই সহজে নালাগিরিকে বশ মানাতে সক্ষম হত না। অজাতশত্রুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে দেবদত্ত শেষ পর্যন্ত হস্তীটিকেই তার কার্যোদ্ধারের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে তার সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত বেছে নিল। ঠিক হল নালাগিরিকে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়ে উন্মত্ত অবস্থায় বুদ্ধের প্রাতঃভ্রমণ সময়ে তাকে সেই পথে ছেড়ে দেওয়া হবে। যাতে সে অনায়াসেই বুদ্ধকে পদদলিত করে বিনষ্ট করতে পারে। বুদ্ধকে হত্যার জন্যে দেবদত্তের এই অভিসন্ধি গোপন থাকেনি। ক্রমে তা জানাজানি হয়ে গেল এবং বুদ্ধও শুনলেন দেবদত্তের সেই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা। সব জেনেশুনেও বুদ্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন এবং তাঁর প্রাত্যহিক কাজকর্ম পূর্বের মতই নির্বিকারচিত্তে সমাপন করে যেতে থাকেন। দেবদত্তের চক্রান্তের বিষয় সব কিছু জেনেও, যেন কিছুই জানেন না তিনি, এমন ভাব দেখাতে লাগলেন। প্রতিদিনের ন্যায় দেবদত্তের চক্রান্তের সেই নির্দিষ্ট দিনটিতেও তিনি তাঁর অভ্যাসমত একাকী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। রাজধানীর রাজপথ সাধারণতঃ জনাকীর্ণ থাকলেও বুদ্ধ যে সময় প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন সে সময়ে নির্জনই থাকতো। রাজপথে সে সময়ে কদাচিৎ একটি দু'টি লোকই কেবল যাতায়াত করতো। বুদ্ধ যখন একাকী সেই রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সে সময়ে লোকজন কেউই ছিল না। এমন সময়ে পানোন্মত্ত অবস্থায় নালাগিরিকে সে পথে ছেড়ে দেওয়া হল। পানোন্মত্ত নালাগিরি বিকট চিৎকার করতে করতে চতুর্দিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তার

প্রকাণ্ড শুণ্ড শূন্যে আস্ফালন করতে করতে প্রচণ্ড বেগে বুদ্ধের প্রতি ধেয়ে আসতে থাকে। বুদ্ধ নির্বিকারভাবে পূর্বের মতই পথ চলতে থাকেন। এমন সময়ে শিশু সন্তান ক্রোড়ে এক অনাথা রমণী অকস্মাৎ সেই মত্ত হস্তীর সম্মুখে পড়ে গেল। সেই অনাথা রমণীকে দেখামাত্র নালাগিরিও তার প্রকাণ্ড শুণ্ড আস্ফালন করে তার দিকে ধেয়ে গেল। এমন সময়ে বুদ্ধ তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে নালাগিরিকে উদ্দেশ করে সিংহবিক্রমে বলে উঠলেন, "দেবদত্ত আমাকে হত্যা করবার জন্যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে। তবে আমাকে ছেড়ে এই অনাথা রমণীর প্রতি তোমার আক্রোশ কি জন্যে ?" বুদ্ধের কথায় উন্মত্ত নালাগিরি মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শান্তভাব ধারণ করলো। সে তখন ধীরে ধীরে বুদ্ধের নিকট অগ্রসর হয়ে প্রথমে শুণ্ড দ্বারা তাঁর চরণ যুগল স্পর্শ করলো। তারপর তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উপবেশন করে শুণ্ড উত্তোলন করে প্রণাম নিবেদন করে, সেই অবস্থায় অবস্থিতি করতে থাকে। বুদ্ধ তখন তাঁর মস্তকে অভয় হস্ত স্থাপন করে তাকে আশীর্বাদ জানালেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা শ্রেণীর বাতায়ন পথে রাজগৃহের অধিবাসীগণের অনেকের ভাগ্যেই সেদিন এই স্বর্গীয় নাটক অভিনয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তাদের জীবন ধন্য করার সুযোগ হয়েছিল। এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারা সেদিন অতিমাত্রায় পুলকিত হয়ে বিপুল হর্ষধ্বনি করে ওঠেন এবং নিজ নিজ গাত্র থেকে অলংকারপত্র উন্মোচন করে নালাগিরির উদ্দেশে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। সেই থেকে নালাগিরির নতুন নামকরণ করা হয় 'ধনপালক'। অজন্তার ষোল নম্বর গুহার প্রবেশ পথের ঠিক উপরের অংশে এই ঘটনাটিকে ধারাবাহিক আকারে চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়েছে। নাম না জানা শিল্পীর রচিত সেই অপূর্ব চিত্রসম্ভার ক'খানি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচনা করা হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন। সেই অপূর্ব চিত্রসম্ভার এখনও প্রায় অটুট অবস্থায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই চিত্রসম্ভারের মধ্যে সেকালের জ্ঞাতব্য বিষয়-বস্তুর অনেক কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে।

বুদ্ধকে হত্যার জন্যে দেবদত্তের তৃতীয় চেষ্টাও বিফল হল। পর পর তিন বার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হবার পর দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যার জন্যে আর অগ্রসর হয়নি। বুদ্ধের সর্বনাশ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এল। একমাত্র অজাতশত্রু ব্যতীত রাজগৃহের প্রতিটি নরনারী দেবদত্তের এই জঘন্য আচরণের জন্যে একেবারে তিক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তারা দেবদত্তের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। লোকসমাজে দেবদত্তের মান-মর্যাদা বলতেও আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করাও তার পক্ষে তখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কেবল দেবদত্তই নয়, তার আশ্রমস্থ সকলের ভাগ্যেই ওই একই অবস্থা দেখা দিল, কেউই তাদের ভিক্ষান্ন দেবার জন্যে

এগিয়ে আসতেন না। এর ফলে ভিক্ষুগণ একে একে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজগৃহের দেবদত্তের আশ্রম ফাঁকা হয়ে গিয়ে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াল। তার প্রধান সহায় তখন একমাত্র কোকালিক। কোকালিক লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দেবদত্তের মহিমা প্রচার করতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু তাতে কোন ফল দেখা দিল না। লোকে দেবদত্তের নাম শুনলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে লাগলেন। বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমে অবধি দেবদত্ত ক্রমাগত একটির পর একটি ভুল করেছিল। এতদিনে সে এবার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলো যে, বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমে তার কোন লাভ হয়নি। উপরন্তু সবদিক থেকেই তার প্রচণ্ড রকমের ক্ষতিই হয়েছে। নিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে নিয়ে এসেছে। এজন্য সে কাউকেই দায়ীও করতে পারলো না। তখন তার মনে বিষম অনুশোচনা এসে উপস্থিত হল। এবার সে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে তার লুপ্ত ঋদ্ধিবল, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সবকিছু ফিরে পাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল, বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করে এর প্রতিকারের জন্য সে এবার তৈরী হল। কিন্তু বুদ্ধ তখন রাজগৃহে নেই। নালাগিরির সেই ঘটনার পর বুদ্ধ সদলবলে রাজগৃহের বেণুকুঞ্জের আশ্রম থেকে জেতবনের আশ্রমে চলে গিয়েছেন। বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করবার জন্যে দেবদত্ত তখন জেতবনে যাবার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলো। জেতবনে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনের সবকিছু ভার অর্পিত হল কোকালিকের উপর। অবশেষে কোকালিকের ব্যবস্থাপনায় পালকীতে চেপে দেবদত্ত জেতবনে বুদ্ধের আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই তার শেষ যাত্রা।

যথাসময়ে বুদ্ধ শুনতে পেলেন, দেবদত্ত রাজগৃহ থেকে আসছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে মার্জনা ভিক্ষা করবার আশা নিয়ে। দেবদত্তের আগমনের বার্তা শুনে বুদ্ধ আশ্রমস্থ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "আমার সঙ্গে দেবদত্তের সাক্ষাৎ হবে না।" বুদ্ধের মুখ থেকে উচ্চারিত এই কটি শব্দ সেদিন জেতবন আশ্রমের সায়ংকালীন ধর্ম অধিবেশনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে, হঠাৎ দেখা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া বিজলীর মতই যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিল। পর দিবস প্রাতঃকালেই দেবদত্তের পালকী এসে দাঁড়াল জেতবন আশ্রমের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে। দেবদত্ত পালকী থেকে অবতরণ করে যখন জেতবন আশ্রমে প্রবেশ করবার জন্যে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, এমন সময় ভূমি অকস্মাৎ বিদীর্ণ হয়ে তাকে গ্রাস করে নিল। বৌদ্ধজগৎ এবং পৃথিবী থেকে দেবদত্ত চিরদিনের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করল। বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমে প্রথমে রূপসী নারী চিঞ্চা মানবিকা, তারপর সুন্দরী নাম্নী বারাঙ্গনা, বুদ্ধের শ্বশুর কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধ এবং সর্বশেষে দেবদত্ত, এই চারজন একে একে অধোগামী হয়। বৌদ্ধগণ

বিশ্বাস করেন, যেহেতু দেবদত্ত তার অন্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণ কামনায় অগ্রসর হয়েছিল, সেহেতু তার কৃত অপরাধের দরুণ শাস্তির অবসানে, সে আবার বুদ্ধের কৃপালাভ করতে সমর্থ হবে।

দেবদত্তের প্রধান সহায় ছিল পিতৃহন্তা অজাতশত্রু। দেবদত্তের কুহকে মজে অজাতশত্রুর ধারণা জন্মেছিল যে, দেবদত্তই সত্যি সত্যি বুদ্ধ। সে জন্যে সে সর্বপ্রকারে দেবদত্তের সহায়তা করতে গিয়ে বুদ্ধের বিরোধিতায় নেমেছিল। এমন কি দেবদত্তের দ্বারা বুদ্ধের প্রাণ সংহারের অপচেষ্টাকেও সে কোন দিন ঘৃণার চক্ষে দেখেনি। এবারে দেবদত্তের অপমৃত্যুতে তার চৈতন্যোদয় হল। এবার তার প্রাণেও নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার হল। দেবদত্তের কুহকে পড়ে সে তার পিতাকে কারাগারে রেখে অনাহারে তাকে তিলে তিলে হত্যা করেছে। তার পর বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়ে সে তার প্রাণ সংহারের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দেবদত্তকে সাহায্য করেছে। এবারে, সে সব পাপের ফল তাকেও ভোগ করতে হবেই। সর্বক্ষণই তার মনে হতে থাকে এবারে দেবদত্তের মতই ভয়ংকর দণ্ড তাকেও ভোগ করতে হবে। পিতৃহত্যার পর থেকে অজাতশত্রুর মনে শান্তি বলে কিছু ছিল না। তার উপরে মাতা কোশলদেবীও আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে তার স্বামী বিম্বিসারের ন্যায় তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। পিতৃহন্তার দরুণ তার হৃদয় সর্বক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছিল, এখন তার উপরে মাতা কোশলদেবীর মৃত্যু সেই জ্বালাকে আরও শতগুণে বাড়িয়ে দিল। এবারে দেবদত্তের অপঘাত মৃত্যুর পর রাজা অজাতশত্রু একেবারে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ল। সেই আতঙ্ক থেকে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে সমর্থ হল না। নিদারুণ দণ্ডভীতি তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল। তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ল।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের পিতা রাজা মহাকোশল মগধ নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর নিজ কন্যা কোশলদেবীর বিবাহের সময় কন্যার স্নানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে জামাতা বিম্বিসারকে কাশী প্রদেশটি যৌতুক হিসাবে দান করেছিলেন। বিম্বিসারের হত্যার পর এবং ভগিনী কোশলদেবীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা প্রসেনজিৎ কাশী প্রদেশটি অধিকার করে নেন। এ ব্যাপার নিয়ে অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁর মাতুল কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রচণ্ড রকমের বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধ যুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।

মামা ভাগ্নের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম প্রথম কোশল রাজ প্রসেনজিৎ ভাগিনেয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ কিছু সুবিধে করে নিতে সমর্থ হলেন না। একবার তাকে পরাজিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন পর্যন্ত করতে হয়েছিল। শেষে ছদ্মবেশে এক মালাকারের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে কিছুদিন পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছিল। সেই মালাকারের মল্লিকা নামে এক পরমা সুন্দরী

কন্যা ছিল। প্রসেনজিৎ সেই কন্যাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। পরে যখন তিনি পুনরায় নিজ রাজধানীতে ফিরে আসতে সমর্থ হলেন, তখন সেই কন্যাকে বিবাহ করে রাজপুরীতে নিয়ে আসেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে মালাকার কন্যা মল্লিকার উল্লেখ এবং তাঁর প্রশস্তির উল্লেখ বারংবার দেখতে পাওয়া যায়। মালাকার কন্যা মল্লিকা, বৌদ্ধ সাহিত্যে নিজেকে চিরকালের জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

ভাগিনেয় অজাতশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হবার পর প্রসেনজিৎ একদিন নিশীথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন রাজসভার অধিবেশন আহ্বান করে অমাত্যগণকে এই পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হতে নির্দেশ দেন। রাজার আজ্ঞাক্রমে আমত্যগণ জানালেন যে, জেতবনের ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং মন্ত্রণাকুশলী। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করাটাই উত্তম ব্যবস্থা হবে। আমত্যগণের কথা শুনে রাজা প্রসেনজিৎ তক্ষুণি কয়েকজন বিশেষ অনুচরকে জেতবনের আশ্রমে প্রেরণ করেন। তাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হল, যে ভিক্ষুগণ রাজা, প্রসেনজিতের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে কি বলেন, তা ভাল ভাবে জেনে আসার জন্যে। তখনও রাত্রি প্রভাত হতে অনেক বাকী। সে সময়েই অনুচরগণ জেতবন আশ্রমের উদ্দেশ্যে পথে বের হয়ে গেলেন। অনুচরগণ আশ্রমের নিকটে ভিক্ষুগণের একটি পর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে প্রদীপের আলোক দেখতে পেয়ে, সেই কুটীরের নিকটে গিয়ে নিঃশব্দে সেখানে অবস্থিত করতে থাকেন। সেই কুটীরটিতে ভিক্ষু উপ্ত ও ভিক্ষু ধনুগ্রহ তিষ্য নামে দু'জন স্থবির বাস করতেন। স্থবির দুজনের মধ্যে স্থবির উপ্তের তখন সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে এবং স্থবির ধনুগ্রহ তিষ্য তখনও শয্যাই গ্রহণ করেন নি। প্রচণ্ড রকমের মানসিক উদ্বেগের ফলে সমস্ত রাতটুকুই তিনি জাগ্রত অবস্থার মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন, শয্যা গ্রহণ করতে পারেন নি। তার উদ্বেগের একমাত্র কারণ রাজা প্রসেনজিতের যুদ্ধে বার বার শোচনীয় পরাজয়। নিদ্রাভঙ্গের পর স্থবির উপ্ত যখন স্থবির ধনুগ্রহ তিষ্যকে তার উদ্বেগের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বেশ রুষ্টভাবেই বলে বসলেন, রাজা প্রসেনজিৎ যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সামান্য একটা অর্বাচীনের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়ে কেবল অর্থব্যয় করে নিষ্কৃতি লাভ করছেন। স্থবির তিষ্যের কথা শুনে স্থবির উপ্ত তখন তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে রাজা প্রসেনজিৎকে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে? স্থবির উপ্তের প্রশ্নের উত্তরে স্থবির ধনুগ্রহ তিষ্য তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই মনু সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যূহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, ব্যূহভেদে যুদ্ধ হয় তিন প্রকার। যথা—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ। এরপর অজাতশত্রুর সঙ্গে কোথায় এবং কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করলে তাকে ইঁদুরের

ন্যায় অতি সহজেই পিঞ্জরাবদ্ধ করা যাবে, সে সম্বন্ধেও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। কুটিরের পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান থেকে কোশলরাজের অনুচরগণ বিশেষভাবে তা শ্রবণ এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। তারা তন্মুহূর্তেই সেখান থেকে একেবারে রাজসমীপে এসে উপস্থিত হয়ে, যুদ্ধ সম্বন্ধে স্থবির ধনুগ্রহ তিষ্যের মতামত সবিস্তারে রাজার নিকট বর্ণনা করেন। রাজা প্রসেনজিৎ স্থবিরের পরামর্শ গ্রহণ করে সেই অনুসারে সৈন্য সমাবেশ করে অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করবার জন্যে প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন। রাজার আদেশে প্রধান সেনাপতি পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে শকটব্যূহ রচনা করে, অজাতশত্রুকে আক্রমণ করে তাকে অনায়াসেই যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী করতে সমর্থ হন। পরে বন্দী অবস্থায় অজাতশত্রুকে কোশলরাজের সম্মুখে এনে উপস্থিত করেন। পরাজিত অজাতশত্রুর প্রতি প্রসেনজিৎ সদয় ব্যবহার করেছিলেন। পরে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। কোশলরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে নিজের এক কন্যার বিবাহ দেন এবং কন্যার স্নানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কাশী প্রদেশ যৌতুক হিসেবে পুনরায় অজাতশত্রুকে প্রদান করেন। একমাত্র স্থবির ধনুগ্রহ তিষ্যের সমর কৌশল গ্রহণ করেই প্রসেনজিৎ সমরে জয়লাভ করেছিলেন, এ সংবাদ ক্রমে প্রচারিত হয়ে গেল। জেতবনের ধর্মসভায় ভিক্ষুগণ একদিন স্থবির তিষ্যের সমর কৌশল সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনারত ছিলেন, সে সময়ে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যে স্থবির ধনুর্গ্রহ তিষ্য কেবল এজন্মেই যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি, পূর্বজন্মেও তিনি যুদ্ধবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। তখন সমবেত ভিক্ষুগণের একান্ত অনুরোধে, বুদ্ধ স্থবির তিষ্যের সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেন। স্থবির তিষ্যের সেই পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত "বর্ধকি শূকর" জাতক কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে।

কোন কিছুতেই অজাতশত্রুর মনে শান্তি ফিরে এল না। এক স্থানে অধিক সময় কখনও তিনি স্থির হয়ে কাটাতে পর্যন্ত পারতেন না। এমনি হয়ে, দাঁড়িয়েছিল তার মানসিক অবস্থা। এর ফলে তার স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তিনি রাজগৃহে চিকিৎসক জীবকের শরণাপন্ন হলে, জীবক অজাতশত্রুকে কোন ঔষধ অথবা পথ্যের বিধান না দিয়ে, তাকে কেবল বুদ্ধের শরণাপন্ন হতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, বুদ্ধই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারাই আপনার মর্মবেদনার উপশম ঘটাতে সক্ষম। সুতরাং ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে তার উপদেশ অনুসারে চলতে পারলে তবেই তিনি মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। জীবকের কথা শুনে, রাজার অমাত্যগণের মধ্যে যারা তীর্থিকগণের শিষ্য ছিলেন,

তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ গুরুর নিকট রাজাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবার জন্যে বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। তাদের এই ব্যগ্রতার মূলে রাজনৈতিক কারণ যতটা নিহিত ছিল, রাজার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য ততটা নিহিত ছিল বলে মনে হয় না। তীর্থিক সম্প্রদায় এই সুযোগে যদি একবার রাজানুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হতে পারেন, তবে রাজ্যমধ্যে তীর্থিকগণের প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাবে। সে তুলনায় বৌদ্ধগণের উদীয়মান প্রাধান্যে যথেষ্ঠ ভাঁটা পড়বে। সেই আশায় উৎসাহিত হয়ে তীর্থিক অমাত্য-বর্গের প্রত্যেকেই তখনকার দিনের রাজগৃহের তীর্থিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীবর্গের নামোচ্চারণ করে তাদের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত করে, শেষে রাজাকে তাদের নিজ নিজ গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে দীক্ষা নেবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করেন। অজাতশত্রু কিন্তু তাদের কারুরই কথায় সেদিন কর্ণপাত পর্যন্ত করেননি। তার লক্ষ্য ছিল একমাত্র রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শের প্রতি। সকলের বক্তব্যের শেষে অজাতশত্রু জীবককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, "আপনি আমায় ভগবান বুদ্ধের নিকট নিয়ে চলুন। আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র তিনিই আমাকে পরিত্রাণ করতে পারবেন। তাঁর উপদেশামৃত গ্রহণ করেই আমি তৃপ্তি লাভ করতে পারবো।" রাজার কথা শুনে জীবকও বলে উঠলেন, "আপনি এবার উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আপনি ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করুন, তার মুখ থেকে ধর্মকথা শ্রবন করুন - আপনার মনে যে সমস্ত সংশয় দেখা দিয়ে আপনার পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে একমাত্র তাঁকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যথাযথ উত্তর লাভ করে আপনার মনের নষ্ট শান্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনুন।

জীবকের কথা শুনে অজাতশত্রু তক্ষুনি বুদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হবার জন্যে যান বাহন প্রস্তুত করার জন্যে আদেশ দিলেন। জীবক অজাতশত্রুকে সঙ্গে নিয়ে আম্রকাননে বুদ্ধের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। জীবক যে সময়ে অজাতশত্রুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের আশ্রমে প্রবেশ করেন, সে সময়ে বুদ্ধ ধর্মসভায় ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। অগণিত ভিক্ষু ও ভক্তগণ সে সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণীসকল গ্রহণ করছিলেন। অজাতশত্রু সেই ধর্মসভায় প্রবেশ করে এত লোকের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে জীবকের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অজাতশত্রু বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেন। বুদ্ধ তখন তাকে সভার একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করে উপবেশন করবার জন্য ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় বুদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে অজাতশত্রু ধীরে ধীরে তার আসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নীরবে দণ্ডায়মান হলেন। বুদ্ধ রাজাকে প্রথমে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে, তারপর আশ্রমে তার আগমনের হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধের কথার উত্তরে

অজাতশত্রু তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অজাতশত্রুর সেই প্রশ্নখানি 'শ্রমন্যফল প্রশ্ন' নামে বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন বলে স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে এবং বুদ্ধ তার উত্তর দান করতে গিয়ে অংশদ্বয় বিশিষ্ট যে শ্রমন্যফল সূত্র ব্যাখ্যা করেন, তা 'সংশয় নিরাকারক' নামে বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

অজাতশত্রু বুদ্ধকে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার প্রকৃত তাৎপর্য হল যে, প্রত্যেক কর্মের পিছনেই একটি করে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। লোকে কর্ম করে নিজের কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির আশায়, নয়ত নিজের সদ্‌গতির জন্যে। অযথা এবং বিনা কারণে কেউ কখনও কোন কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। যারা শিল্প কর্মে নিযুক্ত থাকেন, তারা তাদের শিল্পজাত দ্রব্য সকল দ্বারা অর্থ উপার্জন করে থাকেন। সেরকম, যারা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন, তাদের ভাগ্যে শিল্পীর তৈরী শিল্পজাত বস্তু বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের মত কোন প্রত্যক্ষ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা? অজাতশত্রুর এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধ একটি উপমাদ্বারা সমস্ত বিষয়টি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শেষে বলেন, যে সন্ন্যাস ধর্মেও প্রত্যক্ষ ফল লাভের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। বুদ্ধের নিকট থেকে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লাভ করে অজাতশত্রু পরম প্রীতি লাভ করেন। এরপর অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে, তার কৃতকর্মের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভ করে পুনরায় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই থেকে অজাতশত্রু বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং উত্তরকালে বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্যরূপেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাজগৃহে তিনি একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেই স্তূপটির সামান্য কিছু কিছু অংশ আজও বর্ত্তমান রয়েছে। বিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং প্রসেনজিৎ এই তিনজন নৃপতির নামের উল্লেখ বৌদ্ধসাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখতে পাওয়া যায়।

আম্রকাননের আশ্রম থেকে অজাতশত্রুর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, অজাতশত্রু রাজ্যলোভে পড়ে তার পরম ধার্মিক পিতার প্রাণসংহার করে অতিগুরুতর অন্যায় কাজ করেছে। যদি সে এতবড় অন্যায় কাজ না করতো, তবে আজই সে এখানে এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ধর্মচক্ষু লাভ করতে সমর্থ হত। কিন্তু ধর্মচক্ষু লাভ করা দূরে থাকুক, দেবদত্তের অসৎ সংসর্গে পড়ার ফলে সে স্রোতাপত্তি ফলটুকুও লাভ করতে সমর্থ হয়নি। অজাতশত্রু নিজেই নিজের সর্বনাশ সাধন করেছে। পরের দিন ধর্মসভার অধিবেশনের প্রাক্কালে ভিক্ষুগণ অজাতশত্রুর বিষয় নিয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিলেন, সে সময়ে বুদ্ধ ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে তাদের আলোচ্য বিষয় বস্তু সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের

উদ্দেশ্য করে বলেন যে, অজাতশত্রু কেবল এ জন্মেই তার নিজের সর্বনাশ সাধন করেনি, পূর্বেও সে একবার অনুরূপভাবে কুসংসর্গে পড়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এই বলে বুদ্ধ অজাতশত্রুর সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করেন। অজাতশত্রুর সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত "সঞ্জীব জাতক" কাহিনী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

সামান্য ঘরের মালাকারের কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করার পর রাজা প্রসেনজিতের মনে বংশ মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে একটা দুর্বলতার ভাব দেখা দিয়েছিল। তিনি তখন উচ্চবংশজাত একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সেই অভাব মোচন করবার জন্যে উদ্যোগী হলেন। তখনকার দিনে বুদ্ধের বংশ শাক্য বংশীয়গণ ছিলেন কুলে শীলে সর্বদিক থেকেই প্রধান ও অগ্রগণ্য। বুদ্ধের পিতা রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর কপিলাবস্তুর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাম। রাজা প্রসেনজিৎ একটি শাক্যবংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজা মহানামের নিকট একজন বিশেষ দূতকে প্রেরণ করেন। শাক্য বংশীয়গণ ছিলেন অতিমাত্রায় জাত্যাভিমানী। নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট তারা কন্যা সম্প্রদান করতেন না। তবে রাজা প্রসেনজিতের ন্যায় একজন পরাক্রমশালী নরপতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দূতকে বিদায় দিলে, ভবিষ্যতে শাক্যকুলের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, এই আশংকায় রাজা মহানাম উভয় দিক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নাগমুণ্ডা নামে দাসীর গর্ভজাত তার কন্যা বাসব ক্ষাত্রিয়াকে রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করে দূতকে বিদায় দেন। রাজা প্রসেনজিৎ সন্তুষ্ট চিত্তে রাজা মহানামের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর যথাসময়ে রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বাসব ক্ষাত্রিয়ার বিবাহ হয়। বাসব ক্ষাত্রিয়ার গর্ভে রাজা প্রসেনজিতের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম রাখা হয় বিরূঢ়ক। বাসব ক্ষাত্রিয়ার পুত্র বিরূঢ়ক বয়ঃপ্রাপ্তির পর একবার তার মাতুলালয় কপিলপুরীতে গমন করেন। সেখানে ঘটনাচক্রে একদিন সে তার জননীর প্রকৃত পরিচয় জানতে সমর্থ হয়। রাজা প্রসেনজিৎ যখন জানতে পারলেন যে তার স্ত্রী বাসব ক্ষাত্রিয়া শাক্যরাজ মহানামের কন্যা হলেও সে দাসীর গর্ভজাতা এবং শাক্যগণ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেই তার সঙ্গে দাসীর গর্ভজাতা কন্যার বিবাহ দিয়ে চাতুরী করেছেন, তখন তিনি ক্রোধে একেবারে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়েন। তার মনে তখন প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা প্রবল হয়ে দেখা দিলেও প্রবল পরাক্রান্ত শাক্যরাজ মহানামের বিরুদ্ধে তা কার্যে পরিণত করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সেদিকে সুবিধা করে উঠতে না পেরে, সহজে যে কাজটি তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল, তিনি সেই কাজটিই করে বসলেন। অর্থাৎ বাসব ক্ষাত্রিয়া এবং তার পুত্র বিরূঢ়ককে সর্বপ্রকার রাজসম্মান থেকে বঞ্চিত করে তাদের একেবারে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত করে

রাজপুরী থেকে নির্বাসিত করেন। বিরূঢ়ক তার নিজের পুত্র হলেও তাকেও তিনি পৈত্রিক রাজ্যের ভবিষ্যত অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। বুদ্ধ সে সময়ে জেতবনের আশ্রমে ছিলেন। বাসব ক্ষত্রিয়া এবং তার পুত্র বিরূঢ়কের কোশল রাজপুরী থেকে নির্বাসনের সংবাদ শুনে, তিনি স্বয়ং একদিন এসে উপস্থিত হলেন কোশল রাজপুরীতে। বুদ্ধ প্রসেনজিৎকে বোঝাতে চাইলেন যে, বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রাজকুলে, তার বিবাহ হয়েছে রাজার সঙ্গে। বাসব-ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সেও রাজপুত্রই। সুতরাং তাদের রাজসম্মান প্রভৃতি ক্ষুন্ন করে তাদের রাজপুরী থেকে নির্বাসন দেওয়া মোটেই উচিত নয়। আর তা ছাড়া কোশল রাজপুত্র বিরূঢ়ককে তার পৈতৃক রাজ্যের ভবিষ্যত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। বুদ্ধ এর পর "কাষ্ঠহারী" জাতকের কাহিনী রাজার নিকট বিবৃত করলেন। এর পরেও কিন্তু রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। বুদ্ধের শত অনুরোধ সত্বেও তিনি পত্নী ও পুত্রকে পুনরায় গ্রহণ করে নিতে পারলেন না। তার অন্তরে তখন মান ও মর্যাদার প্রশ্নই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে বাসব ক্ষত্রিয়া শেষ পর্যন্ত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে গমন করলেন। কিন্তু সেখানেও মাতা পুত্র আশ্রয় লাভ করতে পারে নি। মাতা ও পুত্রের প্রতি নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করে শাক্যগণ তাদের সেখান থেকে দূর করে দিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন বাদে বুদ্ধ জেতবনের আশ্রম ত্যাগ করে পুনরায় বেনুকুঞ্জের আশ্রমে কিছুদিনের জন্যে ফিরে এলেন। বেনুকুঞ্জের উপাশ্রয়ে তখন বুদ্ধজায়া যশোধারা ছিলেন। যশোধারা প্রথমে অন্যান্য শাক্য রমণীগণের সঙ্গে বৈশালীর কুটাগারশালায় উপস্থিত হয়ে আর্যা গৌতমীর নিকট থেকে প্রবজ্যা গ্রহণ করে, তারপর শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে গিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করে তাঁর নিকট থেকে উপসম্পদা লাভ করেন। উপসম্পদা লাভ করার পর তিনি আর বৈশালীতে ফিরে যাননি। জেতবনের ভিক্ষুণী সংঘেই অবস্থান করতে থাকেন। বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্হত্ত্ব লাভ করার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল জীবনের বাকী দিন কটি তিনি নিভৃতে জেতবনের আশ্রমেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সেটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যশোধারা জেতবনের উপাশ্রয়ে অবস্থান করছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হবার পর, কপিলাবস্তুর এবং কোলির প্রজাগণ তাঁর নিকট এত অধিক পরিমাণে উপহার সামগ্রী প্রেরণ করতে আরম্ভ করলেন, যার ফলে তিনি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে একরূপ তিক্ত বিরক্ত হয়েই তিনি শ্রাবস্তীর ভিক্ষুণী সংঘ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। শ্রাবস্তী ত্যাগ করে তিনি রাজগৃহে চলে আসেন এবং সেখানকার উপাশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন, বুদ্ধ জেতবনের আশ্রম থেকে রাজগৃহের

বেনুকুঞ্জে আসার অল্প কয়েকদিন পরে তিনি নির্বাণ লাভ করেন। পুত্র রাহুল বহুদিন পূর্বেই নির্বাণ লাভ করে চলে গিয়েছেন। যশোধারা যখন নির্বাণ লাভ করেন, বুদ্ধের বয়স তখন আটাত্তর বছর। আর মাত্র দু'বছর বাদে তিনিও মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন।

বাসব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢক তার পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় কুলের পরিজনদের দ্বারা নির্মম ভাবে অপমানিত হয়ে শেষে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে তখন এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে সর্বপ্রথমে তার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করে। বিরূঢক অতি সহজেই কোশল রাজধানী শ্রাবস্তী অধিকার করে ফেলাতে সমর্থ হয়। বিরূঢক অপমানের জ্বালায় তার পিতাকেও হত্যা করতে পারে এই আশঙ্কায় রাজা প্রসেনজিৎ ছদ্মবেশে রাজপুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। রাজধানী থেকে দূরে এক নির্জন স্থানে তিনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আত্মগোপন করে রইলেন। পরে তিনি তার ভাগিনেয় অজাতশত্রুর সাহায্যে নিজ রাজ্য পুনরাধিকারের আশা নিয়ে সেই ছদ্মবেশেই রাজগৃহে এসে উপস্থিত হলেন। প্রসেনজিৎ যখন রাজগৃহে এসে উপস্থিত হলেন, তখন গভীর রাত্রি। বাকী রাতটুকু কোনমতে কাটিয়ে পরদিবস প্রাতঃকালে ভাগিনেয়ের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হবেন স্থির করে, সেই গভীর রাত্রে অপর কারুর নিদ্রার ব্যাঘাত না করে এক গৃহস্থের কুটীর প্রাঙ্গণের সম্মুখে সামান্য শয্যা রচনা করে, সেই শয্যা গ্রহণ করেন। সেই তার শেষ শয্যা গ্রহণ। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করার সাথে সাথেই তিনি গভীর ভাবে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তার সেই নিদ্রা আর ভঙ্গ হয়নি। নিদ্রিত অবস্থায়ই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেলেন। পরদিন প্রভাতে রাজগৃহবাসী সকলেই জানতে পারলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের সেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পরলোক গমনের বার্ত্তা। তখন সকলেই দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলেন সেই গৃহস্থের কুটীরের সম্মুখে। স্বয়ং অজাতশত্রুও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। অজাতশত্রুর নির্দেশে পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় কোশলরাজ প্রসেনজিতের মরদেহের সৎকার সাধন করা হয়। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তাঁর একজন প্রধান ভক্ত চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে কেবলমাত্র ক্রোধের বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিজের স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার ফলেই তার এই শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়েছিল। যথাসময়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করলে রাজা প্রসেনজিৎ এরকম ধরণের শোচনীয় পরিণতির হাত থেকে অন্ততঃ রক্ষা পেতে পারতেন।

রাজা প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর বিরূঢক তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। বুদ্ধ তার স্বজাতীয়গণকে রক্ষা করবার জন্যে ঋদ্ধিবলে বিরূঢকের পূর্বেই কপিলাবস্তু পৌঁছে এক বটবৃক্ষের নিচে

আসন গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। বিরূঢ়ক বুদ্ধকে দেখে তাঁর নিকটে এসে প্রথমে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করে, তারপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে সেখানে সে অবস্থায় তাঁকে একাকী অবস্থান করতে দেখে, এর হেতু জিজ্ঞাসা করায় বুদ্ধ তাকে জানালেন যে, জ্ঞাতিগণের সান্নিধ্যই সবচেয়ে শীতল। একথায় বিরূঢ়ক বুঝে নিতে সমর্থ হলো যে বুদ্ধ তাঁর জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের জন্যই সেখানে অবস্থিতি করছেন। বিরূঢ়ক এরপর কপিল পুরীর দিকে অগ্রসর না হয়ে শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বুদ্ধও ঋদ্ধিবলে পুনরায় জেতবনে ফিরে আসেন।

শ্রাবস্তীতে ফিরে এসেও বিরূঢ়ক তার অপমানের জ্বালা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পুনরায় সে সৈন্য সংগ্রহ করে কপিল রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হয়। সে বারেও বুদ্ধ অনুরূপভাবে তার জ্ঞাতিগণকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এভাবে পর পর তিনবার তিনি বিরূঢ়কের হাত থেকে কপিল-পুরীকে রক্ষা করেন। বিরূঢ়ক চতুর্থবার কপিলপুরী আক্রমণ করতে গেলে, পথে বিরূঢ়কের সেনাবাহিনী এবং সেই সঙ্গে বিরূঢ়ক নিজেও যাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় সে জন্য শাক্যগণ পানীয় সংগ্রহের ক্ষুদ্র নদীটির মধ্যে প্রচণ্ড রকমের বিষ মিশ্রিত করে রেখেছিলেন। সে জন্য বুদ্ধ চতুর্থবার তার জ্ঞাতিগণকে রক্ষার জন্যে আর অগ্রসর হলেন না। বিরূঢ়ক সসৈন্যে কপিল রাজপুরীতে প্রবেশ করে শাক্য রাজকুলকে একেবারেই নির্বংশ করে দিল। স্তন্যপায়ী শিশুটি পর্যন্ত বিরূঢ়কের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পায়নি। শাক্য রাজকুলকে একেবারে নির্মূল করে বিরূঢ়ক যখন পুনরায় শ্রাবস্তীর পথে রওনা হয়, তখন পার্বত্য প্রদেশের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে অকস্মাৎ জলপ্লাবনের ফলে সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন কপিলপুরী ধ্বংস হয় বুদ্ধের বয়স তখন উনআশী বৎসর। তাঁর মহাপরিনির্বান লাভের আর মাত্র এক বৎসর বাকী।

বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারীপুত্ত এবং মহা মৌগ্যল্যায়নও তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। জেতবনের আশ্রমে একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থেকে সারীপুত্ত দেখতে পেলেন তাঁর জীবন দীপ নিভে আসছে। নির্বাণ লাভের আর বিলম্ব নেই। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পূর্বেই তাঁকে এবং মৌগ্যল্যায়ন উভয়কেই এই মর জগৎ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। তখন তাঁর মনে পড়লো তাঁর নিজের স্নেহশীলা জননীর কথা। সারীপুত্ত সহ সাতজন সিদ্ধপুরুষের জননী তিনি। তা সত্ত্বেও আলোর স্পর্শ থেকে বঞ্চিতা হয়ে রয়েছেন তিনি এখনও। দিব্যদৃষ্টি মেলে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন শুচিশুদ্ধ অথচ শুচিবায়ুগ্রস্থা তাঁর অতিবৃদ্ধা জননীর অন্তরে যে নির্মল শুভ্র সংস্কার সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রয়েছে, সামান্য চেষ্টাতেই তা অঙ্কুরায়িত করে তার ধর্মচক্ষুরুন্মীলন করা যেতে পারে। নিজের নির্বাণ লাভের পূর্বে জননীর প্রতি এই কর্তব্যটুকু পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি। আর

তা ছাড়া নিজ জন্মভূমির স্নেহশীতল ক্রোড়ে নির্বাণ লাভ করার জন্যে অনেক দিন থেকেই তার প্রাণ মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ধ্যানভঙ্গের পর বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সারীপুত্ত তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজগৃহের অন্তর্গত তার নিজের জন্মভূমি নালক (নালন্দা) গ্রামে চলে যাবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন সারীপুত্ত এটাও জানতে পেরেছিলেন যে, যেদিন তিনি তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে পৌঁছবেন, তার পরদিন তিনি নির্বাণ লাভ করবেন। প্রিয় শিষ্য এবং অগ্রশ্রাবক সারীপুত্তকে বিদায় জ্ঞাপন করতে গিয়ে বুদ্ধ অন্তরে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করেছিলেন সেদিন। সেজন্য মুখ ফুটে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বিদায় জানাতে পারেন নি। কেবল এইটুকু বলেছিলেন, যে সমবেত ভিক্ষুদিগকে শেষবারে মত একবার ধর্মকথা শুনিয়ে যাও, বুদ্ধের আদেশে সারীপুত্ত তখন সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করে অপূর্ব ভঙ্গিমায় শেষবারের মত তাদের সম্মুখে ধর্মকথা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী তন্ময় হয়ে সেই অপূর্ব ধর্মকথা শুনতে থাকেন। সেদিন সারীপুত্তের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা শোনার পর প্রত্যেকেরই হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি সকলের নিকট থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় গ্রহণ করে বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জ্ঞাপন করে তিনবার তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পর যখন ধীরে ধীরে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেন, তখন সমবেত ভিক্ষুগণ সবকিছু বিস্মৃত হয়ে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে আরম্ভ করেন। পাঁচশত ভিক্ষু তার সঙ্গে রাজগৃহে যাবার জন্যে তার অনুগামী হলেন। যাত্রার সময়ে সারীপুত্ত অপলক নয়নে একদৃষ্টে বুদ্ধের পানে তাকিয়ে ছিলেন। দৃষ্টির সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত সারীপুত্ত পুনঃ পুনঃ ফিরে বুদ্ধের পানে তাকাতে থাকেন। সেই দৃশ্য যারা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের কেউ সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। অগ্রশ্রাবক সারীপুত্তকে বিদায় দিয়ে বুদ্ধ ধীরে ধীরে গন্ধকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশাল ভিক্ষুবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সারীপুত্ত ছয়দিনে পথ অতিক্রম করে শেষে উপস্থিত হলেন তাঁর জন্মভূমি নালক গ্রামের প্রান্ত সীমানায়। সেখানে আসার পর যে বিশাল বটবৃক্ষটির ছায়ার ছোটবেলা তিনি খেলাধূলা করেছিলেন, সেই বৃক্ষটির তলায় আসন গ্রহণ করলেন। তখন বাল্যকালের স্মৃতি সকল একে একে তাঁর মনে উদিত হতে লাগলো। এমন সময়ে তাঁর ভাগিনেয় উপরেবত এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলো। বহুকাল পরে ভাগিনেয়কে দেখে সারীপুত্ত অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি তখন ভাগিনেয়কে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দিদিমা কেমন আছেন? উত্তরে উপরেবত জানালেন, তিনি ভালই আছেন। তারপর সারীপুত্ত তাকে পুনরায় আদেশ করলেন, তুমি যাও, মাকে গিয়ে জানাও, যে আমরা এসেছি। তাঁকে

পাঁচশত ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা করতে বলো, উপরেবত অত্যন্ত আনন্দিত মনে তক্ষুণি বাড়ী ফিরে গিয়ে তার দিদিমাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করলো। এতকাল পরে পুত্র বাড়ী ফিরে এসেছেন শুনে বৃদ্ধা আনন্দের আতিশয্যে একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন, পুত্রের নির্দেশমত তিনি তক্ষুণি পাঁচশত ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করবার জন্যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে যত্নবান হলেন। সন্ধ্যার পর সারীপুত্ত ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ীর অঙ্গণে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি তার নিজ বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার নির্বাণ লাভের আর বেশী বিলম্ব নেই। ভিক্ষুগণের ভোজনপর্ব সমাধা হলে তিনি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দান করে নিজে চলে গেলেন সেই কুটীরের মধ্যে, যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। আহার্য বস্তু তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করেন নি। আহার্য বস্তু গ্রহণ করবার মত দৈহিক অবস্থাও তাঁর ছিল না। থেকে থেকে কেবলই তার রক্তবমন দেখা দিতে থাকে। সেই অবস্থায় নিজেকে কোনমতে সংযত করে নিয়ে তিনি তার অতি বৃদ্ধা জননীকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করলেন। পুত্রের মুখে ধর্মকথা শুনতে শুনতে বৃদ্ধা জননীর মন ধর্মের গভীরে নিমজ্জিত হল। বৃদ্ধার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। এক নূতন জগতের সন্ধান লাভ করলেন তিনি। তখন রাত্রি গভীর। রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি ভিক্ষুগণকে তাঁর নিকটে এসে সমবেত হবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। ভিক্ষুগণ একে একে সকলেই তার নিকটে এসে উপস্থিত হলে, তিনি তখন তাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। উপদেশ দান শেষ হলে তিনি পুনরায় জোড়করে তাদের সকলকে সম্বোধন করে কাতর ভাবে বলেন, যে যদি তিনি কখনও কারুর সঙ্গে অপ্রিয় ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাঁরা যেন দয়া করে তাঁকে মার্জনা করেন। এই বলে তিনি সকলের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করলেন। ভিক্ষুগণের মধ্যে তখন কয়েকজন বলে উঠলেন, আপনি এতকাল ছায়ার ন্যায় সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের রক্ষে করে এসেছেন। আপনি ত কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেননি, বা কখনও কোন অপ্রিয় বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি, তবে কি জন্যে আজ আপনি আমাদের নিকট ক্ষমা চাইছেন। বরং আমরা যদি কখনও আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে থাকি, অথবা কোন অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে থাকি, তবে সেজন্যে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। ভিক্ষুগণের মুখে একথা শোনার পর, তিনি তাদের প্রতি একবার তাকালেন মাত্র। তাঁর সেই দৃষ্টি ছিল নিতান্তই দুর্বল। ততক্ষণে তাঁর বাক্‌শক্তিও লোপ পেয়ে গিয়েছে। ভিক্ষুগণের প্রতি শেষবারের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর মুহূর্তেই তিনি চিরতরে নয়ন দুটি মুদিত করলেন। সংঘের অপর অগ্রশ্রাবক মৌগল্ল্যায়ন সে সময়ে রাজগৃহেই অবস্থান করছিলেন।

বুদ্ধ শিষ্য চুন্দ সারীপুত্তের পূতাস্থি এবং তাঁর ব্যবহৃত পাত্র চিবর প্রভৃতি নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করে শ্রাবস্তীর পথে রওনা হলেন। যথাসময়ে শ্রাবস্তী পেঁাছে তিনি সেগুলোকে জেতবনের আশ্রমে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। বুদ্ধের আদেশে সে সমস্ত নিদর্শন জেতবনের ধর্ম সভাগৃহের বেদিকার উপরে রক্ষিত হল। পরে বুদ্ধের নির্দেশে জেতবনের একান্তে সারীপুত্তের পূতাস্থি এবং সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত পাত্র চিবর প্রভৃতি ভূমিতে প্রোথিত করে তার ওপরে নির্মিত হল ধাতুচৈত্য। সারীপুত্তের পূতাস্থির অংশ বিশেষের উপর স্থাপিত হল সর্বপ্রথম বৌদ্ধস্তূপ। এরপর বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে তাকে নির্দেশ দিলেন রাজগৃহে যাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবার জন্যে। বুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে আনন্দে যথারীতি সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি সুসম্পন্ন করে ফেলেন। এবার জেতবনের ভিক্ষুগণের প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে রাজগৃহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সারীপুত্তের নির্বাণ লাভের পর এবার বুদ্ধ জেতবনের অবশিষ্টাংশ ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই শেষবারের মত জেতবন ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভের আর একটি বৎসর মাত্র বাকী।

এবার রাজগৃহে এসে বুদ্ধ বেণুকুঞ্জের আশ্রম অথবা জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে না গিয়ে গৃধ্রকূট পর্বতের উপরে কিছুদিনের জন্যে অবস্থান করতে থাকেন। নৃপতি বিম্বিসারের অন্তিম সময়েও তিনি এখানেই অবস্থিতি করেছিলেন। গৃধ্রকূট পর্বতের নিচেই ছিল বিম্বিসারের কারাগৃহ। কারাগৃহের গবাক্ষপথে বিম্বিসার প্রত্যহই বুদ্ধের দর্শন লাভ করতে সমর্থ হতেন। বুদ্ধ তাঁকে দর্শনদানের জন্যে সেই কারাগৃহের গবাক্ষের দৃষ্টির পথে এসে দণ্ডায়মান হতেন এবং রাজাকে দর্শন দান করতেন। যে সময়ে রাজা বিম্বিসার ইহলোক ত্যাগ করেন, সে সময়েও বুদ্ধ তাঁর গবাক্ষ পথের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থেকে তাঁকে দর্শন দান করেন এবং সেই অবস্থাতেই রাজার প্রাণ বিয়োগ হয়।

মৌগ্যাল্ল্যায়ণ অনেক দিন ধরেই রাজগৃহে অবস্থিতি করেছিলেন। তিনি কখনও বেণুকুঞ্জের আশ্রমে আবার কখনও জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে অবস্থিতি করে চলেছিলেন। রাজগৃহের প্রতিটি ব্যক্তিরই তিনি ছিলেন একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং আপনজন। তিনি যেখানেই অবস্থিতি করতেন, লোকে সেখানেই তাকে প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এর ফলে রাজগৃহের ভিক্ষু সংঘের খাদ্যবস্তু থেকে আরম্ভ করে বস্ত্র প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব দেখা দেয়নি। অপর পক্ষে তীর্থিকগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন দিনই হ্রাস পেয়ে চলেছিল। সাধারণ লোকেরা তাদের প্রতি কোন প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন না। সাধারণের নিকট থেকে উপঢৌকন লাভ করা ত দূরের কথা, ভিক্ষান্নটুকু সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে তখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে

দেখা দিয়েছিল। এদিকে মৌগ্যাল্ল্যায়ণকে জনসাধারণের নিকট থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণ উপঢৌকন লাভ করতে দেখে তার প্রতি তীর্থিকগণের হিংসার আর অবধি ছিল না। সারীপুত্রের পরলোক গমনের সংবাদে তীর্থিকগণ মহা আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্যের একজন বিদায় নিয়েছেন। এবার মৌগ্যাল্ল্যায়ণও যদি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তবে তাদের পথের কাঁটা দূর হয়ে যায়। সাধারণ লোকে তখন তাদেরই আদর আপ্যায়ন করবেন এবং উপঢৌকনাদিও যথারীতি প্রেরণ করবেন, তখন তাদের অবস্থারও পরিবর্তনও দেখা দেবে। তাই তীর্থিকগণের যত বিরক্তি এবং আক্রোশ গিয়ে পড়লো মৌগ্যাল্ল্যায়ণের উপর। মৌগ্যাল্ল্যায়নও যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন, অথচ তা সত্বেও তিনি বেশ কর্মক্ষম অবস্থায়ই রয়েছেন দেখে তীর্থিকগণ অবশেষে মৌগ্যাল্ল্যায়ণের প্রাণ সংহারের জন্যে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তীর্থিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দলপতিগণও শেষ পর্যন্ত সেই মতই গ্রহণ করেন। তারা কয়েকজন হিংস্র প্রকৃতির যুবককে মৌগ্যাল্ল্যায়ণের প্রাণ সংহার করার কার্যে নিযুক্ত করেন। সায়ংকালে বেণুকুঞ্জের আশ্রমের নিকটে নির্জন স্থানটিতে মৌগ্যাল্ল্যায়ণ প্রায়ই একাকী ধ্যান নিমগ্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। এটা তার প্রায় দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন তিনি যখন সবেমাত্র আসন গ্রহণ করে বসেছেন, এমন সময়ে তীর্থিকগণের নিযুক্ত সেই দুষ্ট চক্র যষ্টি হস্তে তার দিকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মৌগ্যাল্ল্যায়ণ এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা তাকে হত্যা করবার জন্যেই এভাবে যষ্টিহস্তে তার দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের এসে পেঁছিবার পূর্বে তিনি ঋদ্ধিবলে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দুষ্টচক্র তাকে দেখতে না পেয়ে সেদিনকার মত সেখান থেকে চলে গেল। পরের দিনও সেই একই ব্যাপারেরই পুনরাভিনয় হল। তিনি সবেমাত্র আসন গ্রহণ করে বসেছেন, এমন সময়ে সেই দুষ্টচক্র যষ্টি হস্তে তার দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। পূর্ব দিনের ন্যায় সেদিনও তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। এভাবে পর পর তিন দিন পর্যন্ত একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হতে দেখে মৌগ্যাল্ল্যায়ণ শেষে ভাবতে লাগলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোনদিন কারুর সঙ্গে শত্রুতা সাধনে কখনও অগ্রসর হন নি, এমন কি কারুর সঙ্গে তার কোনদিন বচসা অথবা মনোমালিন্যও দেখা দেয় নি। তবে কিজন্য কতকগুলো লোক তার প্রাণ সংহারের জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে তিনি পুনরায় আসন গ্রহণ করে ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানে মগ্ন হবার পর, তিনি তখন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, যে তাঁর পূর্ব জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের দরুন এ জন্মে তাকে এভাবেই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। পূর্বজন্মে তিনি একবার তাঁর অন্ধ পিতামাতাকে নিতান্ত অসহায় ভাবে সিংহ শার্দূল অধ্যুষিত গভীর অরণ্যের মাঝে ফেলে রেখে দিয়ে নিজে

একাকী প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন। তাঁর সেই পূর্ব জন্মকৃত পাপের দরুণই এ জন্মে তাঁকে এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। নিয়তির লিখন এড়াবার উপায় নেই। তাঁর এই মর্মান্তিক পরিণতির হাত থেকে স্বয়ং বুদ্ধও তাঁকে রক্ষা করবেন না। যখন তিনি নিজে তাঁর এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বিষয় অবগত হলেন, তখন আর তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। চতুর্থবার যখন সেই লোকগুলো তাঁকে দেখা মাত্রই আক্রমণ করতে তেড়ে এল, তখন তিনি ঋদ্ধিবলে আর তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন না। লোক-গুলো তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যষ্টি দ্বারা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে, তাঁর সমগ্র দেহটিকে একেবারে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত করে ফেললো। তারা তখন তাকে সেই অবস্থায়ই ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু লোকগুলোর প্রহারের ফলে তখনই তার প্রাণ বিয়োগ হয়নি। লোকগুলো চলে যাবার খানিকক্ষণ বাদে তিনি ঋদ্ধিবলে নিজের দেহটিকে পুনরায় সংগঠিত করে নিয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁকে জানালেন, যে এবার তাঁর নির্বাণ লাভের সময় উপস্থিত হয়েছে; সুতরাং তাঁকে এখন পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে অনুমতি দেওয়া হোক। মৌগ্যাল্ল্যায়ণের প্রার্থনার উত্তরে বুদ্ধ নীরবে কেবল-মাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বুদ্ধের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করার পর, বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে, তারপর তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তিনি পুনরায় স্বস্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঋদ্ধিবলে পুনরায় পূর্ববৎ অবস্থা গ্রহণ করে ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন। সারীপুত্তের নির্বাণ লাভের মাত্র এক পক্ষ কাল পরে বুদ্ধের অপর অগ্রশাবক মহামৌগ্যাল্ল্যায়ণও নির্বাণ লাভ করলেন। রাজগৃহের একান্তে একটি স্তূপ নির্মাণ করে সেখানে স্বয়ং বুদ্ধের উপস্থিতিতে মহামৌগ্যাল্ল্যায়ণের পূতাস্থি সহ দেহাবশেষ স্বযত্নে রক্ষা করা হয়। ভিক্ষু সংঘ থেকে বুদ্ধের দুই অগ্রশাবক চির বিদায় গ্রহণ করলেন। এখন থেকে সংঘের পরিচালনার সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব সংঘের ভিক্ষুগণের উপরই অর্পিত হল।

মৌগ্যাল্ল্যায়ণের নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধ আরও কিছুদিন পর্যন্ত গৃধ্রকূট পর্বতেই অবস্থান করতে থাকেন। সে সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রুর এক নূতন দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিল। সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবীগণ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। শেষে হয়তো তারা মগধরাজ্যেও অনুপ্রবেশ করতে পারে। এই একটি মাত্র আশংকা অজাতশত্রুর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। লিচ্ছবীগণ যাতে আরও বেশী প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ না পেতে পারে, সেজন্যে সময় থাকতে লিচ্ছবীগণকে আক্রমণ করে সমূলে বিনাশ করার জন্যে অজাতশত্রুর অমাত্যবর্গ তাকে পরামর্শ দেন। বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ না করে অজাতশত্রু কোন কার্য করবেন না বলে স্থির করেছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে বুদ্ধের মতামত

জানবার জন্য অজাতশত্রু তার প্রধান অমাত্য বর্ষকারকে গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। যথাসময়ে প্রধান অমাত্য বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট রাজা অজাতশত্রুর দুশ্চিন্তার কারণ বর্ণনা করে, শেষে তার উপায় নির্ধারণের জন্যে লিচ্ছবীকুলকে আক্রমণ করে বিনাশ করার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করলে বুদ্ধ জানান যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা (লিচ্ছবীগণ) বয়স্কদের সম্মান প্রদর্শন করে চলবেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা সৎপথে নিজেদের পরিচালিত করবেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ম কানুন পরিবর্তন না করবেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের রাজ্যসীমার মধ্যে অবস্থিত করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁরা নারী জাতির সম্মান রক্ষা করে চলবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই সাধিত হবে এবং ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাজা অজাতশত্রুর নেই। প্রধান অমাত্য রাজদরবারে ফিরে গিয়ে বুদ্ধের উক্তিসকল সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনালেন রাজা অজাতশত্রুকে। বুদ্ধের কথা শুনে রাজা অজাতশত্রু বৃজিদের (লিচ্ছবীগণের) রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনা তখনকার মত ত্যাগ করলেন বটে, তবে অদূর ভবিষ্যতে তারা যাতে মগধরাজ্যের সীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কোন প্রকার অনর্থ অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হতে না পারে। সে জন্যে গঙ্গার তীরবর্তী উপযুক্ত কোন একটি স্থানে একটি বৃহৎ স্কন্ধাবার স্থাপন করে সেখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাজার নির্দেশে রাজকর্মচারীগণ উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অনেক অনুসন্ধানের পর তারা গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী পাটুলী গ্রামটিকে এ কাজের জন্যে বিশেষভাবে উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করলেন। পরে রাজা অজাতশত্রু স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে, সমগ্র অঞ্চলটি পরিদর্শন করে রাজকর্মচারীগণের সঙ্গে একমত হন এবং সেখানেই স্কন্ধাবার স্থাপন করে রাজধানী রাজগৃহ থেকে সেখানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেন।

রাজা অজাতশত্রুর প্রধান অমাত্য বর্ষকারের গৃধ্রকূট পর্বতের আশ্রম থেকে প্রস্থানের পর, সেদিনই রাজগৃহের সমস্ত ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গৃধ্রকূট পর্বতের আশ্রমে এনে উপস্থিত করার জন্যে বুদ্ধ আনন্দকে নির্দেশ দান করেন। বুদ্ধের আদেশ পেয়ে আনন্দ সর্বপ্রথমে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সেখানকার ভিক্ষুমণ্ডলীকে জানালেন বুদ্ধের নির্দেশ। এর পর তিনি এসে উপস্থিত হলেন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে। বেণুকুঞ্জের আশ্রমের ভিক্ষুগণ বুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে তখনই চলে গেলেন গৃধ্রকূট পর্বতের আশ্রমে। ইতিমধ্যে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমের ভিক্ষুগণও এসে সমবেত হয়েছেন সেখানে। আনন্দের নির্দেশে ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণ করার পর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষু-

মণ্ডলীকে সম্বোধন করে তাদের সকলের মেনে চলার জন্যে সাতটি নীতিবাক্য ঘোষণা করেন ঃ—

১. ভিক্ষুগণ সর্বদা সম্মিলিতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবেন।

২. সম্মিলিতভাবে তারা সংঘের করণীয় সর্ব কিছু পরিচালনা করবেন।

৩. ভিক্ষুগণ সর্বদা তাঁর প্রবর্ত্তিত বিষয় নীতি মেনে চলবেন এবং নিজেরা ইচ্ছামত সেই বিষয় নীতির পরিবর্তন করবেন না।

৪. ভিক্ষুগণ সর্বদাই বর্ষীয়ান এবং সংঘপিতা, সংঘনায়ক ভিক্ষুদের মেনে চলবেন এবং তাঁদের পূজ্য বলে মনে করবেন। কখনও তাঁদের অবাধ্য হবেন না।

৫. ভিক্ষুদের অন্তরে কখনও তৃষ্ণা দেখা দিলে, তারা তক্ষুণি তা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলার জন্যে চেষ্টা করবেন এবং কখনও তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে কাজ করবেন না।

৬. ভিক্ষুগণ সর্বদাই নির্জন বাসের জন্য আগ্রহান্বিত হবেন।

৭. ভিক্ষুগণ সর্বদাই সুশীল এবং সুসংযত সতীর্থদের সেবায় যত্নবান হবেন।

যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ এই কটি নীতি বাক্য লঙ্ঘন করবেন না ততদিন পর্যন্ত তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হতে থাকবে। এই নীতিবাক্য থেকে যখনই তাঁরা বিচ্যুত হবেন, তখনই তাঁদের মধ্যে অধোগতি দেখা দেবে। পরে ভিক্ষুগণকে মেনে চলার জন্যে বুদ্ধ তাঁদের সম্মুখে আরও সাতটি নীতিবাক্য ঘোষশা করেন।

১. ভিক্ষুগণ কখনই অধ্যাত্ম সাধনার বহির্ভূত কোন কর্ম সম্পাদন করবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করবেন না।

২. ভিক্ষুগণ কখনই ধর্ম বহির্ভূত আলাপ আলোচনায় অথবা পরচর্চায় রত হবেন না।

৩. ভিক্ষুগণ কখনই নিদ্রা পরায়ণ হবেন না।

৪. ভিক্ষুগণ কখনই বিনা কারণে একত্র সমবেত হয়ে অপ্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনায় রত হবেন না।

৫. ভিক্ষুগণ কখনই অন্তরে অসৎ চিন্তাকে স্থান দিবেন না, অথবা কখনও অসৎ চিন্তার বশীভূত হবেন না।

৬. ভিক্ষুগণ কখনই অসৎ সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবেন না।

৭. আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবার ফলে সামান্য মাত্র উৎকর্ষলাভে আনন্দিত হয়ে তারা কখনই গর্বোদ্ধত হবেন না।

যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ এই কটি নীতিবাক্য দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে চলবেন ; ততদিন কোন প্রকার অবনতির আশঙ্কা নেই। এই কটি নীতিবাক্য দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলে তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হতে থাকবে। বুদ্ধের মুখে এই সকল নীতি বাক্য শুনে এবং তাদের ব্যাখ্যা শুনে সমবেত ভিক্ষুগণ

সেদিন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ভিক্ষুগণ এরপর বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। রাজগৃহের ভিক্ষুগণের নিকট বুদ্ধ সেই শেষবারের মত উপদেশ উচ্চারণ করেন। তারপরেই তিনি রাজগৃহ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরুর সন্ধান লাভের আশায় বুদ্ধ সর্বপ্রথমে এই রাজগৃহেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন তার তরুণ এবং অতীব সুদর্শন দেহ সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং নৃপতি বিম্বিসারই তাকে সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করে পুনরায় গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে যাবার জন্যে একান্তভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যখন কিছুতেই তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে সমর্থ হলেন না, তখন তিনি তাঁকে অন্ততঃ রাজগৃহে থেকে ধর্মাচরণের জন্যে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। কিন্তু সেদিন বুদ্ধ নৃপতি বিম্বিসারের সে অনুরোধও রক্ষা করতে পারেন নি। রাজার অনুরোধের উত্তরে তিনি রাজাকে সেদিন জানিয়েছিলেন, যে সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন একস্থানে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এরপর তিনি রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর অবশ্যই তিনি পুনরায় এসে রাজাকে দর্শন দান করবেন। বুদ্ধের নিকট থেকে সেই আশ্বাস লাভ করার পর বিম্বিসার সেদিন কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি বোধ করেছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি যখন পুনরায় রাজগৃহের নিকট লঠ্‌ঠিবনে সর্বপ্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেদিন সংবাদ পেয়ে বিম্বিসার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজগৃহ থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত সেই লঠ্‌ঠি বনে তাঁর দর্শন লাভের আশায় পাত্র মিত্র সহ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। এতদূরে তার পক্ষে বুদ্ধের সান্নিধ্যে আসা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বুঝে তিনি বুদ্ধকে তাঁর প্রাসাদের নিকটস্থ "কলণ্ডক নিবাপে" আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অবস্থিতি করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজার সেই অনুরোধ রক্ষা করে কলণ্ডক নিবাপে এসে উপস্থিত হন, রাজা বিম্বিসার সেখানে বুদ্ধকে স্বাগত জানিয়ে স্বর্ণভৃঙ্গার হতে জলগ্রহণ করে, সেই জলে তর্পণ দ্বারা কলণ্ডক নিবাপ (বেণুকুঞ্জ) বুদ্ধকে উৎসর্গ করেন এবং বুদ্ধও রাজার তর্পণ বারি স্বহস্তে ধারণ করে রাজার সেই দান গ্রহণ করেন। সেখানকার বেণুকুঞ্জেই সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল বুদ্ধের এবং তার শিষ্যবর্গের নিমিত্ত আশ্রম। সেই আশ্রমটিই সমগ্র বৌদ্ধজগতের সর্বপ্রথম সংঘারাম। সেই সাংঘারামেই এসে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তার অগ্রশ্রাবকদ্বয় সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়ন। সেই আশ্রমটিতে তিনি পর পর পাঁচবার বর্ষা যাপন করেছেন। এবার তিনি পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বহু পুরাতন সেই রাজগৃহকে চিরদিনের মত বিদায় জানিয়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি যে চিরদিনের জন্যে রাজগৃহ থেকে চলে যাচ্ছেন এবং

কোনদিনই আর সেখানে ফিরে আসবেন না। এ কথা কারুর নিকটই প্রকাশ করেন নি।

বিশাল ভিক্ষু সংঘ পরিবৃত হয়ে তিনি রাজগৃহ থেকে পথে পা বাড়ালেন। ক্রমে নালন্দার নিকটবর্তী আম্রলট্ঠিকায় এসে উপস্থিত হলে,সেখানকার জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানান। সেখানকার রাজপ্রাসাদে সশিষ্য বুদ্ধের থাকার ব্যবস্থাও করা হল। সেখানকার জনসাধারণের অনুরোধে বুদ্ধ আম্রলট্ঠিকায় কয়েকদিন অবস্থান করে, স্থানীয় অধিবাসীগণকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে যারা বুদ্ধের দর্শন লাভ করেছেন, তাঁর মুখে ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুনেছেন, অথচ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি, এবারে তারা এসে একে একে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। আম্রলট্ঠিকায় পক্ষকালের মত সময় অতিবাহিত করার পর তিনি ভিক্ষুগণ সহ চলে এলেন নালন্দায়। সেখানে এসে তিনি সেখানকার বিখ্যাত প্রাবারিক আম্রকাননে ভিক্ষুগণ সহ অবস্থিতি করতে থাকেন। সে সময়ে নালন্দা ছিল অতি সমৃদ্ধশালী জনপদ। নালন্দার জনগণও বুদ্ধকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর নিকট থেকে ধর্মকথা শোনবার জন্যে তাঁকে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করবার জন্যে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। প্রাবারিক আম্রকাননে প্রতিদিন শত শত লোকের আগমন হতে লাগলো। বুদ্ধের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করে তারা পরম তৃপ্তিলাভ করেন। বুদ্ধ যে কয়দিন নালন্দার প্রাবারিক আম্রকাননে অবস্থিতি করেছিলেন, সে কয়দিন ভক্তজনকে অনর্গল ধর্মকথা শুনিয়েছিলেন। নালন্দার অধিকাংশ লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের উপস্থিতিতেই সেই প্রাবারিক আম্রকাননে গড়ে উঠেছিল ভিক্ষু সংঘের জন্যে একটি সংঘারাম। সেই সংঘারামকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে উঠেছিল ধর্মশিক্ষার জন্যে এক বিশাল শিক্ষায়তন, যা পরবর্ত্তীকালে "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়" নামে সেকালের পরিচিত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রসিদ্ধ অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

নালন্দা থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ভিক্ষুগণ সহ বুদ্ধ চলে আসেন গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী পাটুলি গ্রামে। গঙ্গার তীরে পাটুলীগ্রামে তখন মহাসমারোহে চলেছিল মগধরাজ্যের নূতন রাজধানী এবং সেই সঙ্গে বিশাল স্কন্ধাবার স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন। রাজা অজাতশত্রুর প্রধান অমাত্য বর্ষকার এবং সুনীত নামে অপর একজন সুদক্ষ কর্মচারী মিলে নতুন রাজধানী তৈরীর সব কিছু কাজ কর্ম তদারক করে চলেছিলেন। পাটুলীগ্রামে মগধ রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপিত হতে চলেছে, এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অধিবাসিগণ বিশেষ করে শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ স্থান সঙ্কুলানের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েছেন। বুদ্ধ যখন পাটুলীগ্রামে এসে

—উপস্থিত হয়েছিলেন, সে সময়ে পাটুলীগ্রাম আর নগণ্য অজ পাঁড়াগা মাত্র ছিল না। ততদিনে তার আদল পাল্টে গিয়েছে। পাটুলীগ্রাম তখনই একটি শহরের রূপ নিয়েছে। তার পাটুলী নামটিরও পরিবর্তন হয়ে গিয়ে নতুন নাম দাঁড়িয়েছে পাটুলীপুত্র। বুদ্ধ যখন সদল বলে পাটুলীতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোকেরা এসে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। পাটুলীর আধিবাসিগণ তাঁকে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে; ধর্মসম্বন্ধে তাদের উপদেশ প্রদান করবার জন্যে, কাতরভাবে অনুরোধ জানালে, তিনি নিরবে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তাদের সেই অনুরোধ রক্ষে করেন। পাটুলীর আদিবাসিগণ বুদ্ধের এবং ভিক্ষুগণের অবস্থানের জন্যে, সেখানকার নবনির্মিত বিশাল অতিথিশালায় তাদের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করে দেন। পরবর্ত্তীকালে সেখানে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ বিহার। উত্তরকালে সেই বিহারটি কুক্কুটপাদ বিহার নামে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের অনতিদূরেই ছিল এই বিহারটি।

বুদ্ধ যখন পাটুলীগ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন বেলা অপরাহ্ণ। তিনি যখন অতিথিশালায় প্রবেশ করলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভিক্ষুগণসহ অতিথিশালায় প্রবেশ করে বুদ্ধ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট আসনখানিতে উপবেশন করে আরম্ভ করলেন ধর্মালাপ। সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি একইভাবে অনর্গল বলে গেলেন ধর্ম সম্বন্ধে নানাকথা। তাঁর মুখে ধর্মব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত সকলেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন। এরপর বুদ্ধ তাদের বিদায় জানিয়ে রাত্রির প্রায় শেষে একাকী তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট নিভৃত কক্ষটিতে প্রবেশ করে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে, প্রত্যুষেই আবার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। পথে বেরিয়ে বুদ্ধ লক্ষ্য করতে লাগলেন নবনির্মিত নগরখানিকে। রাজা অজাতশত্রুর বিশ্বস্ত মন্ত্রী বর্ষকার এবং বিশ্বস্ত সুদক্ষ কর্মী সুনীত সেই নগরখানির নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নগরখানির নির্মাণের কার্য প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। নগরটির চতুর্দিক অবলোকন করে বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন যে, এই নতুন নগরটির প্রতিষ্ঠার পিছনে রাজা অজাতশত্রুর কি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে? উত্তরে আনন্দ জানালেন যে, গঙ্গার অপর দিক থেকে বৃজিকুলের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ অথবা আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এখানে এই নূতন নগরটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বুদ্ধ তখন নগরটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে আনন্দকে জানালেন যে, এই পাটলীপুত্র নগরটি সমগ্র আর্যাবর্তে একদিন শ্রেষ্ঠ নগর হিসেবে গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হবে। এই নগরটিই হবে সমগ্র আর্যাবর্তের সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে পণ্যবাহী বাণিজ্য তরী

সমুদ্র পার হয়ে দূর-দূরান্তের দেশসমূহে গিয়ে উপস্থিত হবে। তবে ভবিষ্যতে নগরটির তিনটি বিপদেরও আশঙ্কা রয়েছে। প্রথমটি অগ্নিকাণ্ড, দ্বিতীয়টি জলপ্লাবন এবং তৃতীয়টি হল অন্তর্বিরোধ।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে অতিথিশালায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রী ও কর্মচারী যাঁদের উপর নগরখানির নির্মাণের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তাঁরা দুজনেই অতি বিনীতভাবে তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় সেখানে অবস্থান করছেন। উভয়েই তখন বুদ্ধের দর্শনলাভ করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। তারপর ভিক্ষুগণসহ তাঁকে তাঁদের বাসভবনে আহার গ্রহণের জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ তাঁদের আলয়ে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রীদ্বয় স্বহস্তে বুদ্ধসহ সমগ্র ভিক্ষুগণকে আহার্য পরিবেশন করে সেদিন পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। আহার শেষে বুদ্ধ মন্ত্রীদ্বয়ের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের মুখে ধর্মালোচনা শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যান এবং উভয়েই তখন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেদিনই বুদ্ধ ভিক্ষুগণসহ পাটলীপুত্র ত্যাগ করে গঙ্গার অপর তীরে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ভিক্ষুগণসহ বুদ্ধ যে তোরণ-দ্বার দিয়ে নগর থেকে বহির্গত হয়েছিলেন, মন্ত্রীদ্বয় সেই তোরণদ্বারটির নামকরণ করেন 'গোতমদ্বার'। দ্বিপ্রহরের খানিক পরেই বুদ্ধ সশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন গঙ্গার তীরে। বুদ্ধ যখন গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন, সে সময়ে গঙ্গায় জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। সমগ্র নদীটি জলে একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও যাত্রিগণ ব্যস্ত-সমস্তভাবে নৌকোয় নদী পারাপার হচ্ছে। বুদ্ধ খানিক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যস্ত-সমস্ত যাত্রিগণের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। তারপর আপনা থেকেই সশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন গঙ্গার অপর তীরে। সেই বিশাল নদীটি পার হবার জন্য তাঁর কোন নৌকোর প্রয়োজন হয়নি। ভিক্ষুগণ জানতেও পারেননি, কি করে তারা নদীটি পার হয়ে চলে এলেন। যে ঘাট থেকে বুদ্ধ সশিষ্য গঙ্গার অপর তীরে চলে এসেছিলেন, অজাতশত্রুর মন্ত্রীদ্বয় সেই ঘাটটির নামকরণ করেন "গোতম ঘাট"। আজও সেই স্থানটি স্থানীয় জনসাধারণের নিকট গোতম ঘাট বলেই পরিচিত। গঙ্গার অপর তীরে সশিষ্য এসে অবতরণ করার পর বুদ্ধ সুললিত ভাষার মাধ্যমে উচ্চারণ করলেন, যাঁরা তৃষ্ণা সাগর উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, সেই মহাজ্ঞানীগণ আর্যসত্যের সেতু অবলম্বন করে অনায়াসেই নদী উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন।

এরপর বুদ্ধ শিষ্যগণসহ সেখান থেকে গঙ্গার নিকটবর্তী কোটিগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আসার পর তিনি ভিক্ষুদের নিয়ে গঙ্গা পার হবার পর, বিস্মিত ভিক্ষুগণের নিকট গাথার মাধ্যমে চারি আর্যসত্যের সাহায্যে সেতু অতিক্রম করা সম্বন্ধে যে কটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে

তাদের মনে সম্যক ধারণা জন্মাবার জন্যে তাদের উদ্দেশ করে বলেন, চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করার অক্ষমতার ফলেই লোকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়। জন্মগ্রহণ করার অর্থই হল জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হওয়া। আর তাছাড়া সংসারে থেকে পারিপার্শ্বিক জ্বালাও তাকে অহরহই ভোগ করতে হয়। তাকে ভোগ করতে হয় সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতি। তাকে ভোগ করতে হয় নানাপ্রকার শোক-সন্তাপ। সংসার আবর্তের এই কারণকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তার মূলোচ্ছেদ করতে না পারার ফলেই তোমাদের মত আমাকেও পুনঃপুনঃ এই দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রতি মানব মনের প্রবল আসক্তিই হল সকল প্রকার অনর্থ ও দুঃখের মূল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসক্তির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অনবরত দুঃখ ও জ্বালা ভোগ করতেই হবে। কিছুতেই তা থেকে তার পরিত্রাণ নেই। আসক্তির মূলোচ্ছেদ সম্ভব অষ্টাঙ্গ আর্যপথ অবলম্বনে। তারপর তিনি ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমাদের নিকট চারি আর্যসত্য উদঘাটিত। তৃষ্ণা সমূলে উৎখাত। এখন পুনর্জন্ম বলে আর কিছু নেই। মনের আবেগে গাথার মাধ্যমে তিনি পুনরায় একটি কথাই আবার উচ্চারণ করলেন।

ভিক্ষুদের নিয়ে বুদ্ধ কিছুদিন কোটিগ্রামে রইলেন। সেখানে থাকাকালীন প্রত্যহ তিনি ভিক্ষুগণকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি কোটিগ্রাম ত্যাগ করে নিকটবর্তী নাতিকাগ্রামে সদলবলে গিয়ে উপস্থিত হন। নাতিকাগ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব থেকেই নাতিকাগ্রামে তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য এবং শিষ্যা ছিলেন, যারা বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত। নাতিকাগ্রামের তাঁর অপর দুই প্রধান শিষ্য ভিক্ষু সাল্‌হ এবং ভিক্ষু সুদত্ত ইতিপূর্বেই পরলোক গমন করেছেন। অপর প্রধান শিষ্যা ভিক্ষুণী নন্দাও তখন পরলোকে। জীবিত থাকাকালীন এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় গ্রামবাসিগণের নিকট থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে, গ্রামবাসিগণের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ভিক্ষু সাল্‌হের সম্বন্ধে আনন্দকে উদ্দেশ করে বলেন যে, ভিক্ষু সাল্‌হ ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ। মৃত্যুর পর তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। এরপর অন্যান্য ভিক্ষুগণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি তাদের সম্বন্ধেও যথাযথ উত্তর দান করেন। এর ফলে গ্রামবাসিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরলোকগত নিকট আত্মীয়গণের সম্বন্ধে বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলে, তিনি বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন, মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, আমার পক্ষে উত্তর দেওয়াটা অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। এরপর তিনি তাদের উদ্দেশ করে জানালেন যে, ধর্মদর্শন নামে যে ধর্মপর্যায় প্রকাশ করেছি, তাতে শুদ্ধ ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তি

ইচ্ছে করলে নিজের সম্বন্ধে নিজেই সব কিছু জানতে এবং বলতে পারেন। পবিত্রাত্মা ব্যক্তি দর্পণে প্রতিফলিত বিম্বের ন্যায় সব কিছুই নিজে দেখতে পান। সেজন্যে সর্বপ্রথমে প্রত্যেকেরই পবিত্রাত্মা হবার জন্যে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। ধর্মস্রোতে স্নাত পবিত্র ব্যক্তি আলোকের পথেই উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে থাকেন এবং নির্বাণ লাভ করেন।

নাতিকাগ্রামে যে কয়দিন তিনি অবস্থান করেছিলেন, সে কয়দিন প্রত্যহই তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে শীল এবং প্রজ্ঞা সম্বন্ধে তাদের নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেছেন। এছাড়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল তাদের নিকট বর্ণনা করেন। এর পর সেখান থেকে তিনি বৈশালী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আনন্দ অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। তারপর বুদ্ধ নাতিকাগ্রাম ত্যাগ করে সদলবলে বৈশালীর পথে রওনা হলেন। বৈশালীতে উপস্থিত হয়ে, তিনি অপর কোথাও না গিয়ে আম্রপালীর আম্রকুঞ্জটিতে সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আম্রপালী ছিলেন বৈশালী নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপোপজীবিনী। অতুল ঐশ্বর্যশালিনী রূপবতী এই বিদুষী মহিলার সুখ্যাতি সে যুগে বৈশালীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকের মতে তিনিই নৃপতি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের জননী। সেকালের ভিষক-শ্রেষ্ঠ জীবক ছিলেন অভয়েরই পুত্র। জীবকের জন্ম হয় রাজগৃহের এক বারাঙ্গনার গর্ভে।

স্বয়ং বুদ্ধ ভিক্ষুগণসহ তার প্রিয় আম্রকুঞ্জটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন শুনে আম্রপালী অতিশয় আনন্দিত হলেন। তিনি তক্ষুণি আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের দর্শন লাভ করার পর তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে ভিক্ষুগণসহ তাঁর গৃহে আহারের জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এরপর অম্রপালী বুদ্ধের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে চলে আসার পর স্বয়ং লিচ্ছবীরাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। লিচ্ছবী-রাজও বুদ্ধের চরণ-বন্দনা করার পর রাজপ্রাসাদে তাঁকে সশিষ্য আহার গ্রহণের জন্যে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধ তখন লিচ্ছবীরাজকে আম্রপালী কর্তৃক তার গৃহে সশিষ্য তাঁর নিজের আহার গ্রহণের নিমন্ত্রণের উল্লেখ করে রাজার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। স্বয়ং লিচ্ছবীরাজের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে তাঁরই রাজ্যের একজন রূপোপজীবিনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় লিচ্ছবীরাজবংশের সকলেই বুদ্ধের প্রতি বিশেষভাবে মনক্ষুণ্ণ হন। যথাসময়ে বুদ্ধ সশিষ্য আম্রপালীর ভবনে উপস্থিত হলে আম্রপালী সকলকেই সমানভাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধ প্রমুখ সকল অতিথিকেই তিনি স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করেন। আহার শেষে বুদ্ধ তাঁর আলয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে তাঁকে ধর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষাও দান করেন। এরপর আম্রপালী তার প্রিয় আম্রকুঞ্জটি বুদ্ধকে উৎসর্গ করেন এবং সেখানে ভিক্ষুগণের জন্যে একটি বিহার নির্মাণ করবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানান। বৌদ্ধ সাহিত্যে

এই রূপোপজীবিনীর প্রচুর সুখ্যাতি দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে আম্রপালীর জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। পালি ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গাথা রয়েছে। সাহিত্যের দিক থেকে সেগুলো উচ্চাঙ্গের বলে পণ্ডিত সমাজে বিবেচিত হয়েছে।

আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে বুদ্ধ কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে প্রত্যহ তিনি ভিক্ষুগণকে করণীয় এবং অকরণীয় বিষয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন। এখানেই তিনি ভিক্ষুগণকে তাদের সর্ব অবস্থায় আচরণীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত করে অনুশাসন নির্দিষ্ট করেন। একদিন ভিক্ষুগণকে উপদেশ দান করতে গিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন, ভিক্ষুর স্মৃতিমান সর্ব অবস্থায় সদাজাগ্রত, সজ্ঞান ও সচেতন হয়ে থাকা উচিত। কিভাবে স্মৃতিমান সর্ব অবস্থায় সদাজাগ্রত হয়, সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভিক্ষুর উচিত কদর্য পদার্থে পরিপূর্ণ ক্ষণভঙ্গুর তার নিজের শরীরটিকে প্রথমে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করা। তারপর তার পর্যবেক্ষণ করা উচিত নিজ অন্তরস্থিত অনুভূতিসকলকে। সুখ এবং দুঃখ থেকে উৎপন্ন যে সকল অনুভূতি মনে জাগ্রত হয়, সেগুলোকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা। সেই সঙ্গে মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সকলকেও উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করা। তখনই কেবল তার পক্ষে অনলস ও অপ্রমত্ত হয়ে মনের হিংসা-লোভ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি-গুলোকে দমন করে সেগুলোকে মন থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়। এরূপ আচরণের দ্বারাই কেবল স্মৃতিমান সদাজাগ্রত হয়। সজ্ঞান সচেতন থাকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, হাঁটা, চলা, শোয়া, বসা, বাক্যালাপ অর্থাৎ সর্বপ্রকার অবস্থায়ই আত্মবিস্মৃত না হয়ে সদা সতর্ক থাকাই হল সজ্ঞান সচেতন হওয়া। কথা শেষে তিনি ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ করে পুনরায় জানালেন, ভিক্ষুর স্মৃতিমান সদাজাগ্রত এবং সজ্ঞান সচেতন থাকা উচিত। ভিক্ষুগণের প্রতি এটি তাঁর অনুশাসন।

ভিক্ষুগণের প্রতি এই অনুশাসন নির্দেশ করার অল্প কয়েকদিন বাদেই তিনি আম্রপালীর আম্রকুঞ্জ ত্যাগ করে ভিক্ষুগণসহ পুনরায় পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। ক্রমে তিনি বৈশালীর নিকটবর্তী বেলুবগ্রামে (বিলবগ্রামে) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যখন সেখানে গেলেন, তখন আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি আগত প্রায়। সুতরাং বিলবগ্রামেই তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাসকাল বর্ষাবাস করবেন বলে স্থির করেন। তিনি তখন ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন, বৈশালী তোমাদের অতি পরিচিত স্থান, এখানে তোমরা বর্ষাবাসের জন্যে নিজেদের সুবিধামত উপযুক্ত স্থানের সংকুলান করে নাও। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সর্বপ্রথম বর্ষা উদযাপন করেন বারাণসীর ইসিপতনে। সেখানে বর্ষা উদ্‌যাপন করে তিনি সেখানকার নব দীক্ষিত

ভিক্ষুগণকে দিকে দিকে ধর্মপ্রচারে অগ্রসর হতে নির্দেশ দান করে ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। সেই থেকে তিনি রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, পারিলেয়বন প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে চুয়াল্লিশবার বর্ষা উদ্‌যাপন করে, বৈশালীর নিকটবর্তী এই বিলুগ্রামে প'য়তাল্লিশ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। এই গ্রামটিতেই তাঁর শেষ বর্ষা উদ্‌যাপিত হয়। সেজন্য বিলুগ্রামের এই বর্ষাবাস বৌদ্ধগণের নিকট বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বর্ষা আরম্ভের প্রায় সাথে সাথেই তাঁর কঠিন পীড়া দেখা দেয়। আন্ত্রিক রোগে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং নিদারুণ কষ্ট উপভোগ করতে থাকেন। আনন্দ প্রভৃতি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁর রোগের উপশম ঘটিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হোল না। তখন সকলের মনেই এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, বুঝি বা এখানেই তথাগত দেহ রক্ষা করেন। ইতিপূর্বে আম্রপালীর আম্রকাননে ভিক্ষুগণকে স্মৃতিমান সদা-জাগ্রত রাখার জন্যে তিনি যে নির্দেশ দান করেছিলেন, এবার তিনি নিজে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ভিক্ষুগণের নিকট তা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরলেন। নিদারুণ রোগ যন্ত্রণা সত্ত্বেও স্মৃতিমান সদা জাগ্রত রেখে অবিচলিতভাবে তি'নি তাঁর সেই অসহ্য রোগ যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে থাকেন এবং সেজন্যে কোন বিকার অথবা মানসিক পরিবর্তন কেউ তাঁর মধ্যে কখনও লক্ষ্য করেননি। তিনি যখন দেখলেন যে, এভাবে কাউকে কিছু না বলে পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে ঠিক হবে না, তখন তিনি সমাধিজাত পরাক্রমে শরীর থেকে ব্যাধিকে দূর করে দিয়ে ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং নিজ আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নেবার সংকল্প করেন।

বুদ্ধকে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আনন্দ। সবচেয়ে বেশী পরিমাণে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বোধহয় তিনিই। বুদ্ধের রোগমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারেননি তিনি। এমন কি ধর্মচর্চা করার পক্ষেও তাঁর যথেষ্ট ব্যঘাত দেখা দিয়েছিল। তবে এটুকু বিশ্বাস তাঁর অন্তরে ছিল যে, বুদ্ধ কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এভাবে পরিনির্বাণ লাভ করবেন না। পরিনির্বাণের পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা নিশ্চয়ই জানিয়ে যাবেন। বুদ্ধের রোগমুক্তির পর একদিন অপরাহ্ণে বিহারে একটি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসে, বুদ্ধের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আনন্দ তাঁর উদ্বেগের কারণ জানিয়েছিলেন তাঁকে। আনন্দের মুখে তাঁর উদ্বেগের কথা শুনে বুদ্ধ সেদিন আনন্দকে বলেছিলেন, আমি ত ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে প্রচার করে দিয়েছি। মুষ্টিবদ্ধ করে কিছুই আমি গোপন রাখিনি। এর পরেও ভিক্ষুসংঘ আমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করতে পারে? তারপর তিনি ভিক্ষু সংঘের কথা তুলে আনন্দকে জানালেন, "আমি মনে করি না যে, ভিক্ষুসংঘ আমার আশ্রিত এবং আমিই তাদের

পরিচালনা করি।” সুতরাং তাদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলতে ত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এই কটি কথার মধ্য দিয়েই তিনি ভিক্ষু সংঘের নিজস্ব সাবলীল গতির ইঙ্গিত প্রদান করেন। এরপর তিনি আনন্দকে উদ্দেশ করে বলেন, এখন আমি জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আমার এই দেহখানি এখন জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শকট পুরাতন হয়ে গেলে, তারপর তাকে পরিচালিত করতে গেলে যেমন প্রায় সর্বক্ষণই তার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়, ঠিক তেমনিভাবেই এখন পরিচালিত করতে হচ্ছে আমার এই জরাজীর্ণ দেহখানিকে। জরাজীর্ণ শকট যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালনা করা হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার যেমন সংস্কারের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না; সে রকম আমি যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধিমগ্ন অবস্থায় থাকি, ততক্ষণই কেবল সুস্থ থাকি। আনন্দকে উদ্দেশ করে এরপর তিনি বলতে থাকেন, ধর্মের আশ্রয় নাও, ধর্মকে ভিত্তি করে নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা কর। কারুরই মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না। নিজেই নিজের দীপ জ্বালো। আমার অবর্তমানে যে ভিক্ষুরা একমাত্র ধর্মকে আশ্রয় করে নিজেই নিজের দীপ জ্বালবে, একমাত্র ধর্মেরই আশ্রয় নেবে, সেই ভিক্ষুগণই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সংঘ সম্বন্ধে বুদ্ধের এই শেষ উক্তি।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। আকাশে বাতাসে দেখা দিয়েছে শরতের আমেজ। এবার বুদ্ধের বিল্বগ্রাম তথা বৈশালী ত্যাগ করে চলে যাবার সময় এসেছে। ভিক্ষাপাত্র হস্তে বুদ্ধ বৈশালীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বের হলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এসে মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি আহার শেষ করলেন। তারপর আনন্দকে ডেকে বললেন, আজ চাপাল চৈত্যে দিবা যাপন করবো। এই বলে বুদ্ধ নিকটবর্তী চাপাল চৈত্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আনন্দ বুদ্ধের আসনখানি স্বহস্তে গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। চাপাল চৈত্যে পেঁছে বুদ্ধ আনন্দকে আদেশ করলেন আসনখানিকে পেতে দেবার জন্যে। উপযুক্ত স্থানে আসনখানি পাতা হলে, বুদ্ধ তার উপরে উপবেশন করে উদয়ন চৈত্যের দিকে খানিকক্ষণ মৌনভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন, যে ব্যক্তির দিব্য বিভূতি আয়ত্ব, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তারপর তাঁর নিজের প্রতি আনন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠলেন, এই তথাগত অনায়াসে তার আয়ুসীমা বাড়িয়ে নিতে সমর্থ। আনন্দ নিজে যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্ত্বেও সেদিন বুদ্ধের এই ইঙ্গিতটুকুর মর্মার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। বুদ্ধের এ কথার উত্তরে তিনি নীরব রইলেন। সে সময়ে আনন্দের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সাময়িকভাবে কিরকম যেন একটা জড়তা প্রবেশ করেছিল। তিনি কিছুতেই বুদ্ধের কথার অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি, অথবা বুদ্ধের কথার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেননি। সবকিছুই যেন কিরকম

একটা হেঁয়ালীর মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছিল। বুদ্ধের কোন কথাই তিনি শুনেও যেন শুনতে পাননি, এই রকম একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়েছিল তখন আনন্দের মধ্যে। বুদ্ধ যখন তৃতীয়বারও আনন্দের নিকট একই উক্তি করেন, তখনও তিনি বুদ্ধের উক্তির মর্মার্থ গ্রহণ করে নিতে সমর্থ হননি এবং পূর্বের মতই নীরব থাকেন। এরপর বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পার। গিয়ে বিশ্রাম নাও। আনন্দ বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে নিকটে বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

আনন্দ বিদায় গ্রহণ করার পর চারিদিক নিস্তব্ধ হল। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে আকাশ থেকে ধ্বনি উত্থিত হল। তথাগতের পরিনির্বাণের সময় আসন্ন। সেই ধ্বনি শ্রুত হতেই বুদ্ধ বলে উঠলেন, তিনমাস পরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন। পরিনির্বাণের সময় ঘোষণা করার পরই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন ঃ—

তুলম তুলঞ্চ সম্ভবং
ভবসংখারম্ বসস্জি মুণি
অজঝত্তরতো সমাহিতো
অভিন্দি কবচমিবত্ত সম্ভবং

বুদ্ধ যখন গাথার মাধ্যমে তাঁর আয়ু বিসর্জন দিলেন, সে সময়ে মার এসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। মার বুদ্ধকে বললো আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার আপনি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় গ্রহণ করুন। মারের উক্তি শেষ হবার সাথে সাথেই বুদ্ধ বলে উঠলেন, আমি ইতিপূর্বেই আমার আয়ুঃসীমা ঘোষণা করে দিয়েছি। বুদ্ধের কথা শুনে মার সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে। এদিকে বুদ্ধের আয়ু বিসর্জনের ঘোষণা আনন্দের শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র তাঁর বুদ্ধির জড়তা দূরে হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে তাঁর তখন মনে উদিত হল, যেন সমগ্র পৃথিবীতে অতি ভীষণ অন্ধকার নেমে আসছে। যেন প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হতে চলেছে। তিনি ছুটে চলে এলেন বুদ্ধের নিকটে। বুদ্ধ তাঁর ব্যস্তভাব লক্ষ্য করে তাঁকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আনন্দ আমি এখানে এই চাপাল চৈত্যে এইমাত্র আমার আয়ু সংস্কার বিসর্জন দিয়েছি। আর তিন মাস পরেই আমি পরিনির্বাণ লাভ করবো। বুদ্ধের কথা শেষ হতে আনন্দ নতশিরে বুদ্ধকে বলে উঠলেন, আপনিই ত বলেছেন, যার চারি ঋদ্ধিপাদ আয়ত্ব, তিনি অনায়াসেই নিজের আয়ুঃসীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, জগতের কল্যাণে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে, আপনি আরও কিছুদিন অন্ততঃ আয়ুঃসীমা বাড়িয়ে নিন। আনন্দের অনুরোধের উত্তরে বুদ্ধ শুধু জানালেন যে, এখন আর অনর্থক অনুরোধ কোরো না। কিন্তু আনন্দ শুনলেন না। তিনি বুদ্ধকে পুনরায় আয়ুসীমা

বাড়িয়ে নেবার জন্যে কাতরভাবে অনুরোধ জানালেন। সেবারেও বুদ্ধ আনন্দকে একই উত্তর দান করলেন। এর পরেও আনন্দ তৃতীয়বার বুদ্ধকে আয়ুঃসীমা বাড়িয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানালে, বুদ্ধ আনন্দকে বলেন পর পর তিনবার তোমাকে ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও তুমি নীরব ছিলে। তখন যদি তুমি আমাকে অনুরোধ জানাতে, তাহলে আমি তোমার সেই অনুরোধ রক্ষা করে আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম ছিলাম। এখন যখন আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়ে একবার আমার পরিনির্বাণের সময় ঘোষণা করেছি, তখন তথাগতের পক্ষে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া মোটেই শোভা পায় না। আমি এখানে এই চাপাল চৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছি, তিনমাস পরেই আমি পরিনির্বাণ লাভ করবো। এর আর অন্যথা হবে না। তুমি এ বিষয় নিয়ে আমাকে আর অনুরোধ কোরো না। তারপর আনন্দকে উদ্দেশ করে তিনি আরও বলেন, প্রিয়জনদের থেকে একদিন সকলকেই বিদায় নিতে হবে। কিছুতেই তার গতিরোধ করা যায় না। বুদ্ধের মুখে একথা শোনার পর আনন্দ নীরব হলেন। তখন মধ্যাহ্ন কাল অতীত হয়ে গিয়েছে।

অপরাহ্ণ সময়ে বুদ্ধ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাপাল চৈত্য থেকে নিকটবর্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালার দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। আনন্দও তাঁকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকেন। কূটাগারশালায় পেঁছে তিনি আনন্দকে আদেশ দিলেন, বৈশালীতে যত ভিক্ষু আছেন, তাঁদের সকলকেই এখানকার অতিথিশালায় এসে সমবেত হতে বল। বুদ্ধের আদেশ পেয়ে আনন্দ বিহারে বিহারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার ভিক্ষুগণকে জানালেন বুদ্ধের নির্দেশ। আনন্দের মুখে বুদ্ধের নির্দেশ শুনে ভিক্ষুগণ সকলেই এসে সমবেত হলেন অতিথিশালায়। ভিক্ষুগণের আগমনের সংবাদ আনন্দ গিয়ে জানালেন বুদ্ধকে। বুদ্ধ তখন ধীরে ধীরে চলে এলেন অতিথিশালায়। অতিথিশালার বেদিকার উপর আসন গ্রহণ করে বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ করে জানালেন, যে ধর্ম আমি নিজে উপলব্ধি করেছি, সেই ধর্ম আমি এতকাল তোমাদের মধ্যে প্রচার করে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে সেই পথে চলতে অভ্যাস করবে। সেই আদর্শকে জগতের কল্যাণে, সমগ্র জীবের কল্যাণে এবং তোমাদের জীবনে প্রতিফলিত করবে। সৃষ্টি অনিত্য। এই বিশ্বসংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সর্বদা অপ্রমত্ত থেকে ভিক্ষুগণের করণীয় কার্য সম্পন্ন করবে। তারপর নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি ভিক্ষুদের জানালেন, তথাগতের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনমাস বাদেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষুগণ একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে তাঁর বাণী গ্রহণ করে চলেছিলেন, সর্বশেষে যখন তিনি তাঁর পরিনির্বাণের সময় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন, তখন সকল ভিক্ষুই বিষাদে মগ্ন হলেন। তাঁদের মধ্যে তখন ক্রন্দনের রোল উত্থিত হল। বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ করে পুনরায় শান্ত

গম্ভীর স্বরে সুললিত ছন্দে উচ্চারণ করে উঠলেন ঃ—

পরিপক্কো বযো মযহং পরিত্তং মম জীবিতং
পহায বো গমিস্সামি কতং মে সংনমত্তসো।
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুশীলা হোথ ভিক্খবো
সুসমাহিত সংকপ্পো সচিত্ত মনুরক্খথ।
যো ইমস্সিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি
পহায জাতি সংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি।

(হে ভিক্ষুগণ, এখন আমার বয়স হয়েছে, আয়ুও শেষ হয়েছে। এবার তোমাদের ছেড়ে আমি চলে যাব। পরম আশ্রয় আমি তোমাদের জন্যে গড়ে তুলেছি। তোমরা অপ্রমত্ত স্মৃতিমান ও সুশীল হও এবং সৎ সংকল্পরত সুসমাহিত থেকে নিজ চিত্তকে অনুসরণ করো। যে কেউ এই ধর্ম শাসনে অপ্রমত্ত হয়ে চলবে, সে জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ থেকে মুক্তিলাভ করবে।)

ভিক্ষুগণের নিকট তাঁর পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করার অল্প কয়েকদিন পরেই বুদ্ধ বৈশালী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যেদিন তিনি বৈশালী ত্যাগ করবেন, সেদিন তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহের শেষে আহার সমাপ্ত করে আনন্দকে নির্দেশ দিলেন বৈশালী ত্যাগ করে ভাণ্ড গ্রামের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে। যাত্রার পূর্বে তিনি শেষবারের মত একবার বৈশালীর চতুর্দিক অবলোকন করলেন। তাঁর সেই দৃষ্টি ছিল চির বিদায়ের। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকে বলে উঠলেন, আনন্দ এই আমার শেষ বৈশালী দর্শন।

ভাণ্ডগ্রামে তিনি বেশিদিন অতিবাহিত করেননি। অল্প কয়েকদিন মাত্র সেখানে কাটিয়েছিলেন। যে কয়দিন তিনি ভাণ্ডগ্রামে কাটিয়েছিলেন, সে কয়দিন প্রত্যহই তিনি ভিক্ষুগণের নিকট চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভাণ্ডগ্রাম ত্যাগ করে তিনি চলে আসেন নিকটবর্তী ভোগ-নগরে। ভোগনগরে এসে তিনি সেখানকার বিখ্যাত আনন্দ চৈত্যে অবস্থিতি করতে থাকেন। আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করার সময়ে তিনি ভিক্ষুদের ধর্মপথে চলতে গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যে কয়েকটি রীতি মেনে চলার জন্যে নির্দেশ দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে সেই রীতিগুলোকে খুব সাধারণ বলে মনে হলেও, সেগুলোর গুরুত্ব মোটেই সাধারণ নয়। সেই রীতি সকলের গুরুত্ব অপরিসীম। ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে প্রথমেই তিনি বলেন, আমার অবর্তমানে যদি কেউ কখনও এসে তোমাদের নিকট কোন বিষয় সম্বন্ধে, অথবা কোন উক্তি উদ্ধৃত করে জানায় যে, এই বিষয়টি আমি তথাগতের নিকট থেকে অবগত হয়েছি, অথবা এই উক্তি আমি তথাগতের মুখ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণ করেছি, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ না করে এবং সমর্থন না করে বিনয় সুত্তের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখবে। যদি তা বিনয় সুত্তের সঙ্গে মিলে না যায়, তবে জানবে যে, তা তথাগতের উক্তি বা বিষয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে

তোমরা সেটিকে বর্জন করবে। আর যদি তা বিনয় সুত্তের সঙ্গে মিলে যায় তবে তোমরা সেটিকে তথাগতের উক্তি বলে গ্রহণ করে নিতে পার। এরকমভাবে যে কেউ এসে তোমাদের নিকটে তথাগতের নাম করে কোন কিছু চালাতে চেষ্টা করলে তোমরা সর্বদাই তা বিনয় সুত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। বিনয় সুত্তের সঙ্গে মিলে গেলে সেটিকে তোমরা তথাগতের উক্তি বলে মেনে নেবে, নচেৎ কদাচ নয়। ভিক্ষুদের শাস্ত্র হল বিনয়। বিনয়কে তোমরা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় মেনে চলবে। বিনয় বহির্ভূত কোন উক্তি তোমরা গ্রহণ করবে না এবং সেই অনুসারে কোন কাজে অগ্রসর হবে না। বিনয়ের উক্তিকে যথাযথভাবে মেনে চলার জন্যে ভিক্ষুগণের প্রতি বুদ্ধের এটিই শেষ নির্দেশ।

ভোগনগরে অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, চল, এবারে পাবার দিকে অগ্রসর হওয়া যাক্। বুদ্ধের অনুমতি পাবার পর আনন্দ তখনই ভিক্ষুসংঘসহ পাবায় যাবার জন্যে সর্বপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন। এরপর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ পাবার পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। ভোগনগর থেকে পাবা খুব বেশী দূরে নয়। পাবায় উপস্থিত হয়ে, ভিক্ষুগণসহ তিনি কর্মকার চুন্দের বিশাল আম্রবনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৈশালীর নিকটবর্তী বেযুবগ্রামে পঁয়তাল্লিশতম বর্ষা এবং তার জীবনের শেষ বর্ষা উদ্‌যাপন করার পর নানা স্থান পরিভ্রমণ করে যখন তিনি পাবায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন বৈশাখী পূর্ণিমার পক্ষ দেখা দিয়েছে। বুদ্ধের আগমনের সংবাদ পেয়ে কর্মকার চুন্দের আনন্দের আর সীমা রইলো না। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি তক্ষুণি তাঁর আম্রকুঞ্জে এসে বুদ্ধের চরণ বন্দনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মোপদেশ দান করে পরিতৃপ্ত করেন। এরপর চুন্দ ভিক্ষু সংঘ সহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে আহার গ্রহণের জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করে তাঁর সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চুন্দ তাঁর সাধ্যমত সশিষ্য বুদ্ধের আহারের উপযুক্ত সর্বপ্রকার আয়োজন সুসম্পন্ন করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শূকর মদ্দবেরও ** আয়োজন করা হয়েছিল।

** শূকর মদ্দব বস্তুটি নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। কারুর মতে সেটি শূকরের মাংস, আবার কারুর মতে একপ্রকার পরমান্ন। আবার কারুর মতে ক্লান্তি অপনোদনকারী একপ্রকার ভেষজ পানীয় বিশেষ। এবিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূকর মদ্দবকে অনেকেই শূকর মাংস বলে অভিহিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। পালিভাষায় মাংসকে মদ্দব বলা হয় না, 'মাংস' বলা হয়। খুব সম্ভবতঃ পথের কষ্ট যাতে লাঘব হয় এবং শরীর সুস্থ রাখে এরকম ধরনের একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করার রীতি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল এবং সেটির প্রস্তুতও কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল বলেই মনে হয়। ভিক্ষুগণ সাধারণভাবে নিরামিষভোজী। কর্মকার চুন্দ ছিলেন বুদ্ধের একজন পরমভক্ত ও উপাসক। তিনি ভিক্ষুগণসহ বুদ্ধকে তাঁর নিজ গৃহে আহারের জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের ভোজনের জন্যে শূকর মাংসের আয়োজন করেছিলেন এটা ভাবতে পারা যায় না।

সশিষ্য চুন্দের গৃহে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ সর্বপ্রথমে তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি আমাদের জন্যে যে শূকর মদ্দবের ব্যবস্থা করেছ, তা শুধু আমাকেই দাও। অন্য কাউকে যেন তা দিও না, কেননা অন্যে কেউ তা সহ্য করতে পারবে না। আমাকে দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করে ফেলবে। চুন্দ সেদিন একথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। আদেশমত তিনি তথাগতকেই কেবল শূকর মদ্দব পরিবেশন করলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণকে বিভিন্ন প্রকার আহার্য স্বহস্তে পরিবেশন করলেন।

আহার গ্রহণের অল্প পরেই বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সর্ব শরীরে তিনি নিদারুণ জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন। সেই অবস্থায়ই তিনি চুন্দের গৃহত্যাগ করে কুশীনগরের পথে সশিষ্য অগ্রসর হয়ে গেলেন। পথ অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি অতিশয় কষ্ট অনুভব করতে থাকেন। শেষে আর পথ চলতে না পেরে, অতিশয় ক্লান্ত অবস্থায় তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত সামর্থ্যটুকুও আর তখন তাঁর ছিল না। বুদ্ধের নির্দেশমত আনন্দ একখানি চাদরকে সেখানে ভাঁজ করে পেতে দিলে বুদ্ধ তার উপরে উপবেশন করেন। এরপর তিনি আনন্দকে একটু পানীয় জল এনে দেবার জন্যে বললেন। আনন্দ নিকটবর্তী ক্ষুদ্র কুকুধা নদী থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এনে দিলেন। সেই জল পান করে বুদ্ধ খানিকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চল অবস্থায় সেই আসনেই উপবিষ্ট রইলেন। এমন সময়ে অড়ার কালাম ঋষির উপাসক মল্লপুত্র পুক্কুস সেখান দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। বুদ্ধ তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন। কথা প্রসঙ্গে মল্লপুত্র পুক্কুস বুদ্ধের আসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর পদযুগলের উপর নত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করলেন। বুদ্ধ তাকে দীক্ষা দান করলেন। পুক্কুসের নিকট স্বর্ণবর্ণের দু'খানি উৎকৃষ্ট উত্তরীয় ছিল। তিনি সে দু'খানি উত্তরীয় বুদ্ধকে দান করলেন। বুদ্ধ সে দুখানি উত্তরীয় গ্রহণ করে একখানি তাঁর নিজ গাত্রে রেখে অপরখানি আনন্দকে দান করলেন। এরপর পুক্কুস বুদ্ধকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

পুক্কুস চলে যাবার খানিকক্ষণ বাদে আনন্দ লক্ষ্য করলেন বুদ্ধের সর্বশরীর থেকে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছে। তার দেহস্থিত স্বর্ণবর্ণের সেই অতি উৎকৃষ্ট উত্তরীয়খানিও সেই দিব্য জ্যোতির নিকট নিতান্তই ম্লান এবং নিষ্প্রভ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রথমে তিনি নিজে এর কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন। তাতে অকৃতকার্য হয়ে তিনি শেষে বুদ্ধকেই এর কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন। আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ

জানালেন যে, তথাগতের দেহে দু'বার মাত্র দিব্য প্রভা আবির্ভূত হয়ে থাকে। যেদিন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেইদিন, আর যেদিন তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন সেই দিন। একথা জানানোর পর তিনি আনন্দকে বললেন, অদ্যই রাত্রির শেষ প্রহরে নিকটবর্তী মল্লদের শালবনে তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন।

আনন্দকে একথা জানানোর পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া কুকুধা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই নদীতে অবগাহন করে তিনি জীবনের শেষ স্নানপর্ব সমাপন করে নিলেন। তারপর নদী অতিক্রম করে নিকটবর্তী আম্রকুঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কর্মকার চুন্দের গৃহে আহার গ্রহণ করার পর যখন তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন চুন্দ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। তারপর যখন অসুস্থ অবস্থায়ই তিনি চুন্দের গৃহ ত্যাগ করে চলে আসেন, তখন ভিক্ষুগণের সঙ্গে সঙ্গে চুন্দও মহা উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁকে সমানে অনুসরণ করে চলতে থাকেন। এবারে আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করে তিনি সর্বপ্রথমে চুন্দকে ডেকে বললেন, একখানি চাদর চারভাঁজ করে পেতে দাও, আমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নেবো। বুদ্ধের আদেশমত চুন্দ একখানি চাদরকে চারভাঁজ করে সুন্দর করে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। বুদ্ধ সেই চাদরখানির উপর দক্ষিণ পার্শ্বে হেলান দিয়ে সিংহশয্যায় শয়ন করে খানিকক্ষণ মৌনভাবে থাকার পর আনন্দকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনও চুন্দকে এমন কথা বলে যে, তোমার গৃহে আহার গ্রহণ করার ফলেই তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যান, অথবা চুন্দ নিজেও যদি কখনও আক্ষেপ করে এমন কথা কখনও বলেন যে, আমারই পরম দুর্ভাগ্য যে, আমার গৃহে আহার গ্রহণ করেই তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধরাধাম ত্যাগ করেন, তখন তোমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে দিও ; চুন্দ তোমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বয়ং তথাগত তোমার গৃহে উপস্থিত হয়ে অন্তিম আহার গ্রহণ করেছেন। তারপর তাঁকে একথাও বলবে, যে তথাগতকে দু'টি আহার দানের একই ফল লাভ হয়ে থাকে। যে আহার গ্রহণ করার পর তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আর যে আহার গ্রহণ করে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করেছিলেন আর অন্তিম আহার গ্রহণ করলেন কর্মকার চুন্দের গৃহে। সুজাতা এবং কর্মকার চুন্দ উভয়েই সমান ফল লাভের অধিকারী হলেন।

কুকুধা নদীতীরের আম্রকুঞ্জ ত্যাগ করে বুদ্ধ এরপর এগিয়ে চলতে থাকেন কুশীনগরের দিকে। নিকটবর্তী হিরণ্যবতী নদীর তীরে পৌঁছে তিনি অতিশয় শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পথ চলতে তখন তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও ধীরে শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। তারপর সেই স্বচ্ছ-তোয়া হিরণ্যবতী নদী হেঁটে পার হয়ে মল্লদের শালবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন

তিনি। মল্লদের শালবনে প্রবেশ করার পর তাঁকে দেখে সকলের মনে ধারণা জন্মেছিল যে, আর অগ্রসর হবার ইচ্ছে তাঁর নেই। সেখানে একটি শাল বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি আনন্দকে বললেন, উত্তর শিয়রে খাটিয়া পেতে দেবার জন্য। আনন্দ তখনই যুগ্ম শালের অন্তরালে উত্তর শিয়রে খাটিয়া পেতে দিলেন। বুদ্ধ অভ্যাসমত সেই খাটিয়ার উপর দক্ষিণপার্শ্ব ভর করে সিংহশয্যায় শয়ন করে মৌন হলেন। সে সময়ে তাঁর সমস্ত দেহখানি অতি অপূর্ব এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে শালবনের প্রতিটি তরু নব পত্রে এবং ফুলে ভরে গিয়ে সমগ্র বনখানিতে এক অপরূপ নৈসর্গিক শোভার সৃষ্টি করে রেখেছিল। শালতরু থেকে অজস্র ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগলো বুদ্ধের দেহখানির উপরে। সেদিন স্বয়ং প্রকৃতিই যেন বুদ্ধের পূজোয় মেতে উঠেছিলেন। সেদিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। খানিকক্ষণের মধ্যেই সমগ্র গগনখানি আলোয় প্লাবিত করে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল। শুভ্র চাঁদের আলোয় সেই সুন্দর বনভূমি এক অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করলো। সেই সুন্দর বনভূমিতে শাল তরুর নিচে খাটিয়ার উপরে দিব্যজ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে বুদ্ধ নীরবে শায়িত অবস্থায় রইলেন। বুদ্ধের দেহ নিঃসৃত দিব্যজ্যোতি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লুত সেই সুন্দর বনভূমির নৈসর্গিক শোভাকেও অতিক্রম করে মর্তে সেদিন স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতেই তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই পুণ্য দিনেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আবার এই পুণ্য তিথিতেই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করতে চলেছেন। বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি তিন দিক থেকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

খানিকক্ষণ বাদে মৌনতা ভঙ্গ করে তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে ধীরে শান্ত বচনে বললেন, যারা ধূপ ধুনো দিয়ে ফুল দিয়ে নানা উপচার সংগ্রহ করে আমার পূজোয় মেতে ওঠে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাতে তথাগতের প্রকৃত পূজো হয় না। যারা আমার উপদেশ গ্রাহ্য করে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হবার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই হলো আমার প্রকৃত পূজারী। তোমরা সর্বদাই আড়ম্বর ত্যাগ করে সত্যনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ হয়ে পথে অগ্রসর হও। বুদ্ধের কথার পর আনন্দ মনের আবেগ দমন করে রাখতে পারেননি। তথাগত বিদায় নিয়ে চিরকালের জন্যে তাঁদের সংঘ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করে উঠতে পারছিলেন না। বুদ্ধকে উদ্দেশ করে আনন্দ বলে উঠলেন, আপনার নিকট দেশ-বিদেশ থেকে কত মহামানবের আগমন হয়, তাদের দর্শনে আমরা পরম আনন্দ উপভোগ করে থাকি। আপনার অবর্তমানে আমরা সেই আনন্দ থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হব। বুদ্ধ তখন আনন্দকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, যেখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, যেখানে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন এবং যেখানে

তিনি পরিনির্বাণ লাভ করতে চলেছেন, এই চারিটি স্থান পরিদর্শন করবার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তগণের এবং মহাত্মাগণের চিরকাল আগমন হতে থাকবে, এবং এই চারিটি তীর্থে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁরা কৃতার্থ হবেন। যাঁরাই এই চারিতীর্থ পরিক্রমা করবেন, তাঁরাই সুগতি লাভ করবেন। এই চারিটি তীর্থ পরিক্রমা কালে যদি কারুর দেহান্ত ঘটে তবে তিনিও সুগতি লাভ করবেন। এই চারিটি বৌদ্ধ তীর্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দানের পর বুদ্ধ পুনরায় মৌনতা অবলম্বন করেন। এরপর আনন্দ বুদ্ধকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পুনরায় তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করেন।

প্রথমে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, মাতৃজাতির প্রতি ভিক্ষুগণের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত। আনন্দের এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি শুধু একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন—অদর্শন। এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ দ্বারাই তিনি আনন্দের প্রশ্নটির উত্তর দান সম্পূর্ণ করেন। এর পর আনন্দ দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, যদি দর্শনের প্রয়োজন হয়? এর উত্তরে তিনি সংক্ষেপে জানালেন, আলাপ করবে না। আনন্দ এর পর তৃতীয়বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, যদি সে রকম কোন প্রয়োজন দেখা দেয়? এই প্রশ্নটির উত্তরে তিনি জানালেন, যদি সে রকম প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখবে। এই স্মৃতিকে সদা জাগ্রত রাখাই ভিক্ষুদের প্রধান কর্তব্য। আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে অবস্থান সময়েও তিনি ভিক্ষুগণকে স্মৃতিমান সদা জাগ্রত রাখার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে বেথুব গ্রামে আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর নিজে স্মৃতিমান জাগ্রত রেখে ভিক্ষুগণকে হাতে কলমে তা শিক্ষাদান করেছিলেন। সেই স্মৃতিমানকেই সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখার জন্যে তিনি পনুরায় অন্তিম সময়ে নির্দেশ রেখে গেলেন। নারীজাতির প্রতি ভিক্ষুগণের আচরণ বিধি সম্বন্ধে আনন্দ এরপর আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। এরপর খানিকক্ষণ মৌনভাবে থাকার পর আনন্দ তথাগতের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর মরদেহের সৎকারের জন্যে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ জানতে চাইলে, বুদ্ধ তার উত্তরে বলেন, যেভাবে রাজচক্রবর্তীগণের মরদেহের সৎকার সাধিত হয়ে থাকে, তথাগতের মরদেহের সৎকারও সেইভাবেই হওয়া উচিত। সৎকারের পর তথাগতের দেহাবশেষের অংশ বিশেষ চারি পথের সংযোগ স্থলে স্থাপন করে, তার উপরে স্তূপ নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই স্থানের বেদীমূলে যাঁরা সমবেত হয়ে ধূপ-ধুনো ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবেন, তাঁরা পুণ্যার্জন করিবেন। এভাবে তাঁরা তথাগতকে সদা স্মরণে রেখে তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবেন। এরপর তিনি বলেন, শুধু তথাগতের দেহাবশেষের উপরেই নয়, অর্হৎ, জ্ঞানীপুরুষ, পবিত্রাত্মা এবং রাজচক্রবর্তীর দেহাবশেষের উপরেও স্তূপ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তাদের থেকেও লোকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা

লাভ করে থাকেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, তথাগতের দেহাবশেষ নিয়ে অনেকেই মেতে উঠবেন। তোমরা তথাগতের দেহ পূজার জন্য মেতে উঠবে না। তোমরা অপ্রমত্ত থেকে ধীর স্থির ভাবে অগ্রসর হয়ে পরম সিদ্ধি লাভের জন্যে যত্নবান হবে। আনন্দকে এই নির্দেশ দানের পর বুদ্ধ পুনরায় মৌন হলেন। আনন্দও বুদ্ধকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে প্রণাম করে বিহারে ফিরে গেলেন। আনন্দকে এই নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের প্রধান বক্তব্যটিকে সযত্নে পুনরায় সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁকে পূজা না করে অবিচলিত ভাবে ধর্মপথে অগ্রসর হবার জন্যে তিনি পুনরায় নির্দেশ রেখে গেলেন।

বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে বিহারে ফিরে আসার পর আনন্দ আত্মসম্বরণ করে নিজেকে স্থির রাখতে সমর্থ হননি। দুঃখে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কাতর ভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, তথাগত আজই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল তাঁর সেবা যত্ন করার পরেও ত আমার এখনও অনেক কিছু কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আনন্দের ভেঙ্গে পড়ার সংবাদ বুদ্ধ জানতে পেরে ভিক্ষুগণকে আদেশ করলেন, আনন্দকে পুনরায় তার সম্মুখে এনে উপস্থিত করবার জন্যে। বুদ্ধের আদেশ পেয়ে ভিক্ষুগণ তক্ষুণিই গিয়ে আনন্দকে পুনরায় এনে উপস্থিত করলেন বুদ্ধের সম্মুখে। এবারে বুদ্ধ আনন্দকে সান্ত্বনা দান করবার জন্যে বলতে লাগলেন, আনন্দ, পূর্ব পূর্ব জন্মেও সংসারের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে থেকেও তুমি সাধ্যমত আমার যে সেবা যত্ন করেছ, তা বিফলে যাবে কেন? শীঘ্রই তুমি তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভ করে অর্হৎ হবে। চিন্তা কোরোনা। অযথা ব্যস্ত হয়োনা এবং আমার জন্যে শোক কোরোনা। প্রিয়জনদের ছেড়ে সকলকেই একদিন এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। একথা আমি তোমাদের বহুবার বলেছি। যার একবার জন্ম হয়েছে, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। এর জন্যে শোক করা বৃথা। এরপর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুদের সম্মুখেও আনন্দের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। স্বয়ং বুদ্ধের মুখে সেদিন আনন্দের প্রশংসা শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ বাদে আত্মস্থ হবার পর আনন্দ পুনরায় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারানসী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সকল পরিহার করে কেন তিনি কুশীনগরের ন্যায় অখ্যাত ক্ষুদ্র স্থানটিকে তার মহাপরিনির্বাণের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত করলেন। আনন্দের এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানালেন, যে অতি প্রাচীনকালে কুশীনগরও জম্বুদ্বীপের একটি প্রধান এবং সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। পূর্বজন্মে একবার তিনি এই নগরের রাজারূপে এখানে রাজত্ব পরিচালনা করে গিয়েছেন। সে সময়েও যশোধারা তার রাণী ছিলেন এবং রাহুল তার পুত্র ছিলেন। একথা বলার পর তিনি আনন্দকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন, কুশীনগরে তাঁর পরিনির্বাণের

কথা সেখানকার মল্লদের জানাবার জন্যে। যাতে তথাগতের শেষ দর্শন লাভে তারা বঞ্চিত না হন এবং এজন্যে তাদের মনে ভবিষ্যতে যাতে কোন আক্ষেপ উপস্থিত হতে না পারে।

বুদ্ধের নির্দেশ লাভ করে আনন্দ তক্ষুণি চলে গেলেন নিকটবর্তী কুশীনগরে। সেখানে গিয়ে তিনি মল্লদের নিকট জানালেন বুদ্ধের আসন্ন পরিনির্বাণের কথা। আনন্দের মুখে বুদ্ধের আসন্ন পরিনির্বাণের কথা শুনে মল্লদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হল। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা তখন দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলেন শালবনে। এত লোকের সমাগমের ফলে বুদ্ধের যাতে কোন প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হতে না পারে, আনন্দ সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি নিজে সর্বক্ষণ বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত থেকে প্রতিটি মল্ল পরিবার সম্বন্ধে উল্লেখ করে, তাদের যথাযথ পরিচয় এবং আগমন বার্তা জ্ঞাপন করেন। আনন্দের নির্দেশ মত মল্লগণ সকলেই একে একে অবনত মস্তকে নীরবে বুদ্ধের চরণ বন্দনা করেন। মল্লগণকে আশীর্বাদ জানিয়ে বুদ্ধ পুনরায় মৌন হলেন। এদিকে তার পরিনির্বাণের সময়ও ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগলো। পরিণির্বানের সময় যখন প্রায় এসে উপস্থিত হয়েছে, ঠিক সে সময়ে উপস্থিত হলেন কুশীনগরবাসী পরিব্রাজক সুভদ্র। তিনি যখন শুনতে পেলেন, যে আজ রাত্রির শেষ প্রহরে বুদ্ধ ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে সমর্থ হন নি। তিনি ছিলেন তীর্থিক সম্প্রদায়ভুক্ত একজন পরিব্রাজক। তার মনে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত সংশয় তিনি কিছুতেই নিরসন করতে সমর্থ হচ্ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তার মনের সঞ্চিত সংশয় দূর করবার জন্যে বুদ্ধের শরণাপন্ন হবেন কিনা তা এতদিন ধরে স্থির করে উঠতে সমর্থ হন নি। কিন্তু যখন শুনলেন যে বুদ্ধ চির বিদায় গ্রহণ করে ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, সেই মুহূর্তে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন নি। এতদিন ধরে তিনি নিরন্তর যে সংশয়ের দোলার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা থেকে মুক্তিলাভ করার জন্যে একেবারে শেষ মুহূর্তে ছুটে চলে এলেন বুদ্ধের নিকটে। বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে সুভদ্র অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আনন্দ তাকে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিতে সম্মত হলেন না। তিনি সুভদ্রকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, তথাগত এখনই পরিনির্বাণ লাভ করবেন সুতরাং এ সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসুবিধার সৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত হবে না। আনন্দের এ কথার পরেও সুভদ্র বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আর একবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আনন্দ সেবারও তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আনন্দের সঙ্গে সুভদ্রের বাক্যালাপ বুদ্ধের কর্ণগোচর হয়েছিল। সে অবস্থায়ও তিনি আনন্দকে বললেন সুভদ্রকে তাঁর সম্মুখে এনে উপস্থিত করার জন্যে। সুভদ্র বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে প্রথমেই

কয়েকজন তীর্থিক সন্ন্যাসীর নাম উচ্চারণ করে জানতে চাইলেন, যে এই সব তীর্থিক সন্ন্যাসীগণ সর্বজ্ঞ এবং মুক্তপুরুষ কিনা এবং তাঁদের নির্দেশিত পথ ঠিক কিনা। সুভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ তাঁকে জানালেন যে, এ সকল প্রশ্ন জেনে কোন লাভ নেই। আমি তোমাকে ধর্ম কথা শোনাচ্ছি, তুমি তা মন দিয়ে শোন। এই বলে তিনি সুভদ্রকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম কথা শুনে সুভদ্র অত্যন্ত প্রীত হলেন। তার মন থেকে সকল প্রকার সংশয় দূর হয়ে গেল। তার অন্তর হল শুদ্ধ ও নির্মল। যে সত্যের সন্ধানে এতদিন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবার সেই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে তিনি তাঁর শরণ কামনা করলেন। সেই অন্তিম সময়ে বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর গয়ার পথে সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কলিঙ্গ দেশীয় বণিকদ্বয় তপস্সু ও ভল্লিক, আর তাঁর সর্বশেষ শিষ্য হলেন কুশীনগরবাসী পরিব্রাজক সুভদ্র। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অল্প দিনের মধ্যেই সুভদ্র অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

সুভদ্রকে দীক্ষা দানের পর রাত্রির শেষ প্রহরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে, শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, তোমাদের কারুর মনে যদি ধর্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার সন্দেহ অথবা সংশয় থেকে থাকে, তবে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের অন্তরস্থিত সেই সন্দেহ অথবা সংশয়ের নিরসন করে নাও। সময়মত তথাগতকে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ দূর করে নিতে পারিনি বলে তোমাদের কারুর মনে যেন কোনপ্রকার আক্ষেপ ভবিষ্যতে দেখা দিতে না পারে। বুদ্ধের বচন শুনে ভিক্ষুগণ সকলেই মস্তক অবনত করে নীরব রইলেন। একটু থেমে বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে পুনরায় সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেবারও ভিক্ষুগণ সকলেই অবনত মস্তকে নীরব রইলেন। তাঁদের সেই মৌনভাব লক্ষ্য করে এবার বুদ্ধ বললেন, যদি তোমরা আমাকে কোন কিছু সরাসরি জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ কর, তবে তোমাদের বন্ধুদের নিকট তা ব্যক্ত কর। বুদ্ধের এই উক্তির পরও ভিক্ষুগণ সকলেই নীরব রইলেন। তখন আনন্দ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বলে উঠলেন, এটা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার, যে ভিক্ষুগণের মধ্যে এমন একজনও নেই, যার মনে ধর্মের প্রতি অথবা সংঘের প্রতি কোনপ্রকার সন্দেহ অথবা সংশয় বর্তমান রয়েছে। এরপর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করে শেষবারের মত উচ্চারণ করলেন, "ব্যয়ধম্মা ভিকখবে সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"। অর্থাৎ ভিক্ষুগণ তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন কর। এটিই তাঁর অন্তিমবাণী। এই বাণী উচ্চারণ করার পর বুদ্ধের কণ্ঠস্বর আর শ্রুত হয় নি। অন্তিমবাণী উচ্চারণ করার পরেই তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ক্রমে ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তিনি সমাধি মগ্ন হলেন। এ সময়ে তাঁর শরীর স্পন্দন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আনন্দ বুদ্ধের সেই অবস্থা লক্ষ্য করে অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, তথাগত কি পরিনির্বাণ লাভ করেছেন ?

উত্তরে, অনিরুদ্ধ জানালেন না তিনি এখনও পরিনির্বাণ লাভ করেন নি। তিনি এখন একটির পর একটি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে চলেছেন। যখন তিনি ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হলেন, তখন তিনি মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির অবস্থা লক্ষ্য করে অর্হন্ অনিরুদ্ধ আবেগে উচ্চারণ করে গেয়ে উঠলেন—

নাহু অস্সাস পস্সাসো ঠিতচিত্তস্স তাদিনো
অনেজো শান্তিমারম্ভ যং কালমকরী মুনি
অসল্লীলেন চিত্তেন বেদনং অহমাবাসয়ী
পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোক্খো অহুচেতসো।

(চিরশান্তিময় নির্বাণ লক্ষ্য করে বীততৃষ্ণ মুনি কালগত হলেন।
সেই স্থিত চিত্ত অচঞ্চল প্রভুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে না।
তিনি অলীন চিত্তে সকল বেদনা সহ্য করলেন।
দীপ নির্বাণের মত চিত্তের বিমোক্ষ লাভ হল।)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারীকৃত অনুবাদ

এরপর আনন্দ কুশীনগরে গিয়ে মল্লদের জানালেন, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ সংবাদ। আনন্দের মুখে সেই সংবাদ শুনে শুধু মল্লগণই নন, তাঁদের সঙ্গে কুশীনগরের অধিকাংশ নরনারী এসে সমবেত হলেন বুদ্ধের শায়িত দেহের চতুষ্পার্শে। সমস্ত বনভূমি প্লাবিত করে গগনভেদী কান্নার রোল উত্থিত হল। ভক্তগণ তথাগতের মরদেহ স্কন্ধে বহন করে কুশীনগরের প্রধান প্রধান রাজপথ সমূহ পরিক্রমা করে পুনরায় নিয়ে এলেন শালবনের সেই স্থানটিতে। সেখানে তথাগতের মরদেহটিকে চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর স্থাপিত করে চারজন মল্লপ্রমুখ চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, চিতাগ্নি কিছুতেই প্রজ্বলিত হল না। পুনঃ পুনঃ অগ্নি সংযোগেও কোন ফলোদয় হল না দেখে তারা ভয়ানক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। চিতা কিছুতেই অগ্নি গ্রহণ করলো না। মল্লরাজগণের ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে ভিক্ষু অনিরুদ্ধ তাদের সকলকে তখন সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন, যে তথাগতের অপর প্রধান ভক্ত ও শিষ্য ভিক্ষু মহাকাশ্যপ তথাগতের দর্শন লাভের জন্যে সদলবলে পাবা থেকে কুশীনগরের পথে রওনা হয়েছেন। তিনি এখানে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চিতা অগ্নি গ্রহণ করবে না। ভিক্ষু অনিরুদ্ধের মুখে একথা শোনার পর তখন সকলে আশ্বস্ত হলেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সাত দিন পরে মহাকাশ্যপ সদলবলে কুশীনগরে এসে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের পথে এক তীর্থিক পরিব্রাজকের নিকট থেকে সমস্ত ঘটনাই তিনি অবগত হতে পেরেছিলেন। এই সাতদিন পর্যন্ত তথাগতের মরদেহ চিতাশয্যার উপর পূর্ণ জ্যোতিষ্কের দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল এবং প্রত্যহ অগণিত ভক্তগণ তার মরদেহটিকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা

বন্দনা করেছেন। মহাকাশ্যপ কুশীনগরে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদের সঙ্গে গিয়ে বুদ্ধের চিতা শয্যার নিকটে এলেন। তারপর ভিক্ষুগণসহ তিনবার চিতা-শয্যাটিকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর বুদ্ধের পদযুগলের উপর মস্তক ন্যস্ত করে খানিকক্ষণ পর্যন্ত সেইভাবে অবস্থান করলেন। এবার তাঁর কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চিতাগ্নি আপনা থেকেই প্রজ্বলিত হল। দাহ ক্রিয়ার অবসানের পর তাঁর পূত দেহাবশেষ একটি সুসজ্জিত মৃৎপাত্রে রক্ষিত হল। তারপর সেই মৃৎপাত্রটিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হল মল্লদের রাজকীয় ভবনে। সকলেই যাতে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত সেই আধারটিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃতার্থ হতে পারেন, সে জন্যে সেটিকে রাজদরবারে সুদৃশ্য বেদিকার উপরে স্থাপন করা হল। সেই বেদিকার উপর পূতাধারটিকে সেই ভাবে সাতদিন পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। এই সাতদিনের মধ্যে শুধু কুশীনগরই নয়, দূর দূরান্ত থেকেও অগণিত নরনারী এসে তথাগতের প্রতি তাদের অন্তরস্থিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মল্লরাজগণ আশা করেছিলেন, যেহেতু তথাগত তাদের রাজ্যে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন, এবং যেহেতু তার মরদেহের যথাযথ সৎকারও তাদের রাজ্যেই সুসম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু তাঁর পবিত্র দেহাবশেষ পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করার দায়িত্বভারও একমাত্র তাদেরই। তারা আরও আশা করেছিলেন, কুশীনগরে একটি সুন্দর স্তুপ নির্মাণ করে সেই স্তুপের গর্ভগৃহে পূতাধারটিকে স্থাপন করতে। কিন্তু মল্লরাজগণের সেই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হল না। তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে, তার পূত দেহাবশেষের উপর দাবী জানিয়ে, সর্বপ্রথম দূত প্রেরণ করলেন মগধরাজ অজাতশত্রু। তারপর দূত এলো কপিলাবস্তু থেকে। কপিলাবস্তুর দূত এসে দাবী জানালেন, যেহেতু তথাগত শাক্য বংশীয় ছিলেন, সেহেতু তাঁর পূত দেহাবশেষের উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তাদেরই রয়েছে। এভাবে শ্রাবস্তী, বৈশাখী, অল্লকপ্প, পাবা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকেও তথাগতের পূতাস্থির উপর দাবী নিয়ে দূতগণ একে একে এসে উপস্থিত হলেন। তথাগতের দেহা-বশেষের উপর চারদিক থেকে এত দাবী আসাতে মল্লরাজগণ বিশেষ ভাবে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মল্লরাজগণ তখন বিভিন্ন রাজ্যের দূতগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যে তথাগত তাঁদের রাজ্যে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন, সুতরাং তাঁর পূত দেহাবশেষের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র তাঁদেরই রয়েছে। মল্লরাজগণের এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণ ক্ষুণ্ন মনে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলে, মল্লরাজগণের দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও কুটনৈতিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দ্রোণ অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রমাদ গুণলেন। রাজদূতগণকে এভাবে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলে, তার ফল অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করবে এবং নিদারুণ অশান্তির সৃষ্টি হবে বুঝে, তিনি তখন সব দিক বজায় রাখার জন্যে এক উপায় উদ্ভাবন করে, মল্লরাজগণসমেত

উপস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণকে আহ্বান করে বলেন, যে ভগবান তথাগত ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তাঁর দেহাবশেষের উপর দাবী নিয়ে মন কষাকষি থেকে অশান্তি ঘটতে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আসুন আমরা সবাই মিলে ভগবান তথাগতের পূত দেহাবশেষ নিজেদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে নিই। বিচক্ষণ ও সুচতুর রাজমন্ত্রী দ্রোণের এ প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হলেন এবং তাঁর এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি জানালেন। নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত থেকে শুধু কুশীনগরের ক্ষুদ্র রাজ্যই নয়, বলতে গেলে তখনকার দিনে সমগ্র আর্যাবর্তই রক্ষা পেল। তা নইলে এ ব্যাপার নিয়ে হয়ত সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হতো।

তখন সকলে মিলে রাজমন্ত্রী দ্রোণকেই তথাগতের পূত দেহাবশেষ সমান অষ্টভাগে বণ্টন করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। রাজদূতগণের সকলের অনুরোধে তিনি তুম্ব নামে একটি পরিমাপক যন্ত্র সংগ্রহ করে, সেই যন্ত্রটির সাহায্যে পরম নৈপুণ্যের সাথে ভগবান তথাগতের পূত দেহাবশেষ সমান আট-ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। সুষ্ঠভাবে বণ্টন ব্যবস্থার সমাপ্তির পর সর্বশেষে এসে উপস্থিত হলেন পিপ্পলিবংশের মৌর্য রাজদূত। রাজমন্ত্রী দ্রোণ তখন পিপ্পলী রাজদূতকে সকল কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন, তথাগতের পূত দেহাবশেষ বণ্টনের কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, এখন সে সম্বন্ধে আর কিছু করার উপায় নেই। এখন রয়েছে শুধু তাঁর চিতাভস্ম। আপনি তথাগতের চিতাভস্মের কিছু অংশ অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারেন। পিপ্পলী রাজদূত অগত্যা তথাগতের পূত দেহাবশেষের পরিবর্তে তাঁর পূত চিতাভস্ম খানিকটা সংগ্রহ করে নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তথাগতের পূতাস্থি সংগ্রহ করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণ আনন্দিত মনে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তথাগতের পূত দেহাবশেষের উপর কপিলাবস্তুতে, অল্লকপুপে, কুশীনগরে, বৈশালীতে, রামগ্রামে, বেদপীঠে, রাজ-গৃহে এবং পাবায় নির্মিত হল আটটি স্তূপ। মৌর্যরাজগণও তথাগতের চিতাভস্মের উপর নির্মাণ করলেন একটি স্তূপ। ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রী দ্রোণ তথাগতের পূত দেহাবশেষ সমান ভাগে বিভক্ত করার জন্যে তুম্ব নামক যে পরিমাপক যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন, সেই পরিমাপক যন্ত্রটির উপরও নির্মিত হল একটি স্তূপ। এভাবে তথাগতের মহাপরিনির্বাণের অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছিল দশটি স্তূপ।

মহাকাশ্যপ ভিক্ষু সংঘ নিয়ে সদলবলে পাবা থেকে যখন কুশীনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথেই কুশীনগরের একজন তীর্থিক পরিব্রাজকের নিকট থেকে অবগত হতে পেরেছিলেন যে, তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। সেই নিদারুণ সংবাদ শুনে ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকলে। সুভদ্র নামে তাদের মধ্যেই একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু রোদনরত ভিক্ষুগণকে সান্ত্বনা দিতে

দিতে বলতে লাগলেন, তথাগত চলে গিয়েছেন, তাতে ত ভালই হয়েছে। এতে দুঃখ করার মত কী আছে ? তিনি জীবিত থাকাকালীন আমাদের মধ্যে একটির পর একটি কেবল বিধি-নিষেধই আরোপ করেছেন। যার ফলে স্বাধীনভাবে আমরা নিজেরা কোন কর্মে মনোনিবেশ করতে পারিনি। এখন তিনি গত হওয়াতে আমাদের উপর থেকে বিধি-নিষেধের বেড়াজালও অপসারিত হয়ে গেল। এখন আমরা নিজেরাই ইচ্ছামত কাজ কর্ম চালাতে পারবো। বর্ষীয়ান ভিক্ষু সুভদ্রের এই উক্তিগুলো সেদিন মহাকাশ্যপের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে বৃশ্চিক দংশনেরও অধিক জ্বালা দিয়েছিল। তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে এমন পাপমতি ভিক্ষু যদি সংঘে অবস্থান করে; তবে সংঘের পরিণাম অচিরেই অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এই পাপিষ্ঠের দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে; তবে অদূর ভবিষ্যতেই সংঘের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে, তাই ভেবে সেদিনই তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেদিন থেকেই তিনি এর একটা বিহিত খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টা করে চলেছিলেন। মহাকাশ্যপ নিজে ছিলেন একজন অর্হন্ এবং তিনিই ছিলেন সংঘের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। বুদ্ধের অবর্তমানে ভিক্ষুগণ তাঁকেই মান্য করে চলতেন এবং ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্যে সকলে এসে তার সম্মুখেই সমবেত হতেন। একদিন মহাকাশ্যপ সমবেত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে জানালেন, তথাগতের অবর্তমানে এখন আমাদের উচিত হবে সর্বপ্রথমে তথাগতের মুখনিঃসৃত বাণী সকল একত্রিত করে সঙ্কলন করা এবং বিনয় সম্বন্ধে তিনি যে সকল নির্দেশ রেখে গিয়েছেন, সে সকল নির্দেশও যথাযথ রূপে সঙ্কলিত করে রাখা। যাতে ভবিষ্যতে তথাগতের বাণীতে অথবা তাঁর নির্দেশনায় কোন প্রকার আবিলতা প্রবিষ্ট হতে না পারে। আমাদের এখন উচিৎ হবে অবিলম্বে একটি মহতী সভা আহ্বান করে, সেই সভার কার্য নির্বাহিকমণ্ডলীর দ্বারা সর্বসমক্ষে তথাগতের বাণী সকল একত্রিত করে সঙ্কলিত করে রাখা, যাতে বর্তমানের এবং অনাগত দিনের সকলেই অনায়াসে তথাগতের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে সুষ্ঠুভাবে পথে চলতে সমর্থ হতে পারেন। ভিক্ষু মহাকাশ্যপের এই প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সমর্থন জানালেন এবং এই মহানকার্যের দায়িত্বভার তাঁকেই গ্রহণ করবার জন্যে সকলেই অনুরোধ জানালেন। সেদিনকার সভায়ই স্থির করা হোল অচিরেই মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে একটি মহতীসভার আয়োজন করা হবে। সেই সভায় বুদ্ধের বাণীসকল একত্রিত করে সঙ্কলিত করা হবে এবং সঙ্কলনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সভার অধিবেশন বজায় রাখা হবে। এবার সদস্য সংখ্যা নির্বাচনের ভারও অর্পণ করা হল মহাকাশ্যপেরই উপর। অর্হৎ পর্যায়ের শুদ্ধ সত্ত্ব যুক্ত পাঁচশত সদস্য নিয়ে তিনি সভার কার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু গোল বাধলো ধর্মভাণ্ডারী আনন্দকে নিয়ে। তিনি

তখনও অর্হত্ব অর্জন করতে পারেননি। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে এই সভার অধিবেশন আহ্বান করার কথা ভাবাও যায়না। তাই আপাততঃ তিনি চারশত নিরানব্বুই জন সদস্যের এক তালিকা প্রস্তুত করলেন এবং আনন্দের নাম উহ্য রেখে দিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে পরিনির্বাণের পূর্বে জানিয়েছিলেন যে অচিরেই তিনি অর্হত্ব লাভ করবেন। সেই অনুসারেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল, কোথায় এই মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। কুশীনগরের মত ক্ষুদ্র নগরে পাঁচশত ভিক্ষুর অনির্দিষ্ট কাল ধরে অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে না। কেননা এতগুলো লোকের প্রতিদিনের আহারের উপযুক্ত ভিক্ষান্ন অনির্দিষ্টকালের জন্যে এই ক্ষুদ্র নগর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তখন সকলে মিলে রাজগৃহকেই এর জন্যে উপযুক্ত স্থান হতে পারে বলে নির্দেশ করলেন। কেননা রাজগৃহ হল মগধ-রাজ্যের রাজধানী। অজস্র ধনী লোকের বাস সেখানে। পাঁচশত ভিক্ষুর প্রতিদিনের আহারের জন্যে ভিক্ষান্ন সেখানে সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। তার উপরে রয়েছেন রাজা অজাতশত্রু। তিনি বুদ্ধের শিষ্যগণকে সাহায্য দান করবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছেন।

সেই সভায়ই স্থির করা হল, রাজগৃহের বৈভার পর্বতের উপরিভাগে সপ্তপর্ণী গুহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই মহা সম্মেলন আহ্বান করা হবে। স্থির হল, যে আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বর্ষাব্রতের এই তিন মাস কাল তারা সম্মেলনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সকলে মিলে তথাগতের ব্যবহৃত পবিত্র বস্তু সামগ্রী যথা—পাত্র, চিবর, পাদুকা প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কুশীনগর ত্যাগ করে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে ভিক্ষুগণ যেখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন, সেখানেই অগণিত শোকার্ত নরনারী তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তথাগতের জন্যে আকুল হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। অবশেষে তারা যখন শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রাবস্তীর অধিবাসগণের প্রায় সকলেই এসে ভীড় জমালেন জেতবনের আশ্রমে। বুদ্ধহীন সেই ভিক্ষুসংঘকে দেখে তারা সকলেই বুদ্ধের জন্যে কাতরভাবে বিলাপ করতে থাকেন। অবশেষে আনন্দ সকলকে শান্ত হবার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানালে তারা শান্ত হন। এরপর আনন্দ বুদ্ধের-ব্যবহার্য পূত বস্তু সকল সকলের সম্মুখে নিজে বহন করে জেতবনের আশ্রমের গন্ধকুঠীতে প্রবেশ করেন। বুদ্ধের আবাস গৃহে প্রবেশ করার পর দারুণ কান্নায় তিনি নিজেই ভেঙ্গে পড়েন। খানিক বাদে আত্মস্থ হবার পর তিনি বুদ্ধের সেই প্রিয় আবাস গৃহটিকে স্বহস্তে সম্মার্জনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তাঁর ব্যবহার্য বস্তু-সকল যথাযথভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। বুদ্ধের জীবিতকালে তিনি নিজহস্তে যেভাবে তাঁর সেবা যত্ন পরিচালনা করে-ছেন ; ঠিক সেভাবেই এখানেও সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করলেন।

কর্মকার চুন্দের গৃহে আহার গ্রহণের পর বুদ্ধের পীড়া দেখা দেবার পর থেকে তাঁর পরিনির্বাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আনন্দের নিজের বিশ্রাম বলতে কিছুই ছিল না। তার উপর ক্রমাগত অনিয়মের ফলে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং একজন ভিক্ষুর উপদেশমত ঔষধ সেবন করতে বাধ্য হন। ভিষক তাকে অন্ততঃ একদিনের জন্যে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের নির্দেশ দেন। জেতবনের আশ্রমে প্রবেশের দিনটিতেই তাকে এ নিয়ম পালন করতে হল। এদিকে শ্রাবস্তীর এক উপাসক সেদিনই আনন্দকে তার নিজ বাসভবনে উপস্থিত হয়ে, সেখানে তাকে কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের মীমাংসা করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে একজন লোককে প্রেরণ করেন। এই উপাসক সেই শুভ। যার পিতা মৃত্যুর পর কুকুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তার গৃহে প্রহরা দিত এবং যাকে কেন্দ্র করে শুভ একদিন বুদ্ধের উপর মহা বিরক্ত হয়ে শেষে তাঁর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবার জন্যে জেতবনের আশ্রমে ছুটে চলে গিয়েছিলেন, এবং সর্বশেষে কুকুরটির প্রকৃত পরিচয় নিজেই অবগত হতে পেরে বুদ্ধের পদযুগল আশ্রয় করে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। আনন্দ শুভ'র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বটে, তবে সেদিনই তিনি শুভ'র গৃহে উপস্থিত হতে পারেননি। কেননা ভিষকের নির্দেশমত সেই দিনটি তাকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। পরের দিন তিনি শুভ'র গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে আনন্দের সঙ্গে শুভ'র ধর্ম বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয় এবং আনন্দ শুভ'কে ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দান করে তাকে সন্তুষ্ট করেন। শুভ'র গৃহে আনন্দের ধর্ম সম্বন্ধে এই ভাষণটি 'শুভ সূত্র' নামে দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বুদ্ধশিষ্যগণের মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হবে জেনে মগধরাজ অজাতশত্রু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই তখন অগ্রণী হয়ে, তাঁর অমাত্যগণকে সপ্তপর্ণী গুহার প্রাঙ্গণটিকে যথোপযুক্তরূপে সুসজ্জিত করার জন্যে আদেশ দান করেন এবং একাজের সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করেন। রাজার আদেশে অমাত্যগণ একদল সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি দ্বারা সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণটিকে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করার কার্যে নিয়োগ করেন। সেই সকল সুদক্ষ রাজমিস্ত্রিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতার ফলে সভার স্থানটি যতদূর সম্ভব কর্মোপযোগী এবং সুসজ্জিত করে তোলা হল। সভামণ্ডপে পাঁচশত ভিক্ষুর বসবার মত উপযোগী করে আসন নির্মিত হল। প্রাঙ্গণখানির ঠিক মাঝখানে বুদ্ধাসনের অনুরূপ পূর্বমুখী করে নির্মিত হল ধর্মাসন। রাজগৃহে এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সে সময়ে সর্বসাকুল্যে ছিল আঠারোটি বৌদ্ধ সাংঘারাম। প্রত্যেকটি সংঘারামই ভিক্ষুগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

আনন্দ আরও কয়েকদিন জেতবনে অবস্থান করে জেতবন বিহারের সংস্কার কার্য প্রভৃতি সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি সদলবলে রাজগৃহের উদ্দেশে পথে

পা বাড়ালেন এবং বর্ষারম্ভের পূর্বেই রাজগৃহে এসে উপস্থিত হলেন। সম্মেলনের কর্ণধার স্থবির মহাকাশ্যপ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি সম্মেলনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবার আনন্দের উপস্থিতির ফলে সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা পরিপূর্ণ হোল। পূর্বেই স্থির করা হয়েছিল যে সম্মেলনের সদস্যগণই কেবল সম্মেলন চলাকালীন সময়ে রাজগৃহে অবস্থান করবেন। সেই ব্যবস্থানুসারে সম্মেলনের সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য ভিক্ষুগণ বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে রাজগৃহ ত্যাগ করে নিজ নিজ সুবিধামত বিভিন্ন স্থানে চলে গেলেন।

মহাপরিনির্বাণের পূর্বে শোকে মুহ্যমান আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে, শেষে বুদ্ধ তাকে জানিয়েছিলেন যে তথাগতের প্রতি তার জন্ম জন্ম কৃত অকৃত্রিম সেবা বিফলে যাবে না। অচিরেই সে অর্হত্ব লাভ করবে। সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে কেবল শুদ্ধ, সত্ত্ব, অর্হৎগণকে নিয়ে। কিন্তু আনন্দ তখনও অর্হত্ব লাভ করতে পারেন নি। এদিকে অধিবেশন আরম্ভ হবার, আর মাত্র একদিন বাকি। কিন্তু আনন্দ তখনও অর্হত্ব অর্জন করতে পারেন নি। সেই দিনই, অর্থাৎ সম্মেলন আরম্ভ হবার পূর্বদিনই গভীর নিশীথে তাঁর জীবনে এসে উপস্থিত হলো, তাঁর বহু আকাঙ্খিত, সেই মহেন্দ্রক্ষণটি। অধিবেষন আরম্ভ হবার পূর্বদিন আনন্দ গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকার পর, প্রায় রাত্রি শেষে যখন শয্যা গ্রহণ করতে যাবেন, এমন সময়ে তিনি অর্হত্ব লাভ করলেন। তার এই অর্হত্ব লাভের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল, যথা—শয়ন, উপবেশন, স্থিতি ও গমন এই চার প্রকার দৈহিক অবস্থানের বাইরে থেকে, তিনি অর্হত্ব লাভ করলেন।

সপ্তপর্ণী গুহার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার প্রাক্‌কালে, অন্যান্য সকল সদস্যগণ যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেন, আনন্দ তখনও এসে উপস্থিত হন নি। তার আসনখানি তখনও খালিই পড়েছিল। সকলেই তখন আনন্দের আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব চিত্তে অপেক্ষায় রয়েছেন, এমন সময়ে আনন্দ ঋদ্ধিবলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করলেন। এবার সদস্যগণ সকলেই আনন্দকে দেখতে পেয়ে, উৎফুল্ল হলেন।

এরপর সভায় কার্যারম্ভ ঘোষণা করে, মহাকাশ্যপ সদস্যগণকে সম্বোধন করে জানতে চাইলেন, ধর্ম অথবা বিনয়ের মধ্যে কোনটির সঙ্কলনের কাজ সর্বপ্রথমে গ্রহণ করা হবে। সমবেত সদস্যগণের সকলেই তখন একবাক্যে জানালেন, যেহেতু বিনয় হচ্ছে বুদ্ধ শাসনের প্রধান অঙ্গ, সেই হেতু বিনয় সংগ্রহেই সর্বপ্রথমে সঙ্কলনের কার্য আরম্ভ করা হোক। সদস্যগণের সকলের প্রস্তাব গ্রহণ করে মহা-কাশ্যপ সর্বপ্রথমে বিনয় সঙ্কলনের অনুমতি দান করেন। বুদ্ধ নিজে উপালিকে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধররূপে স্বীকৃতি জানিয়ে তাকে সম্মানিত করে গিয়েছিলেন। সেই অনুসারে বিনয় সঙ্কলনের সমুদয় কর্তৃত্বভার, উপালির উপর অর্পণ করার জন্যে

মহাকাশ্যপ সকলের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সভার অধিনায়কের এই প্রস্তাব সকলেই গ্রহণ করে তাদের অভিমত ব্যক্ত করলে, উপালি বিনয় সঙ্কলনের জন্যে নির্দিষ্ট স্থবির আসনখানি গ্রহণ করেন। এরপর মহাকাশ্যপ উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেন। উপালিও যথাযথভাবে, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করে সকলকে সন্তুষ্ট করতে থাকেন। এভাবে বিনয় সম্বন্ধে, সেই মহতী সভায় দিনের পর দিন ধরে প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। এভাবে প্রশ্ন এবং উত্তরদানের শেষে, বুদ্ধের মূল বক্তব্য এবং নির্দেশনার সঙ্গে, বিনয়ের সূত্র নিয়ে আলোচনা করে, বিনয় সঙ্কলনের কাজ সমাধা করা হোল। বিনয় সঙ্কলনের অবসানে, সদস্যগণ সকলে মিলে সমগ্র বিনয়খানিকে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন। এভাবে আবৃত্তির মাধ্যমে, শুদ্ধ সত্ত্ব অর্হৎ সদস্যগণ, সমগ্র বিনয় সংহিতাখানিকে তাদের স্মৃতির মণি-কোঠায় সযত্নে সংরক্ষিত করলেন।

এরপর আরম্ভ হোল, ধর্মসূত্র সঙ্কলনের কাজ। জেতবনের আশ্রমে বিংশ বর্ষা উদ্‌যাপন সময়ে, বুদ্ধ আনন্দকে সংঘের উপস্থায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে তিনি, ধর্মভাণ্ডারী আখ্যা লাভ করেছিলেন। সদস্যগণের সকলের অনুরোধে এবং অধিনায়ক মহাকাশ্যপের নির্দেশে, এবার আনন্দের উপর ধর্ম-সম্বন্ধে সঙ্কলনের কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হোল। আনন্দ স্থবির আসন গ্রহণ করে উপবেশন করার পর, অধিনায়ক মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্মসম্বন্ধে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেন। আনন্দও সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করে, সভাস্থ সকলকেই সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। এভাবে দিনের পর দিন, ধর্মসূত্র নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ধর্মসূত্রের আলোচনার শেষে, পূর্বে সঙ্কলিত বিনয় সংহিতার ন্যায় সদস্যগণ সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে সমগ্র ধর্মসূত্রখানিকে আবৃত্তি করলেন। এভাবে তারা বিনয় সংহিতার ন্যায়, সমগ্র ধর্মসূত্রখানিকেও তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত করলেন।

এভাবে স্থবির মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে, সেই ঐতিহাসিক মহাসঙ্গীতিতে পর্যায়ানুক্রমে সংগ্রথিত করা হোল, সমগ্র বুদ্ধ বচন সমূহ, সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম। রচিত হোল সুবিশাল বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে সময়োপযোগী ঘটনা সমূহের সঙ্গে পূর্বে সংঘটিত অনুরূপ ঘটনাবলী সমূহের তুলনামূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, বুদ্ধ যে সকল উপদেশ প্রদান করেছেন, সে সমস্ত কাহিনী সমূহকেও পর্যায়ানুক্রমে একত্রিত করা হোল। এভাবে রচিত হয়েছিল জাতক কাহিনী। সুবিশাল জাতক কাহিনীতে কিঞ্চি-দধিক পাঁচশত জাতক কাহিনী রয়েছে এবং সেই সকল কাহিনী অবলম্বনে, যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে, তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। এত সুবিশাল, এত প্রাচীন কথা ও কাহিনীর উৎপত্তি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অপর

কোথায়ও দেখা দেয়নি অথবা সঙ্কলিত হয়নি। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহের ন্যায়, এই জাতক কাহিনী সমূহও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সূত্ত পিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি শাখা।

সম্মেলনের সদস্যগণ প্রথমে স্থির করেছিলেন, যে বর্ষাবাসের মধ্যেই, অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যেই তারা সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হতে, আরও তিন মাসেরও কিছু বেশী সময় লেগেছিল। ছয় মাসেরও কিঞ্চিদধিককাল ধরে চলেছিল এই মহাসম্মেলন। বৌদ্ধ জগতের প্রথম মহাসঙ্গীতি। রাজা অজাতশত্রুর অকুণ্ঠ সহায়তার ফলে, সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সদস্যগণকে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। সম্মেলন যাতে নির্বিঘ্নে সমাধা হতে পারে, সেদিকেও রাজা অজাতশত্রু সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। সম্মেলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে মগধের দক্ষিণাগিরি পরিভ্রমণ শেষ করে স্থবির পুরাণ বিশাল ভিক্ষু সংঘ নিয়ে রাজগৃহে এসে উপস্থিত হলেন। তখন ত্রিপিটকের রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্থবিরগণের মুখে ত্রিপিটকের বাণী শ্রবণ করে, তিনি সদস্যগণের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তথাগতের বাণী সকল তথাগতের মুখেই যেন পুনরায় শুনতে পেলাম। প্রথম মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানের ফলেই শাক্যমুনি প্রবর্তিত মতবাদ এক বিশেষ ধর্মরূপে দেখা দিল এবং তখন থেকেই এই ধর্মমত দিকে দিকে প্রচার এবং প্রসারে, সমগ্র ভিক্ষু সমাজ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ও তৎপর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই ভিক্ষুগণ, দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। ভগবান তথাগতের অমৃতোপম শান্তির বাণী, শাশ্বত ভারত আত্মারই বাণী। ভগবান তথাগত নিজেও শাশ্বত ভারত আত্মারই মূর্ত প্রতীক। ভারতের শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ, তখনকার দিনের পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্রই এই শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবেই তাঁরা করেছিলেন, তথাগতের নির্দেশিত ধর্মচক্রের প্রবর্তন। এই শান্তির বাণীর পতাকা নিয়েই ভারতেরও জয়যাত্রা। তার পরিচয়, পঞ্চশীল প্রচারের মাধ্যমে।

বুদ্ধ প্রদর্শিত মত ও পথ

তথাগত যে সময়ে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময়ে ভারতের প্রাচীন সনাতন ধর্মে নানাপ্রকার আবিলতা প্রবেশ করেছিল। বেদ ও উপনিষদের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি সাধারণ লোকের দৃষ্টি অথবা আগ্রহ উভয়ই ক্রমশঃ স্তিমিত আকার ধারণ করছিল। পৌরাণিক কাহিনী সমূহের উৎপত্তির পর থেকে সাধারণ লোকের আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, যাগ যজ্ঞের প্রতি সবচেয়ে বেশী। যাগযজ্ঞের নামে পশুবধ এবং সেই সঙ্গে ষোড়শোপচারে পুজো পার্বণের

অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকেই, সাধারণের দৃষ্টি গিয়ে নিপতিত হয়েছিল। ধর্মের নামে, বহিরাঙ্গের আচার-অনুষ্ঠানই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাধারণ লোকের এই মন-বিবর্তনের মূলে ইন্ধন জুগিয়েছিল, প্রধানতঃ এই পৌরাণিক কাহিনী সমূহ। তখনকার দিনের ধর্মীয় আচরণ বলতে দাঁড়িয়েছিল যাগ যজ্ঞের নামে পশুবলী এবং দানধ্যানসহ বিরাট ভোজের আয়োজন ইত্যাদি। বেদ ও উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান নিয়ে আলোচনা, সে সময়ে মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে ব্যাধির চেয়ে আধি, কতটা প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই যথেষ্ঠ হবে। ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ছিলেন মগধ রাজ্যের একজন বিখ্যাত শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহেই ছিল তাঁর বাস। মগধ রাজ্যের বিভিন্ন অংশের এবং নিকটবর্তী কোশল রাজ্যের বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মগধ রাজের বহু বিশিষ্ট রাজকর্মচারীও তাঁর শিষ্য ছিলেন। স্বয়ং নৃপতি বিম্বিসার পর্যন্ত তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। বুদ্ধ যখন রাজগৃহে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে অবস্থিতি করছিলেন, সে সময়ে কূটদন্ত একটি বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞে উৎসর্গ করার জন্যে বহু বধ্যপশু সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর বাসস্থানের নিকটেই অবস্থান করছেন জেনে, সেই ব্রাহ্মণ একদিন জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া, যে বিধিসম্মত একটি পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতে হলে, কতগুলো পশু উৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ কূটদন্ত তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন শুনে, স্বয়ং বুদ্ধ সেদিন নিজে এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে, তাঁকে গন্ধকুঠীতে নিয়ে এলেন। সেখানে উভয়ে দুখানি আসনে উপবেশন করে, ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলাকালে, উপযুক্ত সময় বুঝে, কূটদন্ত একবার বুদ্ধকে তাঁর নিজের প্রশ্নখানি জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, যে যথাবিহিত শাস্ত্রসম্মত পূর্ণাঙ্গ একটি যজ্ঞ সম্পাদন করতে গেলে, কোন্ কোন্ বিষয় অবলম্বন করা অবশ্য প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে কতগুলো পশুবলির ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ কূটদন্তের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ সেদিন তাঁকে শুধু বলেছিলেন, প্রকৃত যজ্ঞ বলতে পশুবধ বোঝায় না। দানই হোল প্রকৃত যজ্ঞ এবং প্রকৃত যজ্ঞ বলতে ওই একমাত্র দানকেই বুঝায়। যিনি দানের সাহায্যে অপরের অভাব মোচন করার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পশুবধ দ্বারা, সে কাজ সম্পন্ন হয় না।

বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্মপথে পশু হত্যার কোন বিধান নেই। ধর্মের নামে কোন আড়ম্বর নেই। কোন যাগ যজ্ঞেরও ব্যবস্থা সেখানে নেই। তাঁর ধর্ম-মতের মূলকথা হোল, "সর্বজীবে দয়া" তাঁর আশীর্বাণী ছিল "সব্বে সত্তা সুখিত্তা হোন্তু"। জীবমাত্রেরই মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি। আষাঢ়ী

পূর্ণিমা তিথি থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত, এই তিন মাসকাল তিনি নিজে কোন একটি সুবিধামত স্থানে অবস্থিতি করে কাটিয়ে দিতেন। ওই সময়টায় তিনি বাহিরে বড় একটা কোথাও বেরুতেন না। তাঁর অনুগত ভিক্ষুগণকেও তিনি ওই তিন মাসকাল দেশে ধর্মপ্রচার করতে নিষেধ করে, নিজ নিজ সুবিধামত কোন একটি স্থানে অবস্থান করার জন্যে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন এরই নাম বর্ষাবাস। এই নির্দেশদানের মূলেও ছিল, ওই সর্বজীবে দয়া। যাতে পদদলিত হয়ে সামান্য কীট অথবা পতঙ্গটিরও কোনপ্রকার অনিষ্ট হবার মত সম্ভাবনা না থাকে। বর্ষার শেষে, শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কীট পতঙ্গাদি যখন বৃক্ষলতা প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন পুনরায় তিঁনি আরম্ভ করতেন পদযাত্রা। ভিক্ষু ও শ্রমনগণকেও তিনি সেই মর্মে নির্দেশ দান করে গিয়েছেন। পূর্ণিমা তিথির পর আরম্ভ হয় পদ যাত্রা। পদযাত্রার পূর্বে পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষু ও শ্রমনগণ একত্রে মিলিত হয়ে, ভগবান বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন, তারপর পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরই নাম 'প্রবারণা' উৎসব।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে, এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি জৈন ধর্ম স্থান লাভ করেছিল। জৈনগণও জীব হিংসার বিরোধী। সামান্য কীটপতঙ্গাদিরও যাতে কোনপ্রকার অনিষ্ট হতে না পারে, সেদিকে সর্বদাই তাদেরও পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি। আবার ব্রাহ্মণ্য মতে যাগ-যজ্ঞাদির প্রচলন থাকলেও, হিংসায় বিরোধী লোকের অভাব কোনদিনই ছিল না। স্বয়ং বুদ্ধ জননী মহামায়া ছিলেন হিংসার বিরোধী। সামান্য পিপীলিকাটির প্রতিও তিনি মায়া মমতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু তিনি জৈন মতাবলম্বী ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর পিতৃকুলের সকলেই ব্রাহ্মণ্য মতই পোষণ করতেন। ব্রাহ্মণ্য মতে চারিদিকে যাগযজ্ঞাদির সঙ্গে পশু হত্যা যেমন অবাধে চলেছিল, অপরদিকে আবার তেমনি হিংসায় বিরোধীগণ এবং জৈন সম্প্রদায়ও তাদের মতবাদ বেশ ভালভাবেই প্রচার করে চলেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য মতের পাশাপাশি জৈন মতের সমর্থক, সে যুগে বড় কম ছিল না। বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে জৈন মতের সমর্থকগণই প্রথমে বৌদ্ধ মতে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধের দুই অগ্রশ্রাবক সারিপুত্ত এবং মোগ্যল্ল্যায়নও প্রথমে জৈন তীর্থঙ্করগণেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নরপতি রাজগৃহের মগধরাজ বিম্বিসারও, প্রথমে তীর্থঙ্করগণেরই শিষ্য ছিলেন। পরে বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শাক্য রাজবংশও ছিল পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য মতের সমর্থক। শাক্য রাজপুরী কপিল প্রাসাদে, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। সে সকল দেবদেবীর পূজো অর্চনা প্রভৃতি বেশ আড়ম্বের সঙ্গেই নিয়মিত প্রতিপালিত হোত। রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যও যথেষ্টই ছিল। স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদন তাদের যথেষ্ট সমীহ এবং সম্মান প্রদর্শন করে চলতেন। জন্মাবধি বুদ্ধ সেই পরিবেশের

মধ্যেই উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পুত্রের জন্মদিনে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে, গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হন। তাঁর সন্ন্যাস জীবনও সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই একনিষ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।

আজন্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই তিনি লালিত ও পালিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গুরু অড়ার কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর, তাঁকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নির্দেশিত মার্গ অবলম্বন করে চলতে হয়েছিল। গুরু অড়ার কালামের নির্দেশিত পথে চালিত হয়ে, অল্পদিনের মধ্যেই সর্বশাস্ত্র বিশেষভাবে আয়ত্ব করে যখন তিনি সফলকাম হতে পারলেন না, অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের স্তরে গিয়ে উপনীত হতে সমর্থ হলেন না এবং তাঁর গুরুও যখন তাঁকে অধিক দূর অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারলেন না, একমাত্র তখনই তিনি তার গুরুকে প্রণাম জানিয়ে, তার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে, পুনরায় উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণে উদ্যোগী হলেন। তার দ্বিতীয় গুরু রামপুত্র উদ্রক। তিনিও, তাঁকে ব্রাহ্মণ্যপ্রথা মতে প্রদর্শিত পথেই কৃচ্ছ্রসাধন মার্গ অবলম্বনে অগ্রসর হতে নির্দেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ধরে কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত পালন করে চলার পরেও, যখন তিনি অনুভব করতে লাগলেন, যে তার সিদ্ধিলাভ নিকটতর হচ্ছে না, তখন তিনি অভিষ্ট লাভের উপায় খুঁজে বের করার জন্যে, পুনরায় গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তৃতীয়-বার তাঁকে আর গুরুর সন্ধান করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। এবার সিদ্ধি-লাভের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। সেই পথ 'মধ্যম-পন্থা'। বীণার তন্ত্রীকে শ্লথগতিতে বেঁধে নিলে, তা থেকে যেমন উপযুক্ত সুর-লহরী নির্গত হয় না, তেমনি তন্ত্রীকে আবার সজোরে কঠিনভাবে বেঁধে নিলেও, তা থেকেও সুরলহরী নির্গত হয় না। যখন মন্থর এবং সুকঠিন এই উভয়বিধ পথ পরিহার করে, কেবল মধ্যপথে তন্ত্রী বাঁধা হয়, তখনই কেবল তা থেকে আনন্দময় অপূর্ব সুরলহরী নির্গত হতে থাকে। বীণার তন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি দেখতে পেলেন, যে মানব দেহ যন্ত্রটিও, অবিকল ওই বীণা যন্ত্রটির মত। শ্লথগতিতে বাঁধা বীণার তন্ত্রীর মত মানব যদি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে, তবে তার পক্ষে অভিষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা কখনও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবেনা। আবার কঠিনভাবে বদ্ধ বীণার তন্ত্রীর ন্যায়, কেবল কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ধরে অগ্রসর হতে গেলেও, অভীষ্ট ফল লাভ হয়ে পড়ে সুদূর পরাহত। কেন না কৃচ্ছ্রসাধনে, দেহ ও মন উভয়ই পীড়িত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহ ও মন যদি অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং সুস্থ না থাকে, তবে তার দ্বারা অভিষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধন অথবা বিলাসবহুল জীবনধারা এই উভয়বিধ পথ বর্জন করে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। তখন তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন, মধ্যমপন্থাই সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সে পথ সকলের জন্যে সমভাবেই উন্মুক্ত। সে পথ বিধি-নিষেধের প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ নয়। সে পথে নেই কোন বাক্‌বিতণ্ডা। নেই কোন আড়ম্বর।

সর্বোপরি সে পথে চলতে, কোন গুরুর নির্দেশ মেনেও চলবার প্রয়োজন নেই।

সম্বোধি লাভের পর, বুদ্ধ ইসিপতনে তার পূর্বতন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের নিকট সর্বপ্রথমে বিলাসময় জীবনযাত্রা অথবা কৃচ্ছ্রসাধন, এই উভয়বিধ ব্রত পরিত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবার জন্যে উপদেশ দিতে গিয়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "দ্বে মে ভিক্খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা" ("হে ভিক্ষুগণ! ভোগ বিলাস অথবা কঠোর তপশ্চরণ এই উভয়বিধ পথ বর্জন করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই সাধন পথের পথিক জনের পক্ষে সর্বোত্তম অবলম্বন")। তারপর মধ্যমপন্থা অবলম্বনে সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, তিনি তাদের নিকট ব্যক্ত করলেন চারি আর্যসত্য। যথা—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ রোধ এবং দুঃখ রোধের পন্থা। এই চারি আর্য সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে, প্রথমেই তিনি বলেন, এ জগৎ দুঃখময়। জরা, ব্যাধি ও শেষে মৃত্যু, জন্মের পর থেকে প্রতিটি জীবের জন্য সারিবদ্ধভাবে পর পর অপেক্ষা করে রয়েছে। জীবের পক্ষে এর হাত থেকে রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই। তার উপরেও রয়েছে আবার আনুষঙ্গিক নানা প্রকারের দুঃখরাশি। যথা—প্রিয়জন বিরহ, পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি, মানসিক নৈরাশ্য, স্বজন বিরোধ ইত্যাদি। সংসারে বাস করে শত প্রকারের দুঃখ জ্বালা অহরহ সহ্য করতে হচ্ছে প্রতিটি মানবকে। সেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এবং সেই দুঃখকে জয় করবার জন্য, মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্যে এবং তার পরিবর্তে, সুখের অন্বেষণ করতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে, নিতান্ত অসহায়ের মতই অহরহ সেই দুঃখের দ্বারেই গিয়ে উপনীত হচ্ছে এবং পুনঃপুনঃ দুঃখের নিকটই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে সুখের সন্ধান করতে গিয়ে, সে দুঃখকেই বার বার বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। দুঃখের মূল সমূলে উৎসারিত না হওয়া পর্যন্ত, দুখের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার ত কোন উপায় নেই। তৃষ্ণা (তনহা) বা আসক্তিই হোল, সকল দুঃখের উৎস অথবা মূল। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহের প্রতি, মানব মনের আসক্তিই হোল তৃষ্ণা। অবিদ্যা গ্রসিত মানব তৃষ্ণার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মাকড়সার জালে পতিত কীট পতঙ্গাদি যেমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই রকম মানব মনও তৃষ্ণার জালে পতিত হয়ে, ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মানব মন তৃষ্ণার জালে যতই আবদ্ধ হতে থাকে, ততই সে অধিকতর লালসাগ্রস্থ হতে থাকে। তখন সে কুৎসিত চিন্তায় একান্তভাবে মগ্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ সে ইন্দ্রিয়ের দাস হতে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহের প্রতি, তার আসক্তিও তখন দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। এভাবে আসক্তির জালে দৃঢ়-ভাবে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে, তার জন্মান্তর ভ্রমণও ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে সে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করতে থাকে এবং অশেষ দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করার পর আবার মৃত্যু কবলিত হতে থাকে। তৃষ্ণা সঞ্জাত

দুঃখ রাশি সর্বদাই তাকে ছায়ার ন্যায় বেষ্টন করে রাখে। সুতরাং এজগতে তৃষ্ণাই হোল, সকল দুঃখের মূল কারণ। ধর্মের নামে কেবলমাত্র কতকগুলো বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা, এই তৃষ্ণাকে দমন করা মোটেই সম্ভব নয়। এই তৃষ্ণা বা আসক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানব মন থেকে সমূলে উৎসারিত করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মানব মনকে অশ্বত্থ বৃক্ষের শেকড়ের ন্যায় অত্যন্ত কঠিনভাবে আকর্ষণ করে রাখে এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়ই সামান্যতম অংশ থেকে পুনরায় মহীরুহে পরিণত হয়। সুতরাং সর্বদুঃখের আকর, তৃষ্ণাকে সবপ্রথমে মানব মন থেকে সমূলে উৎসারিত করে ফেলতেই হবে। তৃষ্ণাকে একবার মন থেকে অপসারিত করে ফেলতে পারলে, তবেই মানব জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করতে সমর্থ হবে এবং তখনই হবে তার সকল দুঃখের এবং সর্বপ্রকার জ্বালার অবসান। সেই অবস্থার নামই 'নির্বাণ'। নির্বাণ কথার অর্থ তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি এবং তৃষ্ণার পরিসমাপ্তির পরই পুণঃর্জন্ম থেকে অব্যহতি লাভ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানব মনে তৃষ্ণা সঞ্জাত আসক্তির লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখ রোধ করার, অর্থাৎ পুণঃর্জন্ম রোধ করার কোন উপায় নেই। পুণঃর্জন্ম অর্থাৎ দঃখকে চিরতরে রোধ করতে হলে, যে পথ অবলম্বন করে চলতে হবে, সেই পথ আটটি উপায়ের দ্বারা গঠিত এবং এরই নাম 'মধ্যমপন্থা' অথবা 'মধ্যপথ'। সেই আটটি উপায় হোল যথাক্রমে ঃ—

১. সম্যকদৃষ্টি=প্রকৃত দৃষ্টি। (Right view)। লোকে ভুল ধারণার
(সম্মা দিঠ্ঠি) বশবর্তি হয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে অবাস্তবের পিছনে অবিরাম ছুটে বেড়ায়। এইভাবে জীবনের দিনগুলোকে সে বৃথাই ক্ষয় করে। এই বিভ্রান্ত পূর্ণ দৃষ্টি পরিত্যাগ করে শুদ্ধ স্বত্ব দৃষ্টিলাভ করার নাম সম্যক দৃষ্টি।

২. সম্যক সঙ্কল্প=সৎচিন্তা। (Right thought)। মন থেকে ভোগ
(সম্মা সঙ্কপ্পো) লালসা, অথবা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি চিরতরে বিসর্জন দিয়ে, মনকে শুদ্ধ করে কেবল মাত্র মুক্তির চিন্তায় নিয়োজিত করাই হোল সম্যক সঙ্কল্প।

৩. সম্যক বাক্য=সৎবাক্য। (Right Speech)। অপরের মনে
(সম্মা বাচা) আঘাত লাগতে পারে এমন রূঢ় বাক্য এবং অহেতুক বাক্য পরিত্যাগ করে মধুর এবং অর্থপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করাই হোল সম্যক বাক্য।

৪. সম্যক কর্ম=সৎকর্ম। (Right Action) অপরের অনিষ্ঠ হতে
(সম্মা কম্মন্তো) পারে এমন কর্ম এবং জীব হত্যা থেকে বিরত থেকে মঙ্গলজনক কর্মে রত হবার নাম সম্যক কর্ম।

৫. সম্যক জীবিকা=সৎভাবে জীবন যাপন। (Right Living)।
(সম্মা আজীবো) অসৎ পথ এবং পাপবৃত্তি সকল ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে সুনির্মল জীবন যাপন করার নাম সম্যক জীবিকা।

৬. সম্যক বীর্য=সুশোভন প্রচেষ্টা। (Right Exertion)। মন থেকে
(সম্মা ব্যায়ামো) আবিলতা পূর্ণ অশোভন ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়ে মনে সুশোভন ভাবের উৎপত্তির জন্যে সর্বতোভাবে উদ্যম এবং প্রচেষ্টার নামান্তর সম্যক বীর্য।

৭. সম্যক স্মৃতি=মনকে সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখা। (Right
(সম্মা সতি) Recollection) আত্ম বিস্মৃত না হয়ে, সর্বদা সতর্ক থেকে মনকে সদা সৎপথে পরিচালিত করার নাম সম্যক স্মৃতি।

৮. সম্যক সমাধি=মনের সুসমাহিত ভাব। (Right Meditation)।
(সম্মা সমাধি) ধ্যানমগ্ন থেকে, ধ্যানাদিস্তর ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করার নাম সম্যক সমাধি। এইটিই শেষ স্তর। এখানে এসে উপনীত হতে পারলে তবেই চিত্তের বিমুক্তি। জীবনের লক্ষ্যে পৌছুতে পারা সম্ভব।

বুদ্ধের উপদেশের কোথাও ঈশ্বর অথবা ভগবানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর অথবা ভগবান সম্বন্ধে, কোন কথাই তিনি উচ্চারণ করেন নি। অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ অর্থে তিনি 'নির্বাণ' শব্দটিরই কেবল বার বার উল্লেখ করেছেন। তৃষ্ণার দহন জ্বালা নির্বাপিত করে, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের কবল থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করার অর্থই নির্বাণ। অর্থাৎ যেখানে সকল তৃষ্ণার অবসান। অবিদ্যার মোহজাল এবং বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার অর্থেই তিঁনি নির্বাণ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। সেই নির্বাণ লাভের পথ হিসেবেই তিঁনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেছেন এবং আত্মার অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন নি। সেই কারণে অনেকে তার মতবাদকে, নাস্তিক মতবাদ বলে প্রচার করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। বুদ্ধের মতবাদের সার কথা হোল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করে অগ্রসর হও এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করতে চেষ্টা কর। সে ই-ত মোক্ষ। এরপর ঈশ্বর অথবা ভগবানের দোহাই দিয়ে বৃথা বাগ্-বিতণ্ডার প্রয়োজন কি? এ ব্যাপারে উপনিষদের সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশের এবং মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য নেই। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্বে, উপনিষদ প্রচার করেছিল মায়াময় দৃশ্যবস্তু সকল, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য এবং মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং নিত্য। জাগতিক মোহের কারণ অবিদ্যা। এই অবিদ্যার করাল গ্রাস থেকে জীবাত্মা নিজেকে মুক্ত করতে পারলে, তবেই সে

পরমাত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করে, তার সঙ্গে লীন হতে পারে। অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার নামই, মোক্ষ লাভ। বুদ্ধ একেই বলেছেন নির্বাণ। বুদ্ধ বলেছেন "সর্বম অনিত্যম্, সর্বম অনাত্মম্, নির্বাণম্ শান্তম্।" বুদ্ধ প্রচার করেছেন দু'টি বস্তুই কেবল শাশ্বত। একটি হোল অনন্ত এই মহাকাশ, আর অপরটি হোল নির্বাণ। উপনিষদও প্রচার করেছেন, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য আর সমস্ত কিছুই মায়াময় অর্থাৎ অনিত্য। সুতরাং বুদ্ধ উপনিষদ বহির্ভূত নূতন কিছু প্রচার করেন নি। জাগতিক বস্তু সমূহ থেকে দুঃখের উৎপত্তি এবং সেই দুঃখ নিরসনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাও, বুদ্ধ পূর্ব যুগেই আরম্ভ হয়েছিল। দুঃখের কারণ নির্নয়ে বুদ্ধ যে চারিটি আর্য সত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, তা সাংখ্য এবং যোগদর্শনে ইতি পূর্বেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ ব্যপারেও বুদ্ধ নতুন কিছু তথ্য প্রচার করেন নি। তিনি আর্য ঋষিগণের কথাই পুনঃ প্রচার করেছেন মাত্র। সেদিক থেকে বুদ্ধকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ঋষিগণেরই একজন বলে, অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভারতের প্রাচীন আর্যধর্মের গ্লানী দূর করবার জন্য। ভারতের সুপ্রাচীন আর্য ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে। ভারতীয় আর্যধর্মকে নষ্ট করবার জন্যে নয়। ভারতের আর্যধর্মে, সে জন্যেই তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে কল্পনা করে গ্রহণ করা হয়েছে।

উপনিষদ সমূহে আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা রয়েছে। বুদ্ধ আত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব ব্যবহারিক অর্থে স্বীকার করেন নি। পরমাত্মার পরিবর্তে তিনি ধর্মকায়ের উল্লেখ করেছেন। ধর্মকায় এবং পরমাত্মার মধ্যে, মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। বেদান্তবাদীগণের ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা বৌদ্ধগণের ধর্মকায়রূপে উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের তাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের উৎপত্তির স্থান এই ধর্মকায়। ধর্মকায় থেকে বোধিচিত্তেরও উদ্ভব হয়ে থাকে। এই বোধি-চিত্তও অবিনশ্বর। এই বোধিচিত্তই সংসারের আবর্তে পড়ে তৃষ্ণার জালে বিশেষ-ভাবে জড়িত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের ভাগী হয়। আবার অবিদ্যার মোহজাল ভেদ করে, তৃষ্ণার কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলে, সে পুনরায় ধর্মকায়ে লীন হয়। প্রত্যক্ষভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা না হলেও, এই বোধিচিত্ত আত্মারই সামানার্থবোধক।

বুদ্ধের মতবাদ সাধারণতঃ কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যেমন কর্ম করবে, সে তেমন ফললাভ করবে। মানুষের প্রতিটি কার্যক্রম, তার ভবিষ্যৎকে অবিরাম নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মের ফলভাগী হতে হবে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। নিজেরই কর্ম বিপাকে পড়ে মানব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে চলেছে এবং পুনঃপুনঃ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলিত হয়ে শেষে শ্মশানে নীত হচ্ছে। আবার কর্মদ্বারাই মানব অবিদ্যার মোহ জাল ছিন্ন করে, তন্হার (তৃষ্ণার) নিবৃত্তি ঘটিয়ে ধর্মকায়ে পুনরায় লীন

হচ্ছে। বেদান্তবাদীগণ যাকে বলেছেন মোক্ষ, বৌদ্ধমতে তাই নির্বাণ। নির্বাণ কথার অর্থে সর্বপ্রকার কামনা ও বাসনার নিবৃত্তির সঙ্গে, অহংভাবেরও বিলোপ সাধন। জগতের দৃশ্যবস্তু সমূহ অনিত্য, এই জ্ঞান লাভের পর, সে সকলের প্রতি লোভ, মোহ এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বিদূরিত করার নামই তন্হার বিলোপ সাধন। তন্হার নিবৃত্তির সঙ্গে নির্বাণ লাভের পর অন্তর থেকে অহংভাবটিও বিদূরিত হয়। অহংভাব বিদূরিত হবার পর মন থেকে দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি তখন উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, যে সকল জীবেরই উৎপত্তি-স্থল, সেই একই স্থান—ধর্মকায়। সুতরাং তখন তার মন থেকে আত্মপর ভেদ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে যায়। তখন সর্বজীবের প্রতিই তার অন্তর করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নির্বাণের সঙ্গে, করুণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মকায়কেই আবার "শূন্যতা" আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। ধর্মকায় অথবা শূন্যতাও এই করুণারই লীলাক্ষেত্র। দুঃখের অবসানের পর নির্বাণ লাভ হয় বলে নির্বাণ করুণাময় এবং আনন্দময়। সুতরাং ব্রহ্মবাদীগণের সৎ, চিৎ আনন্দের ন্যায়, ধর্মকায় অথবা শূন্যতাও করুনা ও আনন্দময়। সুতরাং বেদান্তবাদীগণের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধগণের ধর্মকায় অভিন্ন। এখানেও প্রাচীন আর্যঋষিগণের প্রচারিত মতবাদের সঙ্গে বুদ্ধ প্রবর্তিত মতবাদের কোন অমিল অথবা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা করে যে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বৈদিক যুগের বানপ্রস্থেরই সমতুল। শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের পক্ষে অবশ্য পালনীয় যে সকথ বিনয়ের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, তার সঙ্গে বৈদিক যুগের সন্ন্যাসাশ্রমের ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে প্রভেদ কোথায়? বৈদিক যুগে একমাত্র কিশোর অথবা তরুণদের সাধারণতঃ সন্ন্যাসাশ্রমে গ্রহণ করার নিয়ম ছিল না। গার্হস্থ্য আশ্রমের শেষে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় উপনীত হবার পরই কেবল সাধারণভাবে সন্ন্যাসাশ্রম অথবা বানপ্রস্থ অবলম্বন করার রীতি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধগণ কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রেই কিছুটা পার্থক্য টেনে এনেছেন। বৌদ্ধমতে কিশোর এবং তরুণদেরও ভিক্ষুব্রত গ্রহণে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। তবে তরুণদের পক্ষে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে হলে, তাদের পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন হোত। সে নিয়ম আজও মেনে চলা হয়ে থাকে। বুদ্ধ তার নিজের পুত্র রাহুলকে পাঁচ বৎসর বয়সেই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়ে ছিলেন।

বুদ্ধ বেদান্তবাদীগণের ন্যায় আত্মা এবং পরমাত্মা স্বীকার করেন নি। তার বদলে তিনি উল্লেখ করেছেন, বোধিচিত্ত এবং ধর্মকায়। বোধিচিত্ত এবং ধর্মকায় যে আত্মা ও পরমাত্মারই নামান্তর মাত্র, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বর এবং ভগবান সম্বন্ধেও বুদ্ধ কোন উল্লেখ করেন নি। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের কোথাও ঈশ্বর অথবা ভগবানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে না। একমাত্র

সেই একটি কারণেই, তার প্রবর্তিত মতবাদকে অনেকে নাস্তিকবাদ বলে আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং তার প্রচারিত মতবাদ যাতে সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মের অঙ্গীভূত হতে না পারে, সেজন্যে তারাই সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কপিলের সাংখ্য বেদান্তেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। কিন্তু তাই বলে, সাংখ্যকারগণকে সনাতন ধর্মের গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কখনও করা হয় নি। সুতরাং সাংখ্যকারগণকে যদি প্রাচীন সনাতন ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় দান করা হয়, অর্থাৎ তাদের সনাতন হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায় বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অবলম্বনকারীদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা দেবে কেন? তথাগত কখনও প্রাচীন আর্যধর্মের প্রতি কোন প্রকার বক্রোক্তি করেন নি, অথবা এমন কোন আচরণ করেন নি, যার ফলে তাঁর প্রবর্তিত মতবাদকে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদ বলা যেতে পারে। একমাত্র খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে, তিনি কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে যান নি। সে-ও-ত কেবল ভিক্ষুগণের বেলায়। গৃহীগণের ক্ষেত্রে, তিনি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করেন নি। ধর্মের ক্ষেত্রে যা অনাবশ্যক এবং বহিরাঙ্গ মাত্র, তিনি কেবল সে সমস্ত বর্জন করে চলবার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রমেরই কতকটা গৃহী সংস্করণ। আড়ম্বরহীন সোজা সরল পথ। সে পথে অগ্রসর হতে কারুর পক্ষেই কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে না। তিনি যে সময়ে ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময়ে ভারতের প্রাচীন সনাতন আর্যধর্মে গ্লানি প্রবিষ্ট হয়েছিল। ধর্মতত্ত্বের চেয়ে, উপাচার তত্ত্বের আধিক্য দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশী। যাগ-যজ্ঞের আড়ম্বরের মাঝখানে ধর্মতত্ত্ব প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ব্যাধির চেয়ে ঔষধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তির সমর্থনেই যেন, সেই ধর্মের গ্লানির যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, শাক্য-মুনিরূপে স্বয়ং ভগবান তথাগত। গ্লানি দূর করে প্রকৃত ধর্মকেই তিনি পুনরায় সংস্থাপন করে গিয়েছেন। সাধুজনের পরিত্রাণই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। সে জন্যেই স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার রূপে তিনি স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছেন, অথচ তাঁর মতবাদকে সনাতন আর্যধর্মের বহির্ভূত মতবাদ বলে দূরে ঠেলে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করা হয় নি। এটাই আশ্চর্য!

বুদ্ধ নিজেও কখনও মনে করতেন না, যে তিনি নূতন কোন ধর্মমত প্রচার করছেন। প্রাচীন আর্যধর্মের মধ্যে যে সমস্ত গ্লানি প্রবেশ করেছিল, সেগুলোকে দূর করে দিয়ে প্রাচীন সনাতনধর্মকে সুনির্মল করে তোলাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয় বলেছেন: The Buddha did not feel that he was announcing a new religion. He was born, grew up and died a

Hindu. He was restating with a new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilisation.

শাক্যমুনির প্রবর্তিত যে মতবাদ একদিন আসমুদ্র হিমাচলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সেই মহান এবং উদার মতবাদ আমাদের নিতান্ত অজ্ঞতার ফলে, কালক্রমে তার উৎসস্থল ভারতভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একমাত্র সুদূর চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলেই সে কোনক্রমে তার অস্তিত্বটুকু এখনও বজায় রাখতে পেরেছে। সত্যি! কি বিচিত্র এই দেশ।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমতকে আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সনাতন আর্য ধর্ম থেকে তাকে বাদ দিয়ে বলেছি। বস্তুতঃ, বুদ্ধের প্রচারিত মতবাদ সনাতন আর্যধর্মেরই একটি শাখা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধমতকেও হিন্দুধর্মের একটি শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল আছে, ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সার্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে; শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্বাণ ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্মের যাহা বহিরাঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্মশুদ্ধি নাই; যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্যে, বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ববাদীসম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্য গণকে হিন্দু বলিব।" বলা বাহুল্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান কালে ভারতবাসীর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গিয়েছে। এখন বৌদ্ধ-মতবাদকে আমরা সনাতন ধর্মবহির্ভূত মতবাদ বলে মনে করতে পারিনে। বর্তমানকালে প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু ভারতবাসীর অন্তরে বুদ্ধের ভাবধারা নতুন করে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছে। এ সম্বন্ধে বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। তাঁর প্রণীত "মহাশান্তি মহাপ্রেম" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ "ভগবান বুদ্ধ ভারতবাসীর কাছে এখন আর নাস্তিক নন। তাঁর সম্বন্ধে সংশয়ের ঘনমেঘ কেটে গিয়েছে।" ভারতের শাস্ত্রে, পুরাণে, ধর্মে, দর্শনে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, যিনি গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন, বিস্মৃতির অতলতলে তাঁর সমাধি কি কখনো সম্ভব? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁকে ও তাঁর ধর্ম-

মতকে নতুন করে জানার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে জেগে উঠছে। সার্ধ-দ্বিসহস্রতম বুদ্ধ জয়ন্তীর পর থেকে তা বিপুলাকার ধারণ করেছে।

প্রাচীন সনাতন আর্যধর্ম, যা পরবর্তীকালে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম নাম গ্রহণ করেছে, সেই হিন্দুধর্ম বলতে আমরা বেদ প্রবর্তিত ধর্মকেই বুঝে থাকি। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান (বিদ+অ)। যা চিরন্তন, যা শাশ্বত, সে বিষয়ের অবগতির জন্যেই বেদ। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নয় বলে বেদ অপৌরুষের। বৈদিক ঋষিগণ নিজেরা বেদ রচনা করেন নি। তারা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বিবেকানন্দ বলেছেন "বেদ নামধেয়, অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাহার নাম ঋষি ও সেই শক্তি দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম বেদ।" তাহলে গৌতম বুদ্ধকে প্রাচীন ভারতেরই একজন ঋষি বলতে বাধা কোথায়? তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করে, তা সর্বজন সমক্ষে প্রচার করে গিয়েছেন, তাকেই বা কেন বেদ বিরোধী বলা হবে? ধর্মের যা বহিরাঙ্গ মাত্র বুদ্ধ কেবল সে সকল আচরণেরই বিরোধী ছিলেন। সে দিক থেকে তাঁর প্রচারিত মতবাদকে কতকটা Christianityর Protestant মতবাদের সঙ্গে তুলনাকরা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মমতকে হিন্দুধর্মের বহির্ভূত একটি ধর্ম, একথা কখনই বলা চলতে পারে না। যদি বুদ্ধ প্রবর্তিত মতবাদকে হিন্দুধর্মের বহির্ভূত একটি মতবাদ বলে মেনে নিতে হয়, তবে Martin Luther প্রবর্তিত মতবাদকেও খৃষ্টধর্ম বহির্ভূত একটি পৃথক ধর্মমত বলে মেনে নিতে হয়। মহামান্য পোপের প্রাধান্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার পরেও যখন Luther প্রবর্তিত মতবাদকে খৃষ্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করার কথা কারুর মনে জাগে নি এবং কখনও সে বিষয় চিন্তা করা হয় নি, তবে বুদ্ধ প্রবর্তিত মতবাদকেই বা কেন সনাতন আর্য ধর্মেরই একটি শাখা বলে মেনে নেওয়া হবে না? ভারতভূমিতে উদ্ভূত সকল ধর্মই, হিন্দুধর্ম। ভারতভূমিতে উদ্ভূত সকল ধর্মমতই, একটি বিশেষ যোগ-সূত্র দ্বারা পরস্পর গ্রথিত। একথা দেশ-বিদেশের মনিষীগণও স্বীকার করেছেন।

বুদ্ধ তার ধর্ম অথবা উপদেশ সম্বন্ধে কোন কিছুই স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে রেখে যাননি। তাঁর জীবদ্দশায় সংঘের জন্যেও কোন বিশেষ নিয়ম প্রবর্তিত ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় সংঘে যখন যে রকম প্রয়োজন দেখা দিত, তখনকার মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি সে রকম বিধানই নির্দেশ করতেন। তার দুই অগ্রশ্রাবক সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়ন সংঘ পরিচালনা করতেন। এরাই ছিলেন তাঁর ধর্ম সেনাপতি। এদের দু'জনের সঙ্গে অপর এক জনের নামও বিশেষভাবেই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি হলেন একদা শাক্য রাজবংশের ক্ষৌরকার, ভিক্ষু

উপালি। বুদ্ধ নিজে উপালিকে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধর রূপে সম্মানিত করে গিয়েছেন। রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার প্রাঙ্গনে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশনে, সর্বপ্রথমে উপালির উপরই বিনয় সম্মেলনের কার্যভার অর্পণ করা হয়েছিল। ধর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কতখানি উদার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর মহাপরি নির্বাণের তিনমাস পূর্বে আনন্দের সঙ্গে চাপাল চৈত্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অবগত হতে পারা যায়। চাপাল চৈত্যে, তিনি যখন নিজের আয়ু বিসর্জন দিলেন, সে সময়ে আনন্দ তাঁকে আরও কিছুদিন অন্ততঃ ধরাধামে বর্তমান থেকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান ও তার প্রচার করবার জন্যে, কাতর ভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে বুদ্ধ আনন্দকে জানিয়ে বলেছিলেন, সংঘ আমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করতে পারে? আমার যা কিছু দেবার, তা আমি সবই দিয়ে দিয়েছি। সাধারণ গুরুর ন্যায়, মুষ্ঠিবন্ধ করে কিছুইত ধরে রাখি নি। সুতরাং আমি মনে করি না, যে সংঘকে পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার, অথবা পরিচালনার ব্যাপারে সংঘ কেবল আমার উপরই নির্ভরশীল। তারপর আনন্দকে উদ্দেশ করে তিনি বলতে থাকেন, এখন থেকে নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হয়ে, অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। নিজেই নিজের অবলম্বন হও। অপরের শরণ গ্রহণ কোরো না। একমাত্র সত্যকে আশ্রয় কর। যাঁরা আমার পরিনির্বাণের পর নিজেরা আত্ম শরন নিয়ে সত্য পথে অগ্রসর হবেন, তারাই হবেন আমার শিষ্যদের অগ্রণী এবং পথ-প্রদর্শক। যে ধর্ম তোমাদের নিকট ব্যক্ত করেছি, একাগ্র চিত্তে সেই ধর্মপথে অগ্রসর হও এবং অভীষ্ট লাভের জন্যে তৎপর হও। বুদ্ধের প্রবর্তিত মতবাদের সারাংশ এখানে নিহিত রয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের আলোক-বর্ত্তিকা ধারন করে, নিজে পথে অগ্রসর হও। অভীষ্ট লাভ, অনিবার্য। পর নির্ভরতার কোন কথা এখানে নেই। আছে শুধু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্কল্প বাক্য। পথ-প্রদর্শক হিসেবে কোন গুরুর নির্দেশও এখানে নেই। এমন কি তিঁনি নিজেকে পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদের মেনে চলবার নির্দেশ দেন নি। কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রশ্রয় দান ত দূরের কথা। অতি সহজ ও সরল নির্দেশ। একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করে নিজে পথে অগ্রসর হও। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা। এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসই, বৌদ্ধধর্মের মূল। এই জন্যেই আনন্দের শত অনুরোধ সত্বেও বুদ্ধ সংঘের জন্যে কোন নিয়ম নির্দিষ্ট করে রেখে যান নি। কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হোল, দায়িত্বভার চাপিয়ে দেওয়া। বুদ্ধ ছিলেন কোন প্রকার দায়িত্বভার চাপানোর বিরোধী। ধর্মের নামে মানুষ সাধারণতঃ যা খুঁজে বেড়ায়, তা হোল আশ্রয়। যা অবলম্বন করে, সে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হবে। বুদ্ধ সেই অবলম্বন হিসেবে নির্দেশ করেছেন, অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বোধের। অপর কিছুই নয়। এ পথ একদিকে যেমন সহজ ও সরল এবং সকলেরই জন্যে সম-

ভাবেই উন্মুক্ত, অপর দিকে আবার এ পথে অগ্রসর হওয়াও তেমনি কঠিন। সত্য পথকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সত্য পথযাত্রীকে পদে পদে বিস্তর বাধা অতিক্রম করে চলতে হবে। দুঃখময় এই জগতে কোনো আশ্রয় নেই। এই ভাবটি সদা অন্তরে জাগরূক রেখে, জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে পথচারীকে পথে অগ্রসর হতে হবে। তাই বৌদ্ধধর্ম হোল, একমাত্র জ্ঞানীর ধর্ম।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে পথে অগ্রসর হয়ে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন, সে পথ হোল জ্ঞানীর পথ। সাধারণের পক্ষে তা সহজে বোধগম্য হবার কথা নয়। সুতরাং সাধারনের মধ্যে তা প্রচার করে কোন লাভ নেই। যারা সংসারের আবর্তে মোহমুগ্ধ অবস্থায় রয়েছে, তারা গ্রহণ করতে পারবে না, এর প্রকৃত মর্ম। এ ধর্মের তাৎপর্য সহজে ধরা যায় না। তর্ক দ্বারা বোঝবার উপায় নেই। এ ধর্ম একমাত্র জ্ঞানীর অন্তরেই বইয়ে দেয়, শান্তির অনন্ত আনন্দ নির্ঝর। সাধারণে, যারা কার্যকারণের বিষয় সম্বন্ধে কিছুই অবগত হতে পারবে না, তাদের পক্ষে নির্বাণের উপদেশ গ্রহণ করে, সে পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ ধর্ম প্রচার করতে গেলে শুধু কষ্ট এবং লাঞ্ছনাই কেবল ভোগ করতে হবে। একথা ভেবে কোন এক নির্জন স্থানে শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট দিন কটিকে কাটিয়ে দেবার সংকল্প করলেন তিনি। তারপর পদ্মসরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে যখন তিঁনি প্রস্ফুটিত অর্ধপ্রস্ফুটিত প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার পুষ্প সকল অবলোকন করলেন, তখন তিঁনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে পদ্মসরোবরটির বিভিন্ন অবস্থার পুষ্পের মতই জগতে রয়েছে, বিভিন্ন প্রকারের মানুষ। একদিকে যেমন রয়েছে মলিন প্রকৃতির, বিষয়াসক্ত স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, অপর দিকে আবার তেমনি রয়েছে, সত্যনিষ্ঠ মহৎ এবং পরলোক বিশ্বাসী মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষের পক্ষে তার ধর্মের সারমর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তখন তিঁনি তাঁর পূর্বের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ জীবনের অবশিষ্ট দিন কটিকে নির্জনে-নিভৃতে কাটিয়ে দেবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে, সেই পদ্মসরোবরের তীরে দাঁড়িয়েই বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "অমৃতের দ্বার সকলের জন্যেই উন্মুক্ত হোক। যে গ্রহণ করতে পারে সে করুক।"

বুদ্ধ সেই থেকে জীবনের বাকী পঁয়তাল্লিশ বছর, অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, একটানা তাঁর ধর্মমত সকলের নিকট প্রচার করে গিয়েছেন। যে পথ অবলম্বন করলে লোক মোহ মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করতে সমর্থ হবে। একান্ত সহজ ও সরল ভাবেই তিঁনি সে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। যাগ-যজ্ঞ অথবা অন্যান্য নানা প্রকারের উপাচারের বোঝা চাপিয়ে, তিঁনি সে পথকে দুর্গম করেন নি। পরিনির্বাণের পূর্বে তিনি আনন্দকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন :

নিজের চিত্তকে আলোকিত করে তোল এবং সেই আলোকের সাহায্যে পথে অগ্রসর হও এবং অমৃতের দ্বারে উপনীত হও। অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুন্দর উপদেশ। এখানে উপাচারের কোন নির্দ্দিষ্ট নেই। বিধি ব্যবস্থার কোন আড়ম্বর নেই। সর্বোপরি নেই কোন গুরুর অস্তিত্ব। নিজে চল, নিজে অনুভব কর সব কিছু। এই হোল বুদ্ধের সার কথা। ভিক্ষুগণের জন্যে, বিশেষ ভাবে নির্দেশ করেছেন তিনি বিনয়ের। গৃহীগণের জন্যে নির্দেশ করেছেন শুধু অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ যোগাভ্যাসেরই নামান্তর মাত্র। এ পথ একদিকে যেমন সহজ ও সরল, অপর দিকে আবার তেমনি কঠিনও বটে। এ পথ আঁকড়ে থাকতে পারলে তবেই জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

অনেকের ধারণা বুদ্ধ নারী জাতিকে তত্টা উচ্চ আসন দান করে যান নি। বিচার করে দেখতে গেলে, একথার অসারত্ব সহজেই প্রমাণিত হবে। তবে একথা ঠিক, যে তিনি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কপিলাবস্তুর ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে যখন তাঁর বিমাতা আর্যা গৌতমী তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে শেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধ তার সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলেন। তার মানে এই নয়; যে নারী জাতির প্রতি তাঁর ধারণা ভিন্ন রকমের ছিল। একমাত্র সংঘের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তিনি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে আনন্দের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাদের জন্যে পৃথক ভাবে অনেক কঠোর নিয়মাবলীর প্রবর্তন করেন। ভিক্ষুণী সংঘকে সাধারণ ভিক্ষু সংঘ থেকে যথেষ্ঠ দূরে রাখার জন্যে ও তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি আনন্দকে একদিন বলেছিলেন, "হে আনন্দ, তুমি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিয়ে, সংঘের আয়ু কমিয়ে দিয়েছ।" সাধারণ ভিক্ষুগণের পক্ষে নারী জাতির মুখাবলোকন করা নিষিদ্ধ ছিল। আলাপ পরিচয় ত দূরের কথা। বুদ্ধের মহা পরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছিলেন, যে নারী জাতির প্রতি ভিক্ষুগণের কি ধরণের আচরণ বাঞ্ছনীয়। তার উত্তরে বুদ্ধ তাকে জানিয়েছিলেন—অদর্শন। এরপর আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞেসা করে জানতে চেয়েছিলেন, যদি দর্শনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি রকম আচরণ বাঞ্ছনীয়। এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানিয়েছিলেন—আলাপ করা উচিৎ নয়। তার পরেও আনন্দ যখন পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, যদি আলাপেরও প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য। এর উত্তরে বুদ্ধ যে কথাটি বললেন, সেটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। নারী জাতির সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে, স্মৃতি জাগ্রত রাখবে। এই সেই সম্যক

স্মৃতি, যা মনকে সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখবে এবং কখনও আত্মবিস্মৃত হতে দেবে না। একমাত্র জাগ্রত স্মৃতিই মনকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে রেখে সর্বদা সৎ পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। ভিক্ষুগণের সংযম সাধনার জন্যেই এই দৃঢ় মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। সাধারণ ভিক্ষুসংঘের যাতে কোন প্রকার অনিষ্ট হতে না পারে, সে জন্যেই এ ধরনের আত্মপ্রত্যয়ের ব্যবস্থার তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। এর দ্বারা এটা বোঝায় না, যে তিনি নারী জাতিকে অবহেলা করেছেন, অথবা তাদের যোগ্য আসন দানে কোন প্রকার কার্পণ্য করেছেন।

ভিক্ষুসংঘের দুই অগ্রশ্রাবক, সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়ন সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তেমনি ভিক্ষুণীসংঘেরও দুই অগ্রশ্রাবিকা, নৃপতি বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা এবং শ্রাবস্তীর সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কন্যা উৎপলবর্ণা সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এরা দুজনেই ছিলেন অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী। এরা দুজনেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া বুদ্ধ বিমাতা আর্যা গোতমী এবং বুদ্ধ জায়া যশোধারা এরা দু'জনেই ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করেছিলেন এবং অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। বৈশালী নগরবাসী অপরূপ লাবণ্যবতী, প্রচুর অর্থ ও বিত্তের অধিকারিনী, বারাঙ্গনা আম্রপালী সশিষ্য বুদ্ধকে নিজ গৃহে আহারের জন্যে নিমন্ত্রন জানিয়েছিলেন এবং বুদ্ধ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও রক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আম্রপালীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে, তিনি বৈশালী রাজের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত উপেক্ষা করেছিলেন। বুদ্ধ সশিষ্য আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হলে, আম্রপালী স্বহস্তে তাদের আহার্য পরিবেশন করেছিলেন। নারী জাতির প্রতি যদি তাঁর বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব থাকতো, তবে বারাঙ্গনার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া এবং বারাঙ্গনা পরিবেশিত আহার্য গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হোত না। বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সরল, অমায়িক এবং উদার। তাঁর নিকটে সকলেরই ছিল সমানাধিকার। কাউকেই তিঁনি অবজ্ঞা করেন নি। ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে একমাত্র প্রকৃতিগত কারণেই তিঁনি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। নারী জাতির জন্যে, তাঁর পৃথক কোন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কখনও পাওয়া যায়নি। কাউকেই তিঁনি পৃথকভাবে গ্রহণ করতেন না। ভিক্ষু সংঘে অনেকে অনেক সময়ে নিজ নিজ বংশগত অথবা গোষ্ঠিগত শ্রেষ্ঠত্বের অথবা উচ্চমানের বিষয় নিয়ে বড়াই করতেন। বুদ্ধের নিকট যখনই সে ধরনের কোন সংবাদ গিয়ে পৌঁছাত, তখনই তিঁনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডেকে এনে সকলের সম্মুখে তাদের সংযত করে দিয়ে বলতেন, যে বিভিন্ন নদী থেকে সাগরে পতিত জলরাশির যেমন আর পৃথক কোন অস্তিত্ব বজায় থাকে না, তেমনি ভিক্ষু

সংঘে অবস্থিত কোন ভিক্ষুরই পৃথক অস্তিত্ব বলে আর কিছু নেই। এতেও যারা সংযত হয়নি, তাদের প্রতি তিঁনি দণ্ড দানের পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রথের সারথি ছন্দক, ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করে অন্যান্য ভিক্ষুগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। যেহেতু সে এককালে স্বয়ং বুদ্ধের রথের সারথি ছিল, সে জন্যে সে সর্বদাই অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতো। অবশেষে তাকে সংযত করবার জন্যে বুদ্ধ স্বয়ং তার প্রতি ব্রহ্মদণ্ড দান করেন। তিঁনি সংঘের অন্যান্য সকল ভিক্ষুকে ছন্দকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দেন এবং সংঘের কোন ব্যাপারে যেন তাকে গ্রহণ করা না হয়, সেই মর্মে তিঁনি এক নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছন্দকের প্রতি এই ব্রহ্ম দণ্ড বিধান তিঁনি করেছিলেন। তাঁর নিকটে উচ্চ-নীচ বলেও কোন ভেদ ছিল না। সকলেই ছিল তাঁর নিকট সমান। রূপোপজীবিনী আম্রপালী এবং সমাজ পরিত্যক্ত পিতার গণিকা গর্ভজাত পুত্র, ভিষক শ্রেষ্ঠ জীবক পর্যন্ত কেউই বুদ্ধের কৃপালাভ থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হন নি। বুদ্ধের কৃপা লাভ করে, তারা সসম্মানে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথিতে রাজগৃহের বৈভার পর্বতের উপরিস্থিত সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে, মগধরাজ অজাতশত্রুর অকুণ্ঠ সহায়তায় বুদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে, পাঁচশত অর্হৎগনের উপস্থিতিতে, প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। সেই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধের বাণীসকল সঙ্কলিত করে পর্যায়ানুক্রমে বিভক্ত করা। যাতে পরবর্তীকালে, বুদ্ধের বচন সমূহের মধ্যে কোনপ্রকার প্রক্ষিপ্ত ভাষ্যের উদ্ভব অথবা আবিলতার উদয় হতে না পারে। সেই মহতী সভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন বুদ্ধ শিষ্য এবং অর্হৎ। বুদ্ধের উপদেশসমূহ তারা প্রত্যেকেই সমভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সে সমস্ত সবকিছুই ছিল তাদের নখদর্পণে। সুতরাং তাদের সাহচর্যে বুদ্ধের বাণীসকল একত্রিক করে সঙ্কলন করার পক্ষে, কোন অসুবিধাও দেখা দেয় নি। সেই সম্মেলনে বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের সঙ্কলনের কাজ নিষ্পন্ন হলেও, বিশাল বৌদ্ধশাস্ত্রের সবকিছু নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। প্রথম সম্মেলন আহুত হবার পর, প্রায় একশত বছর বৎসর পরে, বৈশালীতে পুনরায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এরপর তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয় পাটলীপুত্রে। তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন স্বয়ং ধর্মরাজ অশোক। বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশনেই সুবিশাল বৌদ্ধশাস্ত্রের সবকিছু সঙ্কলন করা হয়েছিল বলে, পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন। এই সঙ্কলনের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছিল, বুদ্ধ যে ভাষা ব্যবহার করতেন, সেই ভাষায়। পালি ভাষায়। বুদ্ধের জীবিতকালে কয়েকজন-

ব্রাহ্মণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে, তাঁর বাণীসকল অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থের ন্যায় বৈদিক ভাষায় অনুদিত করে, সঙ্কলন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে, বুদ্ধ তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, যে বৈদিক ভাষা হোল, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের বোধগম্য ভাষা। জনসাধারণের পক্ষে সে ভাষা থেকে মর্মার্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। আমার ধর্ম সর্বজনীন। সুতরাং আমার বক্তব্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশসকল যাতে সকলের পক্ষেই অনায়াসে বোধগম্য হতে পারে, সেজন্যে সেগুলো বৈদিক ভাষার পরিবর্তে, নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে যাতে সকলে বুঝতে শেখে, সে রকম ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন (স্বকীয়া স্বকীয়া নিরুক্তিয়া)। সে যুগে সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বসাধারণের একমাত্র বোধগম্য ভাষা ছিল, পালিভাষা। সেজন্যেই বৌদ্ধশাস্ত্রসকল প্রণয়নের ব্যাপারে একমাত্র পালিভাষাকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর উপদেশসমূহের কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হয়নি।

এই পরিবর্তনশীল জগতে চিরদিন কিছুই একই রকম অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। লোকের ধর্মবিশ্বাসও নয়। তারও পরিবর্তন দেখা দেয়। বুদ্ধ নিজে কোন বিষয়েই আতিশয্য পছন্দ করতেন না। তাঁর ধর্ম-মতে যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির কোন নির্দেশ নেই। তাঁকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করে পুজোর ব্যবস্থাও তিনি নিষেধ করেছেন। তাঁর প্রতিমূর্তি অথবা চিত্র তৈরী করতেও তিনি নিষেধ করে গিয়েছেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মূর্তি পুজোর বিরোধী। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর অনুগামী, ও শিষ্যবর্গ তাঁর কোন মূর্তি অথবা চিত্র প্রস্তুত করে, সে সব দেবতার আসনে বসিয়ে, বুদ্ধের পুজোর প্রচলন করেন নি। তবে তার পরিবর্তে, কয়েকটি প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার তারা করতে আরম্ভ করেছিলেন। যেমন উপাসনার স্থানে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করার জন্যে, একখানি আসনকে পেতে রেখে, তাকে পুষ্প ও মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হোত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বেদিকা নির্মাণ করে, সেই বেদিকার উপরে তথাগতের উপস্থিতি নির্দেশ করবার জন্যে, পদযুগল অংকিত করে পুষ্প ও মাল্য দ্বারা তাকে সজ্জিত করা হোত। প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তুত করে তাকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করা না হলেও, প্রকারান্তরে সে রকম ধরনের একটা ব্যবস্থাই গ্রহণ করা আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য এর কারণও ছিল। বুদ্ধের উপাসকগণ তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয়গণের থেকে পৃথক কোন সম্প্রদায় বলে গণ্য হতেন না এবং তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূতও ছিলেন না। সমাজের এক শ্রেণীর লোকেরা যখন মহা ধুমধামের সঙ্গে ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হতেন, তখন সেই সমাজেরই প্রতিবেশী বৌদ্ধগণের পক্ষে একই আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে, সেই আবহাওয়া থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা

এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজের সেই ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণের প্রভাবের ফলে বৌদ্ধগণের মধ্যেও অলক্ষ্যে কখন যে-বুদ্ধ পূজোর প্রচলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। সে যাই হোক, প্রথমে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশক আসন পেতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। তা থেকে পরবর্তীকালে বেদির উপর পদ যুগল রচনা করে, তাঁর উপস্থিতি নির্দেশক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরই সামান্য ব্যবধানে, বুদ্ধের মূর্তিই বেদির উপর স্থান লাভ করেছিল। খুব সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকেই বুদ্ধের মূর্তি তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গেই তার পূজোর প্রচলনও আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমে বুদ্ধের উপাসকগণ বুদ্ধের মূর্তি তৈরী করে তাঁর পূজোর প্রচলন করেছিলেন, অথবা ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণ যারা বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করে, তার মূর্তি তৈরী করে, বিষ্ণু জ্ঞানে বুদ্ধের পূজোর প্রচলন করেছিলেন, তা আন্দাজ করা শক্ত। ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণই বুদ্ধকে ভগবান শ্রীবিষ্ণু জ্ঞানে সর্বপ্রথমে তাঁর পূজোর প্রচলন করেছিলেন, এরূপ আন্দাজ করাটা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার নয়। তবে বুদ্ধ-পূজোর প্রচলন, এক শ্রেণীর উপাসক গণের মধ্যে খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকেই দেখা দিয়েছিল। ব্যাপকভাবে বুদ্ধপূজোর প্রচলন আরম্ভ হয় আরও পরবর্তীকালে, কুষাণ যুগে। প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্ব কালে। উপাসকগণের মধ্যে একশ্রেণীর লোক যখন বুদ্ধের মূর্তি তৈরী করে বুদ্ধের পূজো করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাদেরই স্বগোত্র অপর শ্রেণীর উপাসকগণ বুদ্ধনির্দিষ্ট পথকেই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে রইলেন। অর্থাৎ তারা বুদ্ধের পূজোয় মেতে ওঠেন নি এবং তাতে কোন আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। এভাবে এক প্রকার অলক্ষিতেই বৌদ্ধগণ দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে একথা ঠিক যে ক্রমশ অধিক সংখ্যক উপাসকই বুদ্ধপূজোয় আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানের প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে যে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেই সঙ্গীতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধ শিষ্য ককণ্ডকের পুত্র যশ। এই সঙ্গীতির আহ্বানের মূলে ছিল কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর বিনয় বহির্ভূত আচরণ। ভাজ্জির সাংঘারামের ভিক্ষুগণ নিজেরা ইচ্ছামত দশটি নূতন বিধি প্রবর্তন করে, সেই অনুসারে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী পালন করে যেতে থাকেন। যশ দেখলেন, বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথ এ মোটেই নয়। প্রথমে তিনি ভিক্ষুগণকে তাদের নিজেদের প্রবর্তিত সেই দশটি বিধি পরিত্যাগ করে, একমাত্র বিনয়-নির্দিষ্ঠ নিয়ম পালনের জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তার সেই আবেদন এবং অনুরোধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোল। ভাজ্জির ভিক্ষুগণ তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করলেন না। যশ

তখন ভিক্ষুগণের নিজেদের ইচ্ছামত তৈরী সেই দশটি বিধিকে বিনয় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন এবং এর প্রতি বিধানের জন্যে যারা বুদ্ধ প্রদর্শিত বিনয় লঙ্ঘন করে নিজেরা ইচ্ছামত নিয়ম প্রবর্তন করে চলেছেন, তাদের সংযত করবার জন্যে বৈশালীতে ভিক্ষু গণের এক মহা সম্মেলন আহ্বান করেন। এটিই বৌদ্ধ জগতের দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি। কুলবগ্‌গে এই দশবিধ আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দশবিধ আচরণের মধ্যে ভিক্ষুগণের বিলাস-ময় খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ, গুরু ভোজন, মাদক দ্রব্য সেবন এবং গৃহীগণের নিকট থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কারপত্র গ্রহণ এবং সেগুলো ব্যবহার করার নিয়ম পর্যন্ত প্রবর্তিত করা হয়েছিল। এক কথায় ভাজ্জির ভিক্ষু সমাজ অধঃ-পতিত হয়েছিল। বুদ্ধ নির্দিষ্ট বিনয়ে এ সকল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রায় সাত শত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে, এই সভার কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল এবং এই সভার কার্যও বহু দিন ধরেই চলেছিল। সুবিশাল বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলনের কাজ এই সভায়ই সমাপ্ত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঘটনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পূর্ব জন্মে সংঘটিত অনুরূপ ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বুদ্ধ যে সকল উপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেই সকল কাহিনী সমূহকে জাতক কাহিনী আখ্যা দিয়ে সঙ্কলন করা হয়েছিল, এই সময়েই। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানে সর্ব-সম্মতিক্রমে স্থির করা হয় যে, বুদ্ধ নির্দিষ্ট বিনয় বহির্ভূত কোন নিয়ম ভিক্ষুগণ নিজেরা ইচ্ছামত প্রবর্তন করতে পারবেন না এবং তা মেনে চলবেন না। ভাজ্জির সাংঘারামের ভিক্ষুগণ তাদের নিজেদের ইচ্ছামত যে দশটি নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন, সে জন্যে তারা সর্বসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মধ্য দিয়েই এই সম্মেলনের পরিসমাপ্তি টেনে দেওয়া হয়েছিল।

এর পরের মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয় পাটলীপুত্রে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ মত গ্রহণ করার পর, অল্পদিনের মধ্যে এই মহাসঙ্গীতির আহ্বান করেন। এটি হোল বৌদ্ধ জগতের তৃতীয় মহা-সঙ্গীতি। অনেকের মতে সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ মতে দীক্ষিত করেন ভিক্ষু উপগুপ্ত। আবার অনেকের মতে সম্রাট অশোকের দীক্ষাগুরু হলেন সে-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু মোগ্গলি পুত্ত তিষ্য। ইনি অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন উপগুপ্ত এবং মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

পাটলীপুত্রে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ প্রবর্তিত মতের শুদ্ধিকরণ। সম্রাট অশোকের সময়ে ভিক্ষুগণের মধ্যে

অনেকেই ত্রিপিটক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। ভিক্ষুগণের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বিনয়সূত্র সম্বন্ধেও তাদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। অনেকের আবার বিনয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। তারা অপরের দেখাদেখি কাজ করে চলতেন মাত্র। যাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা চলতেন, বিনয় সম্বন্ধে তাদেরও ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সীমিত ছিল। বলতে গেলে, তখনকার ভিক্ষু সমাজ নিজেদের প্রয়োজন মত নিয়ম মেনে চলতেন, যার সঙ্গে বুদ্ধের নির্দেশিত বিনয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। মোগ্গলিপুত্ত এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্যে তার শিষ্য সম্রাট অশোককে দিয়ে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের আহ্বান জানান। এর ফলশ্রুতি হিসাবে পাটলীপুত্রে মোগ্গলিপুত্ত তিষ্যের অধিনায়কত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই সঙ্গীতির অধিবেশনের কাজও চলেছিল অনেকদিন পর্যন্ত। সম্রাট অশোকের অকুণ্ঠ সহযোগীতায় এই সঙ্গীতির কাজ অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল। সেই মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ ত্রিপিটককে পুনরায় সংকলিত করা হয়। এই সম্মেলনে অভিধর্ম এবং কথাবত্থুর (কথাবস্তু) সংকলনের কাজ সমাপ্ত করা হয়। যে সকল ভিক্ষু বুদ্ধনির্দিষ্ট বিনয়সূত্রের পথ পরিত্যাগ করে, নিজেরা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, স্থবির তিষ্যের নির্দেশমত, তাদের ভিক্ষুসংঘ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ষাট হাজার ভিক্ষুকে বিনয় বহির্ভূত আচরণের জন্যে, সংঘ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ হয়েছিল। প্রথম মহাসঙ্গীতি এবং দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতিতে যেমন বুদ্ধনির্দিষ্ট পথকেই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতেও সেই একই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল; অর্থাৎ বুদ্ধনির্দিষ্ট পথকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছিল। এই মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান শেষে ত্রিপিটক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেছেন, এ রকম এক হাজার ভিক্ষুকে স্থবির তিষ্য ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে পরিক্রমণের নির্দেশ দান করেন। সম্রাট অশোককেও তিনি গঙ্গার তীরে এক সপ্তাহকাল ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। তিষ্যের ধর্মোপদেশে মুগ্ধ হয়ে, সম্রাট অশোক ধর্মের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে প্রেরণ করেন। পুণ্য বোধিবৃক্ষের একখানি শাখাও তিনি তাদের সঙ্গে দিয়ে দেন, সিংহলের মৃত্তিকায় সেটিকে প্রোথিত করবার জন্যে। মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রার চেষ্টার ফলে সমগ্র সিংহলের অধিবাসীবৃন্দ বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমত গ্রহণ করেন।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের সময় পর্যন্তও বুদ্ধের মূর্তি তৈরী, অথবা তাঁর পুজোর প্রচলন আরম্ভ হয় নি। অশোকের রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপত্য

শিল্পসকল, অন্ততঃ এই সাক্ষ্যই বহন করছে। অশোকের রাজত্বকালে তার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, যে সকল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প নিদর্শনসমূহ সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত বৌদ্ধ ভাবাদর্শ অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সেগুলোর মধ্যে কোথায়ও বুদ্ধের মূর্তি অথবা বুদ্ধের খোদিত প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। সাঁচীর বিখ্যাত স্তুপটি অশোকের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। সেখানে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর অনেক কিছুই খোদিত আকারে (Relief) দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল খোদিত চিত্রাবলীর মাঝে কোথায়ও বুদ্ধকে দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীকে আশ্রয় করেই সেগুলো রচিত ও নির্মিত হয়েছিল। পারিলেয় বনে বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধুপূর্ণ একটি মৌচাক প্রদানের ঘটনাটিকে সাঁচীর এক নম্বর স্তুপটির প্রধান প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সেখানে বানরটিকে মানুষের মত ভঙ্গীতে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দু'হাতে ধৃত মধুপূর্ণ মৌচাকটিকে উৎসর্গ করবার জন্যে উদ্যত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, অথচ যাঁকে উদ্দেশ করে সে মৌচাকটিকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, সেই বুদ্ধকেই সেখানে অনুপস্থিত রাখা হয়েছে। সে আসনটি "শূন্যই" রয়েছে। এ রকম সবকটি ঘটনার মধ্যেই বুদ্ধের আসনটিকে সেখানে "শূন্য" রাখা হয়েছে। শূন্যতাকেই সেখানে পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে।

বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ এবং দেবতা জ্ঞানে বুদ্ধকে পূজোর ব্যবস্থার প্রচলন অশোকের পরবর্তী যুগেই আরম্ভ হয়েছিল, একথা একরূপ নিশ্চিত করেই বলা চলতে পারে। ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোকেই বুদ্ধের পূজো করতে আরম্ভ করেছিলেন। এটা যে পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব, সে কথা পূর্বে একবার আলোচিত হয়েছে। এভাবে উপাসক শ্রেণী, ক্রমশঃ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দু'ভাগে বিভক্ত উপাসক শ্রেণীর মধ্যে কালক্রমে মতভেদ এবং অসন্তোষও ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর যথাবিহিত একটা মিমাংসায় উপনীত হবার জন্যে, কুষাণ বংশীয় সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে, স্বয়ং সম্রাট কনিষ্কের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়েছিল। সম্রাট কণিষ্ক নিজে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ্যমতের চেয়ে বৌদ্ধমতের প্রতি তার সমধিক অনুরাগ ছিল, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রথম খৃষ্টাব্দের সূচনা কালের কোন এক সময়ে এই চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান আহ্বান করা হয়েছিল। এই মহাসম্মেলনের অধিবেশন কোথায় হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কারুর মতে, পাঞ্জাবের জলন্ধরে এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। আবার কারুর মতে, এই

সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল কাশ্মীরে। সে যাই হোক, এই চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন নানা দিক থেকেই বৌদ্ধ জগতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। উপাসকগণের মধ্যে বুদ্ধের পূজোর প্রচলন আরম্ভ হবার পর থেকেই তারা, নিজেদের অলক্ষিতেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথ আঁকড়ে চলেছিলেন এবং তারা বুদ্ধের মূর্তি পূজোয় মেতে ওঠেন নি। তাদের স্বগোত্র অপর দলটি কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণের ন্যায়, ষোড়শোপচারে বুদ্ধের পূজোয় মেতে উঠেছিলেন। যারা বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তুত করে বুদ্ধের পূজোর পক্ষপাতি হয়ে উঠেছিলেন, তারাই প্রধানতঃ এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং তারা সম্রাট কণিষ্ককেও প্রভাবান্বিত করে তাকে নিজেদের মত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিব্বতীয় পুঁথি অনুসারে দেখা যায় যে, এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধমতাবলম্বী-গণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল ভাবাদর্শ কালক্রমে দেখা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা সমতা টেনে এনে এর একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। এই বিভিন্ন প্রকারের ভাবাদর্শের উদ্ভব হয়েছিল, প্রধানতঃ বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজোর প্রচলনকে উপলক্ষ্য করেই। সম্মেলনের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, বিভিন্ন প্রকার ভাবাদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কোন ক্রমেই সম্ভবপর হোল না। শেষ-পর্যন্ত বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ প্রধান দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। যারা বুদ্ধের নীতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতি, তারা পরিচিত হলেন হীনযান (Small vehicle) সম্প্রদায় নামে। অর্থাৎ তারা বুদ্ধের মতবাদ নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক। আর যারা বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজোর পক্ষপাতী, তারা পরিচিত হলেন মহাযান (Great Vehicle) সম্প্রদায় নামে। হীনযানী সম্প্রদায় আরও একটি নামে পরিচিত হলেন, 'থেরবাদী', অর্থাৎ স্থবিরবাদী নামে। থেরবাদীগণ, তাদের দৃষ্টিকোণ সীমিত রাখার ফলেই সমগোত্রীয়গণের নিকট থেকে কতকটা অবজ্ঞাসূচক হীনযানী আখ্যা লাভ করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ, এই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানে, সম্প্রদায় হিসাবে হীনযানী অথবা থেরবাদীগণ, নিজেরা কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। সিংহলের পুঁথিপত্রাদিতে এই চতুর্থ সঙ্গীতির কোন উল্লেখই দেখতে পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, রাজগৃহে প্রথম মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানের পর, প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে চতুর্থ মহা সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠান পর্ব শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছিল, সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের দ্বিধাবিভক্তির মধ্য দিয়ে।

একটি বৃহৎ নদীর শাখানদী এবং উপনদীর মতই পরবর্তিকালে, বৌদ্ধ মতে বহু শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে মূলতঃ, হীনযান মতবাদ এক-প্রকার অপরিবর্তিতই থেকে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু মহাযান মতবাদে ক্রমশঃ

বিভিন্ন প্রকারের মতাদর্শের উদ্ভব হতে আরম্ভ করে। যার ফলে কালক্রমে মহাযানী মত ক্রমশঃ বহুধা বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। মহাযানী মত প্রবর্তিত হবার পর মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণের মধ্যে একদিকে যেমন বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তুত করে পুজোর প্রচলন আরম্ভ হয়, অপরদিকে আবার তেমনি নানা-প্রকার দেবদেবীর পুজোর প্রচলনও আরম্ভ হয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত, বোধিসত্ত্ব বলতে কেবলমাত্র একজনকেই বোঝাত এবং তিনি হলেন বুদ্ধ স্বয়ং। অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে, বুদ্ধকল্প বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে বুদ্ধত্বে উপনীত হয়েছিলেন. এইটিই ছিল একমাত্র বুদ্ধ শিষ্যগণের বিশ্বাস অথবা ধারণা। মহাযানীগণ সেই মতের পরিবর্তন ঘটালেন। তাদের মতে প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী। সুতরাং তাদের নিকট বোধিসত্ত্ব বলতে এখন আর শুধু একজন মাত্র রইলেন না। তাদের নিকট বোধিসত্ত্ব হলেন বহু। এতদিন পর্যন্ত শ্রমণ ও উপাসকের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু ছিল, সে পার্থক্যটুকুও অনেকাংশে ঘুচে গেল। নূতন করে যে সকল বোধিসত্ত্ব মহাযান ধর্মমতে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বজ্রপানি ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। বুদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে এই সকল বোধিসত্ত্বান ও পুজো পেতে থাকেন। মহাযান মতবাদ তার সার্বজনীন ভাবধারা নিয়ে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু হারিয়ে ফেলে। কিছুদিন বাদে মহাযান মতের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই ভাঙ্গন দেখা দিল। বজ্রযান নামে নূতন একটি শাখার সৃষ্টি হয়। বজ্র অর্থে, শূন্যতাকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শূন্যতাই ধর্মকায়। বুদ্ধ নিজে যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই শূন্যতা অথবা ধর্মকায় থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই বজ্রযান মতবাদ বুদ্ধোক্ত শূন্যতা অথবা ধর্মকায়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হলেও, এটি পুরোপুরি তান্ত্রিক ভাবধারাপুষ্ট। বুদ্ধ নিজে কখনও তান্ত্রিক ভাবধারাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি নিজে কখনও তন্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এই মতের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি হলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ যোগাচারী সন্ন্যাসী অসঙ্গ। বজ্রযান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বোধিসত্ত্বের পাশে এসে স্থান লাভ করলেন দেবী শক্তি। এই দেবী, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পার্শ্বে স্থান লাভ করে পরিচিতা হলেন, দেবী তারা নামে। বৌদ্ধমতে যখন তান্ত্রিক ভাবধারা প্রবেশ করেছিল, তখন পাশাপাশি অবস্থিত ব্রাহ্মণ্যমতেও প্রবলভাবে তান্ত্রিক ভাবধারা প্রবেশ করেছিল। উভয় ধর্মমতে প্রায় একই সঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রবেশ লাভ করার ফলে, সাধারণ ফলশ্রুতি হিসেবেই উভয় মতাদর্শের মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবী

সকলও ধীরে ধীরে, একে একে এসে স্থান লাভ করে নিতে থাকেন বৌদ্ধমতে। অপর দিকে বৌদ্ধ মতেও যে সকল দেব-দেবীর আবির্ভাব দেখা দিয়েছিল, তারাও একে একে এসে ব্রাহ্মণ্যমতে নিজের নিজের আসন করে নিলেন এবং এমনভাবে ব্রাহ্মণ্যমতে মিশে গেলেন, যে তাদের কাউকেই আর পৃথক করে চিনে নেবার উপায় পর্যন্ত আর রইলো না। ব্রাহ্মণ্যমতে রুদ্রদেবের উপাসনা বৈদিক যুগে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এইসময় রুদ্রদেবের পরিবর্তে শিব পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়। বৈদিক রুদ্র আর শিব এক নন। বজ্রযানী দেবতা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যমতে প্রবেশ করে সম্ভবতঃ শিবরূপে পূজিত হতে থাকেন। অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গিনী হিসেবে দেবী তারাও ব্রাহ্মণ্যমতে 'তারা' নামেই পূজিতা হতে লাগলেন। বৌদ্ধ দেবী হারিতীও সম্ভবতঃ দেবী শীতলা নামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিতা হতে লাগলেন।

এই বজ্রযান মতবাদ থেকে পরবর্তীকালে আরও দুটি মতবাদের উৎপত্তি দেখা দিয়েছিল। সে দুটি হোল যথাক্রমে তন্ত্রযান ও সহজযান। বলা বাহুল্য এই সকল বিভিন্ন মত ও উপমতাবলম্বীগণ নিজেদের শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত মতবাদের সমর্থক বলে পরিচয় প্রদান করলেও, তারা শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত মতবাদ থেকে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত মতবাদের আদর্শ গ্রহণ করলেও, তাঁর প্রবর্ত্তিত মত ও পথ থেকে এরা সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলতে আরম্ভ করেছিলেন। শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত মতবাদে, গুরুর স্থান নির্দেশ করা হয় নি। কিন্তু তান্ত্রিক মতবাদী বৌদ্ধগণ, প্রতি পদক্ষেপেই গুরুর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যমতের গুরুর ন্যায়, তান্ত্রিক বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণও তাদের শিষ্যবর্গকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন এবং তাদের নির্দেশিত পথেই শিষ্যবর্গকে চলবার জন্যেও উপদেশ প্রদান করতেন। এর ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যে বিষয়টি দেখা দিয়েছিল, তা হোল, ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণের সঙ্গে তান্ত্রিক ভাবধারাপুষ্ট মহাযানী মত থেকে উৎপন্ন নানা শাখার মতাদর্শের ব্যবধান ক্রমশঃ সংকুচিত হতে হতে শেষে এমন এক যায়গায় এসে মিলিত হয়েছিল, যেখানে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরী মঠ থেকে আচার্য শংকরের আবির্ভাব এবং তাঁর সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণের ফলে, মহাযানী মত থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের পৃথক অস্তিত্বটুকুও আর বজায় রাখা সম্ভবপর হোল না।

ভারতের মাটিতে বৌদ্ধগণের পৃথক অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটলেও, শাক্যমুনি প্রবর্ত্তিত মতবাদ অথবা ধর্মের প্রভাব আদৌ বিলুপ্ত হয় নি। তিনি যে ভাবধারার প্রবর্ত্তন করে রেখে গিয়েছেন, তা দূর হওয়া দূরের কথা, বরং আমাদের অস্থি-মজ্জায় এমন ভাবে মিশে গিয়েছে, আমাদের পক্ষে আজ আর তা পৃথক করে

দেখাবার উপায়টুকু পর্যন্ত নেই। বর্ত্তমানে আমরা হিন্দুধর্ম বলতে যা বুঝে থাকি, তার মধ্যে শাক্যমুনির দান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু ধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই নয়, আমাদের শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও, শাক্যমুনির প্রবর্ত্তিত ভাবধারা অতিশয় সুস্পষ্ট। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে আমাদের এই বঙ্গভূমিতে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী কাল পর্যন্ত যে ধর্মমত সবচেয়ে বেশী প্রসার লাভ করেছিল, তা বৌদ্ধ সহজযান মতবাদ। এই সহজিয়া মতবাদও তান্ত্রিক মতবাদ। সহজ অর্থে সহজাত যে ধর্ম। জন্মলগ্ন থেকে যে ধর্ম এবং যে বস্তু আপনা থেকেই মানবদেহে এবং মনে উৎপন্ন হয়, তাহাই সহজ। সুতরাং সহজ আনন্দময় নিত্য ধর্মকায় হতে জাত।

বৌদ্ধমতে সকল জীবের উৎপত্তি ধর্মকায় থেকে। ধর্মকায়াকে তথতা ও শূন্যতাও বলা হয়ে থাকে। একমাত্র ধর্মকায় নিত্য। আর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য। আবার আনন্দ ও করুণার লীলাভূমিও এই ধর্মকায়। জীবমাত্রেই বোধিচিত্ত, অর্থাৎ এই ধর্মকায় অথবা শূন্যতা থেকে জাত। জীব ধর্মকায় থেকে জাত বলে, প্রতিটি জীবের মধ্যেই আনন্দ ও করুণা সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রয়েছে। সুতরাং আনন্দ ও করুণাই হোল প্রতিটি বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম। আনন্দ ও করুণার এই বিশেষত্বের উপরেই সহজযান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই মতের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে তান্ত্রিকতাও প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহজিয়াগণ অদ্বৈতবাদী। পরবর্ত্তীকালে চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মে, এই সহজিয়া মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। অনেকের ধারণা যে চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হবার পর থেকে এদেশে খোল, মৃদঙ্গের সহযোগে নগর সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এই নগর সংকীর্ত্তনের প্রথা চৈতন্যযুগে প্রবর্ত্তিত হয় নি। বহু পূর্ব থেকেই এদেশে তা প্রচলিত ছিল। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ লোক শিক্ষা দেবার জন্যে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ পদ্যের আকারে মুখে মুখে সৃষ্টি করতেন। তাদের সৃষ্ট সেই পদসমূহ তাদের শিষ্যগণ খোল, মৃদঙ্গ সহকারে সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে তা সাধারণে প্রচার করতেন। সিদ্ধাচার্যগণের সৃষ্ট সেই পদগুলোকে বলা হোত চর্যাপদ। অর্থাৎ যাহা আচরণীয়। এই চর্যাপদগুলো একদিকে যেমন সহজিয়া মতবাদের নিগূঢ় তথ্যকে জনসাধারণের নিকট তুলে ধরেছে, অপরদিকে এগুলো অলক্ষ্যে এক নূতন সাহিত্যেরও সৃষ্টি করেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদিমতম রূপ এই চর্যাগীতিগুলো।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধেও অনেক রকম মত সাধারণে প্রচলিত রয়েছে। সাধারণভাবে পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপেই পূজিত হয়ে আসছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেবও জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিমূর্ত্তি বলে প্রচার করে গিয়েছেন। কিন্তু আদিতে

জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ, বলে পূজিত হতেন কিনা ; তা নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ দেখা দিয়েছে। জগন্নাথদেবের মন্দিরটি সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ছোট একখানি টিলার উপরে অবস্থিত। এককালে এখানকার সমগ্র অঞ্চলটিই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। আদিবাসীগণ তাদের নিজস্ব দেব-দেবীগণের পূজো করতেন। তারা বৃক্ষের কাণ্ড অথবা কাষ্ঠখণ্ড মাটিতে পুঁতে, তারও পূজো করতেন। আদিবাসী অধ্যুষত অঞ্চলে এখনও কাষ্ঠ খণ্ড পূজোর প্রচলন রয়েছে। জগন্নাথদেবের মন্দিরের একপার্শ্বে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শাক্তমতের একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম পীঠস্থান বিমলাদেবীর মন্দির। মাঝখানে জগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দির। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছে সূর্য মন্দির। কোনারক থেকে সূর্যদেবের বিগ্রহ এনে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। সে থেকেই মন্দিরটির নাম সূর্য মন্দির হয়েছে। এই সূর্য মন্দিরটি জগন্নাথদেবের মন্দিরের চেয়ে অনেক প্রাচীন। দর্শকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। আদিতে সম্ভবতঃ এই মন্দিরটি সূর্যদেবের মন্দির ছিল না। সূর্যদেবের বিগ্রহ যেখানে স্থাপন করা হয়েছে, ঠিক তার পিছনে রয়েছে, আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়, অভয়দান নিরত একখানি অতি চমৎকার বুদ্ধমূর্ত্তি। কালো পাথরের তৈরী বুদ্ধের এই মূর্ত্তিখানি অতি প্রাচীন। মহাযানী আমলের প্রথম যুগেই এই মূর্ত্তিখানি তৈরী হয়ে থাকবে। কেন না, মূর্ত্তিখানিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের এই মূর্ত্তিখানি সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে না। যারা সূর্যের মন্দিরে প্রবেশ করেন, এই মূর্ত্তিখানি তাদেরও দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। সাধারণভাবে এই মূর্ত্তিখানিকে দেখার উপায় নেই। সূর্যের প্রকাণ্ড বিগ্রহখানিকে এমনভাবে মূর্ত্তিখানির একেবারে ঠিক সম্মুখ ভাগে স্থাপন করা হয়েছে, তাতে বুদ্ধের মূর্ত্তিখানি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। যেটুকু ফাঁকা জায়গা রয়েছে, সেটুকু একবারে অন্ধকারে আবৃত। একমাত্র প্রদীপের আলো ব্যতীত কিছুই চোখে পড়ে না। একমাত্র প্রদীপের আলোর সাহায্যেই কোনক্রমে বুদ্ধমূর্ত্তিখানির দর্শন লাভ হতে পারে, তা'ও ভাল করে নয়। সূর্যের বিরাটাকার মূর্ত্তিখানি দিয়ে বুদ্ধের মূর্ত্তিটিকে এভাবে ঢেকে দেবার ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু কেন বুদ্ধের মূর্ত্তিটিকে এভাবে জন-সাধারণের দৃষ্টিসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? কি তার প্রয়োজন ছিল? সে সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যাবে বলে, মনে হয় না। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দারু নির্মিত বিগ্রহ, সম্ভবতঃ আদি-বাসীগণের দ্বারাই সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আদিবাসীগণও সম্ভবতঃ তাদের প্রচলিত বিধি অনুসারেই, সেখানে তাদের পূজো করতেন। এই আদি-বাসীগণ পরে বুদ্ধের জীবিতকালে অথবা তার অল্প পরে বুদ্ধের মতবাদের

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রবর্ত্তিত মতাবদ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধমত গ্রহণ করার পরেও তারা যে তাদের ধারাবাহিক প্রাচীন রীতিনীতিকে, সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন, এমন বোধ হয় না। বরং তারা তাদের প্রচলিত ও পূজিত দেব-দেবী সকলকেও বৌদ্ধ ভাবাপন্ন করে তুলে, নবরূপে তাদের পুজো করতে আরম্ভ করেছিলেন। বুদ্ধেরও অপর নাম জগন্নাথ। পরবর্ত্তীকালে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে, যখন এতদ্‌অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়, তখন বৌদ্ধগণও পুনরায় ব্রাহ্মণ্যমতেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। খুব সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে আদি-বাসীগণের দ্বারা পূজিত, বুদ্ধের প্রতীক দারুময় জগন্নাথের বিগ্রহ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক বিগ্রহ হিসেবে, রূপান্তরিত হয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সংস্কার করতে গিয়ে মন্দিরগাত্রে কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিস্কৃত হয়েছে। আস্তরনের সাহায্যে এই মূর্ত্তিগুলোকে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এটাও যে নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সে বিষয়ে উল্লেখের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। জগন্নাথ মন্দিরগাত্রে আবিস্কৃত এই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো পূর্বোক্ত মতেরই সমর্থন যোগাচ্ছে সন্দেহ নেই। শুধু পরোক্ষভাবেই নয় প্রত্যক্ষভাবে আজও বুদ্ধের পুজোর প্রচলন আমাদের দেশে অব্যাহতই রয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে, বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে আজও জাঁকজমক সহকারে ষোড়োশোপচারে ধর্মঠাকুরের পুজো করা হয়ে থাকে। এই ধর্মঠাকুর আর কেউই নন, স্বয়ং বুদ্ধ। কলকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থানের নাম ধর্মতলা, এই ধর্মঠাকুরের মন্দিরের নামানুসারেই হয়েছে।

বুদ্ধের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে, যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব হয়েছিল! বর্ত্তমানে জগতের সবচেয়ে বেশী লোক খৃষ্টধর্মাবলম্বী। খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্মমতের উপর বৌদ্ধমত যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, একথা খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণই স্বীকার করেছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এদেশ থেকে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ, তথাগতের বাণীসকল বহন করে ভারতের বাইরে দূর দূরান্তে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেইসব ধর্ম প্রচারক, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং লিবিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই নয়; মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগের সর্বত্রই এরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তথাগতের বাণী প্রচারের সঙ্গে, রোগীর সেবা শুশ্রূষা এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থাদিও এঁরা করতেন।

এঁদের মধ্যে অনেকেই ভেষজ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি আজ মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র প্রচলিত, সেই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভারতীয় শ্রমণগণের নিকট থেকে গ্রীকগণ সর্বপ্রথমে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে নেয়। পরবর্ত্তীকালে গ্রীকগণ যখন সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে তাদের নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সে সময়ে মধ্য প্রাচ্যের অধিবাসীগণ গ্রীকদের নিকট থেকে এই চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ব করে নেয় এবং তারা এর নামকরণ করেন ইউনানী চিকিৎসা। আইয়োনিয়া উপদ্বীপের নামানুসারেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দাঁড়িয়েছিল ইউনানী চিকিৎসা।

সেই সুদূর অতীতে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমণগণের সর্বদাই যাতায়াত ছিল। ভারতীয় শ্রমণ ও সন্ন্যাসীগণ সে সকল অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সময় সময় তারা সে সমস্ত অঞ্চলের জনগণের দ্বারা স্থানীয় নামেও পরিচিত হতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৃষ্টধর্মের প্রবর্ত্তক প্রভু যীশুর দীক্ষাদাতা গুরু, সাধু জোহানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধু জোহান যে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তার আচার ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে, হস্তস্থিত বাঁকানো যষ্ঠিখানি এবং পরণে কৌপিনটুকু পর্যন্ত, সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। তিনি নিজে ছিলেন একজন অন্তর্যামী সন্ন্যাসী। যীশুর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি তাঁকে গীতায় উক্ত একজন যুগোপযোগী পরিত্রাতা বলে চিনে নিতে পেরেছিলেন। যীশুও তাকে দেখা মাত্রই, গুরু বলে চিনে নিতে পেরে ছিলেন। জর্ডান নদীর তীরে সাধু জোহানের সঙ্গে যীশুর দেখা হওয়ার সাথে সাথেই যীশু তার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। সাধু জোহানও জর্ডান নদীর পবিত্র জল যীশুর মস্তকে সিঞ্চন করে, তাকে দীক্ষা দান করেছিলেন। এই দীক্ষা দান এবং দীক্ষা দানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। এর মধ্যে, সেকালে মধ্য প্রাচ্যে প্রচলিত আচার-বিচার নিয়ম-কানুন প্রভৃতি, কোন কিছুরই ছায়াপাত পর্যন্ত ঘটেনি। সাধু জোহান নিজে ছিলেন একজন কৃচ্ছ্রসাধনপন্থী যোগী পুরুষ। মধ্য প্রাচ্যের কোথায়ও কৃচ্ছ্রসাধনপন্থী যোগী পুরুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। প্রভু যীশুর জীবনচরিত রচয়িতা, পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত রেঁনা সাধু জোহানের এই দীক্ষাদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, Indeed, might there not be in this a remote influence of the Indian Munis ? জর্ডান নদীর পবিত্র জল যীশুর মস্তকে সিঞ্চন করে তাকে দীক্ষা দানের সম্বন্ধে, তিনি পুনরায় বলেছেন :—We might imagine

ourselves transportad to the banks of the Ganges। সাধু জোহানের দীক্ষা দানের রীতি প্রতিটি খৃষ্টধর্মাবলম্বীর Baptism এর সময় আজও নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলা হয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্মমতে বৌদ্ধমতের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ্ H. G. Wells বলেছেন ঃ—There seems to have a constant exchange of the outer forms of religion between east and west. We read in Huc's Travels how perplexing he and his fellow missionary found this possession of a common tradition of worship. "The cross" he saye the mitre, the dalmatica, the cope which thc Grand Lamas wear on their journeys, or when they are performing some ceremony out of the temple, the service with double choirs the psalmody, the exorcisms ; the censer, suspended from five chains, which you can open or close at pleasure ; the benedictions given by the Lamas by extending the right hand over the heads of the faithful, the chaplet, ecclesiastical celebacy spiritual retirement, the worship of saints, the fasts, the processions, the litanies, the holy water, all these are analogies between the Buddhists and ourselves ." এতগুলো কথা যে কেবল outer forms বা বহিরঙ্গ মাত্র হতে পারে না, সে কথার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আচার-বিচার ও নিয়মের এতগুলো সমতা যেখানে রয়েছে, সেখানে বৌদ্ধ প্রভাব কতখানি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়, খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে বুদ্ধ একজন সাধুপুরুষ (Saint) হিসেবেও পূজিত হয়ে থাকেন। স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত জাতক কাহিনীর প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় এ সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ করেছেন এ প্রসঙ্গে তা এখান তুলে ধরা হোল…"খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিস্ময়কর ব্যপার বলা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস নগরবাসী জন নামক এক সাধু পুরুষ গ্রীক ভাষায় অনেক ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানির নাম "বার্লাম ও যোষাসফ।" যোষাসফ্ বা যোসাফট ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র ; ইনি বার্লামের নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।……রোমান্ ক্যাথলিকদিগের উপাসনাদি

ক্রিয়ার অন্যান্য খৃষ্টান সাধুপুরুষদিগের নামের ন্যায়, বার্লাম ও জোসাফ ফটের নাম উচ্চারণ করবার ব্যবস্থা হয়। যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভুদিগের আবির্ভাব ও তিরোধান স্মরণ করিবার জন্য এক-একটি দিন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে, রোমান ক্যাথলিক সাধুপুরুষদিগের জন্যও সেইরূপ প্রথা আছে। এই নিয়মানুসারে ২৭শে নভেম্বর বার্লামের ও যোসাফটের স্মরনার্থ উৎসর্গ করা হইত। ইউরোপের প্রাচ্য খৃষ্টান সমাজেও যোসাফটকে "য়োসাফ" এই নামে সাধু শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে বার্লাম কোন স্থান পান নাই। প্রাচ্য সমাজে ২৬শে আগস্ট সাধু যোসাফটের স্মারক দিন।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যোসোফট্ কে? তিনি যে ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র ইহা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে গোতম ছিলেন "বোধিসত্ব।" এই শব্দটি আরবী ভাষায় হইয়াছিল 'যোদাসফ্' এবং আরব হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিবার সময় হইয়াছিল "যোসাফট্"। যোসাফটের জীবন বৃত্তান্ত সেণ্ট জন যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, গোতম বুদ্ধই তাহার গ্রন্থের নায়ক। জাতকের অনেক কথাও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম পরবর্ত্তীকালে খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্মমতে শুধু বহিরাঙ্গ আচার বিচারের মধ্যেই তার প্রভাব বিস্তার করে নি, বাইবেলে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মূল বক্তব্যের অনেক কিছুই বৌদ্ধধর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুনরায় বলেছেন "বাইবেলের উত্তর খণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধ প্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায়; যীশুখৃষ্ট দুই বার অতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহুলোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। "ঈল্লীশ জাতকের" প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায় গোতমও ঠিক এইরূপে নিজের লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্য পরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গোতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।" যীশু মাতা মেরী এবং অন্যান্য সন্তদিগের মূর্ত্তি তৈরি করে, মস্তকের পিছনে আভামণ্ডল (Halo) তৈরীর রীতিটিও সম্পূর্ণ ভারতীয়।

ইহুদী এবং গ্রীকসাহিত্য, এক কথায় পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যে, বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেণ্টে এবং গ্রীক কথাসাহিত্যে জাতককাহিনী সকলের অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। রাজা সলোমনের অদ্ভুত বিচার নৈপুণ্যের সম্বন্ধে ওল্ড টেস্টামেণ্টে।

King-ও তে যে ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে সেই ঘটনাটির বিষয়বস্তু জাতক কাহিনীর অন্তর্গত "মহা উম্মাগ" জাতকের আখ্যানবস্তু থেকে একরূপ অবিকৃত অবস্থায়ই গ্রহণ করে সেটিকে রাজা সলোমনের নামে পুনঃপ্রচার করা হয়েছে মাত্র। জাতকের আখ্যান বস্তুতে, কাহিনীটি যেভাবে উল্লিখিত রয়েছে, তা হোল বোধিসত্ত্বরূপী বালক মহোষধের নিকট একদিন এক যক্ষিণী ও একজন সাধারণ মানবী একটি শিশু সন্তান সহ এসে উপস্থিত হয়। তারা উভয়েই শিশুটিকে নিজ গর্ভজাত শিশুপুত্র বলে দাবী জানাতে থাকে। মানবী বলেন, যে তিনি শিশুটিকে পুষ্করিণীর তীরে শুইয়ে রেখে অবগাহনের উদ্দেশ্যে পুষ্করিণীতে অবতরণ করলে, সেই অবসরে যক্ষিণী এসে, শিশুটিকে সংহারের উদ্দেশ্যে, তাকে অপহরণের চেষ্টা করে। অপরপক্ষে যক্ষিণী বলে, যে শিশুপুত্রটি তারই গর্ভজাত, মানবী মিথ্যা পরিচয় দিয়ে শিশুটিকে আত্মস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। বালক মহোষধ তখন শিশুটির প্রকৃত গর্ভধারিণী কে তা নির্ণয় করবার জন্যে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেন। ভূমিতে একটি বৃত্ত এঁকে তিনি শিশুটিকে সেই বৃত্তের মধ্যে শুইয়ে রেখে দিতে বল্লেন। তারপর মানবী এবং যক্ষিণী উভয়কেই আদেশ দিলেন, তোমরা উভয়েই শিশুটিকে বৃত্তের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা কর। এতে যে সফলকাম হবে, তাঁতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে, যে শিশুটি তারই গর্ভজাত সন্তান। বালক মহোষধের কথায় উৎসাহিত হয়ে যক্ষিণী শিশুটির পদদ্বয় সজোরে আকর্ষণ করে, তাকে বৃত্তের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে মানবী শিশুটির শারিরীক কষ্ট উপলব্ধি করে, তাকে আকর্ষণ করা থেকে বিরত হন। বালক মহোষধ তখন শিশুটিকে তার প্রকৃত গর্ভধারিণ অর্থাৎ মানবীকে প্রত্যাপর্ণ করে, তার অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন।

বালক মহোষধের বিচারের এই ঘটনাটিকে ইষৎ পরিবর্ত্তিত করে ইহুদী রাজ সলোমনের নামে ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত হয়েছে। টেষ্টামেণ্টে আছে, একদিন দুই গণিকা একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজা সলোমনের রাজসভায় তার বিচার প্রার্থীরূপে এসে উপস্থিত হয়। রাজা সলোমনের নিকট স্ত্রীলোক দুটি উভয়েই শিশুপুত্রটিকে তার নিজের গর্ভজাত সন্তান বলে দাবী জানাতে থাকে। অবশেষে শিশুটির প্রকৃত গর্ভধারিনী কে, তা নির্ণয় করবার জন্যে রাজা সলোমন একজন অনুচরকে আদেশ করলেন, শিশুটিকে তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে, উভয়ের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করে দেবার জন্যে। রাজার আদেশ শোনামাত্র একটি স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে মিনতি করে জানালেন,

যে শিশুটিকে হত্যার কোন প্রয়োজন নেই; আপনি অপর স্ত্রীলোকটিকেই শিশুটিকে দান করুন। অপর স্ত্রীলোকটি কিন্তু শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করার আদেশ শুনে অবিচলিতই ছিল। যে স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে হত্যা করতে নিষেধ করে কাতরভাবে রাজা সলোমনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সলোমন তখন শিশুটিকে তারই হস্তে সমর্পণ করার জন্যে নির্দেশ দান করেন। এভাবে তিনি শিশুটির প্রকৃত গর্ভধারিণীকে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রোমক নগরী পম্পীর দেয়ালগাত্রেও এই ঘটনাটি অবলম্বনে সুন্দর একখানি দেয়ালচিত্র রচিত হয়েছিল। আজও সেই চিত্রটিকে দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যে প্রাচীন রোমানগণ ভারতীয়গণের নিকট থেকেই উক্ত ঘটনার বিষয়-বস্তু অবগত হয়েছিলেন এবং পরে সেই ঘটনাটিকে Mural চিত্রের মাধ্যমে এভাবে রূপায়িত করে তোলা হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সহরগুলোতে, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে এবং লিবিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহে, এককালে প্রচুর ভারতীয় শ্রমণ বাস করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া নগরে শ্রমণগণ ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয়গণও বাস করতেন। এরা প্রধানতঃ ছিলেন ব্যবসায়ী। আলেকজান্দ্রিয়াকে ভারতীয়গণ বলতেন অলীকসুন্দর। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এই অলীক সুন্দরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এশিয়া এবং আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চল পার হয়ে শ্রমণগণ ইউরোপ ভূখণ্ডেও উপস্থিত হয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়গণের আদান-প্রদান বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। এর পরেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক শ্রমণগণ তথাগতের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের অল্পকয়েক বৎসর পূর্বে, রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট অগাষ্টাস সীজার। অগাষ্টাসের রাজত্বকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সমেত গ্রীসদেশও রোমের পদানত হয়েছিল। অগাষ্টাসের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়ে, প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে ভারতের বৌদ্ধধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে। ভারতীয় শ্রমণগণ ছিলেন হিংসার বিরোধী। কিন্তু যেখানে জনগণের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন এবং অনাচার প্রবলভাবে দেখা দিত এবং তা সংযত করা শ্রমণগণের সাধ্যের অতীত হয়ে উঠতো, সেখানে তখন তারা লোক-

শিক্ষা দানের জন্যে অদ্ভূত কাণ্ড করে বসতেন। সর্বসমক্ষে তারা নিজ দেহে অগ্নি সংযোগ করে আত্মাহুতি দিতেন। তাদের অত্মাহুতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোত। তাতে নৈতিক অধঃপতন এবং স্থানীয় অনাচার সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হলেও, জনগণের মধ্যে কিছুটা চৈতন্যের সঞ্চার করতো, সন্দেহ নেই। প্রভু যীশুর জন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে গ্রীসের এথেন্স নগরে, এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছু অঞ্চলের জনৈক শ্রমণ বেশ কিছুদিন ধরে এথেন্স নগরে উপস্থিত থেকে সেখানকার স্থানীয় জনগণের মধ্যে তথাগতের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন। সেখানকার জনগণের তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এথেন্স নগরবাসীগণের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে, অনাচার লক্ষ্য করে এবং সেগুলার প্রতিকারের উপায় দেখতে না পেয়ে, শেষে একদিন তিনি সর্বসমক্ষে নিজের দেহে অগ্নি সংযোগ করে আত্মাহুতি দেন। এরকম ধরণের অদ্ভূত আত্মাহুতি গ্রীসের জনগণ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। এই ঘটনায় তারা নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই শ্রমণ যেখানে নিজের মৃত্যু বরণ করেছিলেন ; সেখানে তারা একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ গণের প্রতি গ্রীস দেশের জনগণ কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাদের কতখানি সম্মান করতেন, এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই তা সবিশেষ প্রমাণিত হয়। বিগত ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তখনকার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী সাইগন সহরেও অনুরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ভিক্ষু কোয়াং ডাক্, তার নিজের দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তি দূর করার উপায় খুঁজে না পেয়ে, শেষে প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায়, শত সহস্র লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তার নিজের বস্ত্রাবরণ তৈলসিক্ত করে, তাতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং অপেক্ষণের মধ্যেই নির্মমভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। ভিক্ষু কোয়াং ডাকের এই আত্মাহুতির ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

শুধু গ্রীসের সাধারণ জনসাধারনের উপরেই ভারতীয় ধর্মপ্রচারক শ্রমনগণ তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এমন নয়। তখনকার দিনের গ্রীসের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণও যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তারও যথেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে। ডেমোক্রিটাস এবং প্লেটোর মত মহাপণ্ডিত দার্শনিকগণও বৌদ্ধ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। উপদেশমূলক ভাবে ডেমোক্রিটাস বর্ণিত কুকুর ও প্রতিবিম্বের কাহিনী এবং প্লেটো বর্ণিত সিংহচর্মাচ্ছাদিত গর্দভের কাহিনী দুটিও বৌদ্ধ জাতক কাহিনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কুকুর ও প্রতিবিম্বের কাহিনীটি "খুল্লধনুগ্রহ" জাতক কাহিনীর সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র। আর সিংহচর্মাচ্ছাদিত গর্দভের

কাহিনীটি "সিংহচর্মজাতক" কাহিনীর প্রায় অনুরূপ বলা চলে। জাতকের অন্তর্গত কাহিনীগুলোতে পশু-পাখীর অবতারণা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নৈতিক উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এবং ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানকাল, সে সমস্ত পশুপাখীর অবতারণা করা হয়েছে। সাধারণ গল্প এবং কাহিনী রচনার মধ্যে পশু পাখীর অবতারণার পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। অন্যান্য দেশে প্রচলিত গল্প ও কাহিনীতে এত অধিক পরিমাণে পশুপাখীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রীস দেশে প্রচলিত কথা ও কাহিনীর মধ্যে পশুপাখীর উল্লেখ দেখা যায় সত্য, তবে সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টি তাদের নিজস্ব এবং কোন্‌টি ভারতীয় জাতকের কাহিনী থেকে সংগৃহীত, তা নির্ণয় করা সত্যই দুস্কর। জাতকের কাহিনীসকল বুদ্ধের জীবিতকালেই লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে এবং সে সময়েই সেগুলোর বেশ কিছু ভারতের সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ-সমূহে, বিশেষ করে ইরানে প্রবেশ করে। লোক পরম্পরায় প্রচারিত হবার ফলে, সে সকল কাহিনীর কলেবরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও আপনা থেকেই দেখা দিতে থাকে। এইভাবে গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী এবং সেই সঙ্গে জাতকের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের কাহিনী সকল বুদ্ধের জীবিতকালে এবং তাঁর মহাপরি-নির্বাণের অল্প পরেই লোকমুখে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সকল জাতক কাহিনীর মধ্যে ধর্মোপদেশের সঙ্গে নৈতিক উপদেশও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। ধর্মোপদেশের চেয়ে নৈতিক উপদেশই বিদেশীয়গণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল সবচেয়ে বেশী পরিমাণে। বিদেশীয়গণ সে সকল কাহিনী থেকে নৈতিক উপদেশ সংগ্রহ করে তাদের নিজ নিজ ভাবধারা এবং রীতি অনুযায়ী সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করে এবং পুনর্বিন্যাস করে, পুনরায় সেগুলোকে প্রচার করেছিলেন মাত্র।

পূর্বে একবার বলা হয়েছে যে, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন। সেই সকল শ্রমণগণের মধ্যে বেশ কিছু সিংহলী শ্রমণও ছিলেন। শ্রমণগণ সেখানে তথাগতের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তথাগত বর্ণিত জাতকের কাহিনী থেকে আখ্যায়িকা সমূহ প্রায়ই উল্লেখ করতেন। সে সকল আখ্যায়িকা পরে পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ কার্যটি করেছিলেন সেখানকার জনগণ। বিশেষ করে সেখানে বসবাসকারী গ্রীকগণ। গৌতমবুদ্ধের পূর্বে যিনি বুদ্ধরূপে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি কাশ্যপ নামে পরিচিত ছিলেন। কাশ্যপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, যে তার পিতার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল বারাণসীধাম। কাশ্যপের পিতা ব্রহ্মদত্ত ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। শ্রমণগণ তথাগতের বাণী প্রচারকালে উপদেশমূলকভাবে জাতক কাহিনীর অবতারণা করতে গিয়ে রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে কাশ্যপের নামেরও উল্লেখ

করতেন। ফলে সেখানকার জনগণ জাতকের কাহিনীগুলোকে কাশ্যপের উক্ত কাহিনী বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার স্থানীয় জনগণ কাশ্যপ নামটিকে উচ্চারণ করতেন কৈবিসেস। গ্রীক লিপিকারগণ যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তারাও সেই কাহিনীগুলোকে কৈবিসেস বর্ণিত কাহিনী হিসেবেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া এবং নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চল থেকে সে সকল কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে তারা সেই কাহিনীগুলোকে লিবিয়া দেশজ বলে অভিহিত করেছিলেন। মহাপণ্ডিত এরিস্টটলও লিবিয়া দেশজ কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাহলে জাতকের কাহিনীর কিছু কিছু, অন্ততঃ এরিস্টটলের অজানা ছিল না। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে অন্ততঃ তিনিও যে বৌদ্ধ ভাবধারায় কতকটা অন্ততঃ প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি অথবা অন্যায় করা হবে না।

আলেকজান্দ্রিয়া নগর এককালে বিখ্যাত ছিল, তার পৃথিবী বিখ্যাত অমূল্য গ্রন্থাগারটির জন্যে। তখনকার দিনের পরিচিত পৃথিবীর কোথায়ও পুস্তকের এত বড় সংগ্রহশালা দ্বিতীয় আর একটি ছিল না। এখানকার গ্রন্থাগারে সাতলক্ষেরও বেশী হস্তলিখিত পুঁথি সংরক্ষিত ছিল। এই পুঁথিগুলো সবই পেপিরাসের পত্রের উপর লিখিত ছিল। এই সংগ্রহশালাটির যিনি অধিকর্ত্তা ছিলেন, তার নাম ডেমিট্রিয়াস ফেলিরিয়ুস। তিনি ছিলেন একজন গ্রীক। তখনকার দিনে তার মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। তিনি আলেকজান্দারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, আনুমানিক খৃঃ পূঃ তিনশত অব্দে উপদেশমূলক প্রায় দুই শত কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করে, সে সকল লিপিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে তা প্রকাশ করেন এবং সেই পুস্তকটির নামকরণ করেন। "ঈশপের কথা" (Aesops Fables)। এই পুস্তকখানি গ্রীক ভাষায় রচিত সর্ব প্রথম কথা সংগ্রহ। ঈশপের নামে প্রচারিত এই কথা ও কাহিনী সমূহ থেকে দেখা যাবে, যে এগুলোর বেশীর ভাগই জাতকের কাহিনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মনে হয়, যে তিনি কাশ্যপের নামে প্রচারিত কাহিনী সমূহকেই ঈশপের নামে প্রচার করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি কাশ্যপ নামটিকেই ঈশপ উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসে ঈশপ নামে একজন কথাকার ছিলেন এবং কথা রচনার জন্যেই নাকি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল ; এরকম ধরণের একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিন্তু সে জনশ্রুতি মাত্র। সে রকম ধরণের একজন কথা-কারের রচিত কাহিনী ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকার উপকূলে সে যুগে এসে উপস্থিত হবার সম্ভাবনা খুবই সামান্য। এর জন্যে চাই প্রচারকের দল। ভারতীয় এবং সিংহলী শ্রমণগণ ভগবান তথাগতের বাণীর সঙ্গে জাতকের কাহিনী সকল এতদঅঞ্চলে প্রচার করেছিলেন। ঈশপ নামধেয় কোন কথাকারের

রচিত গল্প ও কাহিনীসকলও কি সেইভাবেই প্রচারিত হয়েছিল? যদি ধরে নেওয়া হয়, যে আলেকজান্দ্রিয়ায় আগমণকারী গ্রীকগণ ঈশপের রচিত কথা ও কাহিনী সকল সেখানে প্রচার করেছিলেন, তবে তারা তা নিজেদের দেশে প্রচার করেন নি কেন? আর সেই সব কাহিনী লিবিয়া দেশজই বা হল কেমন করে? আর ডেমিট্রিয়াস ফেলিরিয়ু সেগুলো আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সংগ্রহ করতে গেলেন কেন? ঈশপের কাহিনীতে যে সকল জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সে সকল জন্তু জানোয়ারের অনেকগুলোই ত গ্রীস দেশে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের দেশ সমূহে দেখতে পাওয়া যায় না। সেগুলো যে সম্পূর্ণ ভারতীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঈশপ নামধেয় একজন কথাকার প্রাচীন গ্রীসে ছিলেন, এটা একটা জনশ্রুতি মাত্র। ঐ নামের কোন ব্যক্তি সত্যি সত্যিই বর্ত্তমান ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্যপের কাহিনী সকলই ঈশপের নামে প্রচারিত হয়েছে এবং কাশ্যপ ও ঈশপ আসলে অভিন্ন ব্যক্তি। ডেমিট্রিয়াস ফেলিরিয়ুসের সংগৃহীত দুইশত কাহিনীর অধিকাংশই জাতকের অন্তর্গত কাহিনী সমূহ থেকে গৃহীত। স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তা বিশেষভাবে তুলে ধরে দেখিয়েছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফ্রীডাস নামে এক ব্যক্তি ডেমিট্রিয়াসের সংগৃহীত কথা ও কাহিনী সকল ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত করেন। বর্ত্তমানে ঈশপের গল্প বলে যেগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলো ফ্রিডাসের অনুদিত পুস্তক থেকে সংগৃহীত এবং তার মূল জাতকের অন্তর্গত উপাখ্যান সমূহ। কথা ও কাহিনীর সঙ্গে নীতিবাক্য জুড়ে দেবার রীতিটিও সম্পূর্ণ ভারতীয়। স্বয়ং তথাগত ধর্মোপদেশ দান কালে সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার পূর্ব পূর্ব জন্মে সংঘটিত ঘটনাবলীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে; উপাখ্যানের মাধ্যমে নীতিবাক্য পরিবেশন করতেন। যাতে লোকে নীতি বাক্যের মধ্য দিয়ে ধর্মের সারবস্তু সহজে এবং অনায়াসে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।